

সমুদ্রগড়—রেল লাইনের ধারে



বিদ্যানগরে ছোড়দা, বড়দা ও মেজদা



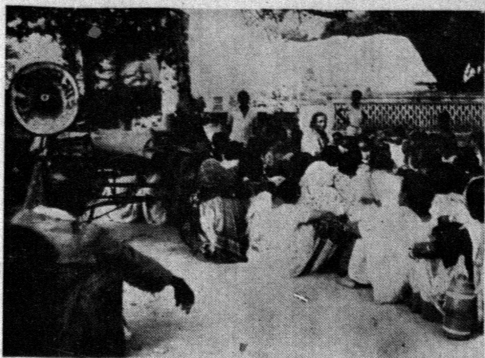
নবদ্বীপের পথে সংকীর্তন শোভাযাত্রা



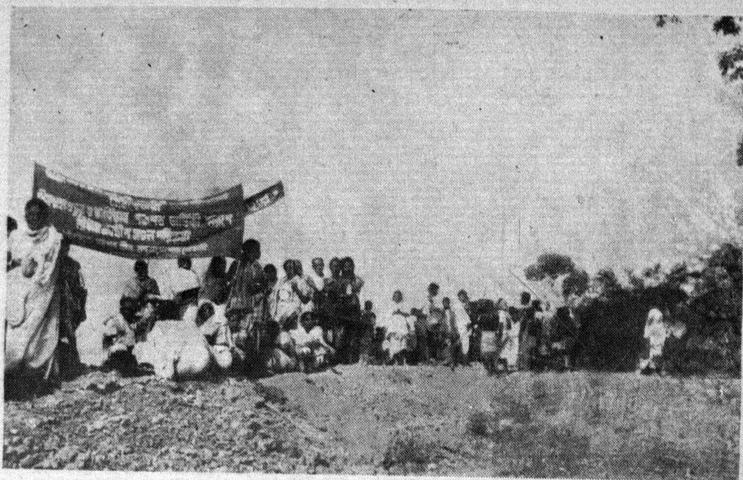
নিদয়াঘাটে



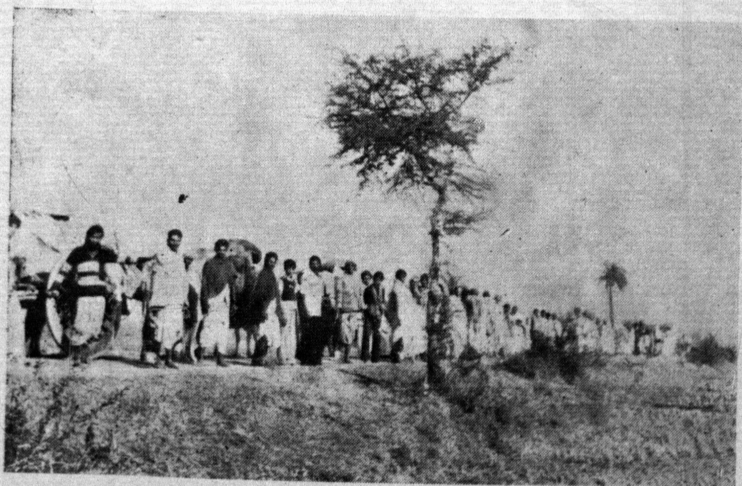
জঙ্গলবাস থেকে সাতকুলিয়া যাবার পথে গঙ্গাতীরে



কাজীর সমাধির সামনে



নিদয়া থেকে বামুনপুকুরের পথে



গাজনতলা থেকে সাতকুলিয়ার পথে



অভিনব পদ্ধতিতে বোঝাই গরুর গাড়ি জলঙ্গী নদীতে নৌকোয় তোলা হচ্ছে

গাজনতলা (মাজদিয়া)

যদি গৌর না হ'ত

(মহাপ্রভুর মহাজীবনের প্রেক্ষাপটে
গৌড়মণ্ডল পরিক্রমার ভ্রমণকাহিনী)

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রকাশক :
শ্রীসুধাংশুশেখর দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ : ১৩৬৭

প্রচ্ছদ শিল্পী : খালেদ চৌধুরী

আলোকচিত্র :
প্রভুপাদ শ্রীমদনগোপাল গোস্বামী

মুদ্রাকর :
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ সামন্ত
বাণীশ্রী
১৫/১ ঈশ্বর মিল লেন
কলিকাতা ৭০০০০৬৭

সেদিনের কথা ভাবছিলাম।

যেদিন বিষ্ণুপ্রিয়াকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে নিমাই বেরিয়ে এসেছিলেন বাড়ি থেকে। ঘুম-না-ভাঙা নবদ্বীপের জনহীন পথ পেরিয়ে ছুটে এসেছিলেন এইঘাটে।

তখনও ভোর হতে কিছু বাকি ছিল। তবু তাঁর পথ চলতে তেমন অসুবিধে হয় নি। কারণ চাঁদের আলোয় নবদ্বীপ তখন দিনের মতই আলোময়।

সেই শেষরাতে তাঁকে গঙ্গা পার করে দেবার জন্য কোনো খেয়ানৌকো ছিল না এঘাটে। তাই মাঘ মাসের প্রচণ্ড শীতকে উপেক্ষা করে নিমাই ঝাঁপ দিয়েছিলেন গঙ্গায়। শৈশব থেকেই তিনি সাঁতারে সিদ্ধহস্ত। গঙ্গায় সাঁতার কাটা ছিল তাঁর সবচেয়ে প্রিয় খেলা। তাই গঙ্গার প্রবল স্রোতকে অবহেলা করে তিনি অক্লেশে ওপারে পৌঁছে গিয়েছিলেন।

সেইঘাটে দাঁড়িয়ে আমি ভাবছি সেদিনের কথা। যেদিন সংসারী-নিমাই সন্ন্যাসী-শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হতে কাটোয়া চলে গিয়েছিলেন। এই ঘাট থেকে গঙ্গা পেরিয়ে ন'দের নিমাই চিরদিনের জন্য নবদ্বীপ ছেড়ে চলে গিয়েছেন। তাই নবদ্বীপের মানুষ আজও একে নিদয়া ঘাট বলেন। নিদয়া মানে নির্দয়া—যার মায়া নেই, মমতা নেই, দয়া নেই।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের পদরেণু রঞ্জিত পথের ধুলি মাথায় মেখে তাঁরই স্মৃতিধন্য স্থানসমূহ দর্শন মানসে আয়োজিত হয়েছে আমাদের এই গৌড়মণ্ডল পরিক্রমা। আয়োজন করেছেন নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর বংশধর প্রভুপাদ শ্রীমদনগোপাল গোস্বামী। তাঁরই পরিচালনায় নবদ্বীপের মদনমোহন মন্দির থেকে শোভা-যাত্রা করে এইমাত্র আমরা নিদয়াঘাটে পৌঁছলাম।

আমরা যাত্রা করেছি দুপুরের প্রসাদ পাবার পরে, বেলা একটা নাগাদ। আর এখন বিকেল তিনটে বেজে গিয়েছে। তার মানে এই তিন মাইল পথ আসতে আমাদের দু-ঘণ্টার বেশি লেগেছে। অবাক হবার কিছু নেই। একে তো আমরা শ'দেড়েক যাত্রী এবং আমাদের মধ্যে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের সংখ্যাই বেশি। তার ওপরে সঙ্গে রয়েছেন শ্রীরাধামদনমোহনজীর বিজয়-বিগ্রহ।

সুসজ্জিত কাঠের সিংহাসনে বসে তাঁরা আমাদের সঙ্গে চলেছেন। ভক্তরা তাদের কাঁধে করে নিয়ে চলেছেন। তাছাড়া পথে আমরা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর ভিটে এবং মহাপ্রভুর মন্দির ও জন্মস্থানে কীর্তন করেছি, অমৃত আশ্রমে বিশ্রাম নিয়েছি। সবচেয়ে বড় কথা, এতো শুধু পথচলা নয়, এ যে ভক্তিপথ পরিক্রমা। তাই এত দেরি হয়েছে আমাদের।

পরিক্রমার একটা ক্রম থাকে। সেটির ব্যতিক্রম হবার উপায় নেই। আমাদের পরিক্রমার প্রথম ক্রম সংকীর্তন শোভাযাত্রা। আর সেই শোভাযাত্রায় সবার আগে চলেছে মতি ও কৃষ্ণা। তাঁদের হাতে হরিভক্তি প্রচারিণী সভার ফেস্টুন। তারপরে ঠাকুরের সিংহাসন এবং 'মাইক' আর খোল-করতাল সহ কীর্তনীয়া দল। একটি সাইকেল ভ্যান্ ব্যাটারীযুক্ত মাইকটি বহন করছে। আগামীকাল থেকে ঠাকুরের সিংহাসনও সাইকেল ভ্যানে দিয়ে দেওয়া হবে। আজ প্রথম দিন বলে ভক্তরা সিংহাসনটি কাঁধে করে নিয়ে চলেছেন। কীর্তনীয়াদের পেছনে আমরা—আগে মেয়েরা, পরে ছেলেরা পথ চলেছি।

সারাপথে আমরা প্রচুর অভিনন্দন লাভ করেছি। পথের পাশে শত শত নারী-পুরুষ হাতজোড় করে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। বহু বাড়ি থেকে থেকে আমাদের ওপর ফুল-বাতাসা ছুড়ে দেওয়া হয়েছে। কোথাও কোথাও কুলবধূগণ আমাদের সামনে পথের ওপরে ঘড়া-ভরা জল ঢেলে দিয়েছেন। এটি সেকালের নিয়ম। নিমাই পণ্ডিত ও তাঁর ভক্তদের নামসংকীর্তনে নদীয়া যখন কৃষ্ণময়, তখন কীর্তনীয়াদের পদভারে মাটিরপথ ধূলিময় হয়ে উঠত। গোরাচাঁদ ও তাঁর সতীর্থদের সেই ধূলির কবল থেকে রক্ষা করবার জন্য কুল-বধূরা পথে জল ঢেলে দিতেন। এখন নবদ্বীপ শহরের বাঁধানো পথে অত ধূলি নেই, কিন্তু নবদ্বীপের কুলবধূরা সেদিনের সেই ঐতিহ্য বহন করে চলেছেন।

এমনটি যে হবে, সেটি কিন্তু জানা ছিল না। শুধু আমরা নই, প্রভুপাদ নিজেও অনুমান করতে পারেন নি। পারলে তিনি যাত্রাকালে যাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য বিভিন্ন সরকারী দপ্তরে এত ছুটোছুটি করবেন কেন?

বলা বাহুল্য তাঁর সেই উৎকণ্ঠা অকারণে নয়। নিতাই-গৌরের নদীয়া এখন যে বড়ই অশান্ত। চুরি ছিনতাই ডাকাতি রাহাজানি নারীনিগ্রহ আর দাঙ্গাবাজি এখন এ জেলার নিয়মিত দুঃসংবাদ। সুতরাং প্রভুপাদ আমাদের নিরাপত্তার জন্য শঙ্কিত হয়েছিলেন।

অথচ আজ যাত্রা শুরু করার পর থেকেই নবদ্বীপের মানুষ সে আশঙ্কাকে

অমূলক প্রমাণ করে আমাদের প্রতি তাঁদের সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে-দিয়েছেন।

কিন্তু কেন? তাহলে কি আজও নদীয়ায় মহাপ্রভুর প্রভাব রয়ে গিয়েছে? 'ইজম্' আর আধুনিকতার খোলস ভেঙে নবদ্বীপের সেই শাশ্বত সত্বাটি আমাদের আজ অভিনন্দিত করল কি?

পথচারীরা আমাদের অভিনন্দিত করেছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে দু-চারজন প্রশ্ন রেখেছেন—এ তো পরিক্রমার সময় নয়, আপনারা এখন পরিক্রমা করছেন কেন?

খুবই স্বাভাবিক প্রশ্ন। গৌড়মণ্ডল পরিক্রমা সুপ্রাচীন। শ্রীল প্রবোধানন্দ-সরস্বতী গোস্বামী রচিত 'শ্রীনবদ্বীপ শতক' ও শ্রীনরহরি চক্রবর্তী রচিত 'ভক্তিরত্নাকর' পাঠ করে মনে হয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর নবদ্বীপ পরিত্যাগের পর থেকেই এই পরিক্রমার প্রচলন হয়েছে। তার মানে প্রায় পাঁচ শ' বছর ধরে এই পরিক্রমা চলেছে। তবে ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী অসীমানন্দ সরস্বতী মহারাজের সংকীর্তন পদ-পরিক্রমার পর থেকে এটি খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। অসীমানন্দজী পরিক্রমা করেছেন কার্তিক মাসে। কিন্তু আজকাল পরিক্রমা হয় ফাল্গুন মাসে, দোল পূর্ণিমার সময়। বিভিন্ন মঠ ও মন্দির থেকে পরিক্রমার আয়োজন করা হয়। হাজার হাজার নারী-পুরুষ পরিক্রমায় অংশ নেন।

কিন্তু আগেই বলেছি, একালের সেই জনপ্রিয় পরিক্রমা হয় দোলের সময় অর্থাৎ মার্চ মাসে। আর আমরা পরিক্রমায় বেরিয়েছি ডিসেম্বরে। সুতরাং পথচারীরা অসময়ের এই পরিক্রমা দেখে বিস্মিত হয়েছেন।

তাঁদের কৌতুহল নিরসনের জন্য আমরা সংক্ষেপে একটা কারণ বলেছি। কিন্তু তার সঙ্গে প্রকৃত কারণের কোনো সম্পর্ক নেই। সেই কথা ভাবতে ভাবতেই আমি এই ঘাটে এসেছি।

কথাটা একটু অবাক হবার মতই বটে। জগতে কার কোন্ কামনাটি কবে কিভাবে পূর্ণ হবে, তা কেউ আগের থেকে জানতে পারে না। আমিও পারি নি। তবে গৌড়মণ্ডল পরিক্রমার বাসনা আমার অনেকদিনের। ব্যাপারটা তাহলে গোড়া থেকেই বলছি।

আট বছর আগের কথা—আমার 'মধু-বৃন্দাবনে' বইখানির তৃতীয় খণ্ড অর্থাৎ 'মহাবন পর্ব' প্রকাশিত হল। আর তারপর থেকেই কিছু উৎসাহী পাঠক-পাঠিকা দাবী তোলেন—এবারে আপনি গৌড়মণ্ডল পরিক্রমাকে অবলম্বন করে একখানি বই লিখুন।

খুবই বিপদে পড়েছি। আমি একজন ভক্তিহীন অবৈষ্ণব। তাহলেও কোনরকমে ব্রজ-পরিক্রমার ওপরে একখানি বই লিখে ফেলেছি। তাই বলে আবার অনধিকার চর্চা!

কিন্তু প্রস্তাবটা এসেছে পাঠক-পাঠিকাদের পক্ষ থেকে। সুতরাং কিছু একটা করা দরকার। ভেবেছি—আগে তো পরিক্রমাটি করে নেওয়া যাক্, তারপরে বই লেখার কথা ভাবা যাবে।

অথচ বিগত আট বছরে কয়েকবার ব্যবস্থা করেও আমি এ পরিক্রমা করে উঠতে পারি নি। যদিও ইতিমধ্যে আমি বেশ কয়েকবার নবদ্বীপে এসেছি। একবার তো অগ্রজপ্রতিম গৌর মহারাজের (স্বামী চিন্ময়ানন্দজী) আমন্ত্রণে তাঁর অমৃত আশ্রমে এসে পুজো কাটিয়ে গিয়েছি। প্রতিবার এসে প্রিয়জনদের কাছে আমার মনোবাসনার কথা বলেছি। সবাই সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাঁরা কেউবা কিছু ব্যবস্থাও করে ফেলেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার আর পরিক্রমা করা হয়ে ওঠে নি। অথচ কেন জানি না মন বার বার ভরসা দিয়েছে, আমার গৌড়মণ্ডল পরিক্রমা হবেই হবে।

অবশেষে গতবছর প্রভুপাদ তাঁর শ্রীশ্রীগুরুনির্বাণ মহোৎসবে আমাকে নিমন্ত্রণ করলেন। সুসাহিত্যিক বিমল মিত্র ও স্বনামধন্য শিল্পী বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের সঙ্গে আমিও নবদ্বীপে এলাম। পরিচয় হল প্রভুপাদের সঙ্গে। বয়সে আমার চেয়ে ছোট হবেন। কিন্তু নগর পরিক্রমায় বেরিয়ে তাঁর কীর্তন শুনে মোহিত হলাম। সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ শুনে মুগ্ধ হলাম। যেমন গানের গলা, তেমনি চমৎকার ব্যাখ্যা। আর কি অপরূপ চেহারা। শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় বুকখানি আমার ভরে উঠল। কেবলি মনে হতে থাকল—এই মানুষটির সঙ্গে দেখা হয় নি বলেই, আমার এতদিন গৌড়মণ্ডল পরিক্রমা করা হয়ে ওঠে নি, এবারে হবে। একসময় কথাটা বলে ফেললাম তাঁকে। তিনি আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

তারপরে একটি বছর কেটে গিয়েছে। এই একবছরে আমি তাঁর একজন কাছের মানুষ হয়ে গিয়েছি। লাভ করেছি তাঁর অসীম স্নেহ। প্রকৃতপক্ষে আমার মনোবাসনা পূর্ণ করার জন্যই তিনি এই পরিক্রমার আয়োজন করেছেন। দোলের সময় ভিড় বেশি হয় আর গরমে পথচলা কষ্টকর বলে তিনি এই অসময়ে পরিক্রমার ব্যবস্থা করেছেন।

হ্যাঁ, সবই তিনি করেছেন। কৃষ্ণনগরে জেলা শাসক ও পুলিশ সুপারের কাছে চিঠি পাঠানো থেকে গরুর গাড়ির ব্যবস্থা, হাট-বাজার মাইক যোগাড়

এমনকি যাত্রাসূচী পর্যন্ত—সবই নিজে করেছেন। যাত্রাকালে আমাদের যেসব গ্রামে রাত্রিবাস করতে হবে, সেসব গ্রামের মোড়লদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। পেট্রোম্যাক্স থেকে সামিয়ানা, বাসন-পত্র থেকে রান্নার লোক—সবই আমাদের সঙ্গে যাচ্ছে। যাচ্ছে চারখানি গরুর গাড়ি—একখানিতে রেশন ও রান্নার সরঞ্জাম আর তিনখানিতে আমাদের মালপত্র। যাচ্ছেন প্রখ্যাত রামায়ণ-গায়ক রসময় বন্দ্যোপাধ্যায় ও জনপ্রিয় কীর্তনীয়া রাধেশ্যাম দাস। যাচ্ছে প্রভুপাদের তিন ছেলে—জয়গোপাল, নিত্যগোপাল ও আনন্দগোপাল। প্রথম দুজন ক্লাশ সেভেন ও তৃতীয়জন ক্লাশ ফাইভে পড়ে। প্রভুপাদের একমাত্র কন্যা সোনা বা কৃষ্ণা একাদশ শ্রেণীতে পড়ছে। বাড়ি ও মন্দির খালি বলে সে মা ও ঠাকুরমার সঙ্গে শ্রীধামেই রয়ে গিয়েছে।

কেবল নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর বংশধর বললে আমাদের প্রভুপাদের পরিচয় দেওয়া হয় না। তিনি স্বনামধন্য সুপণ্ডিত প্রভুপাদ প্রাণগোপাল গোস্বামীর পৌত্র। তাঁর পিতা প্রভুপাদ যদুগোপাল গোস্বামীও পণ্ডিতসমাজে অতিশয় শ্রদ্ধেয় ছিলেন। পাণ্ডিত্যের বিচারে আমাদের প্রভুপাদ মদনগোপাল তাঁদের সুযোগ্য বংশধর। কিন্তু পণ্ডিত বললে আমরা যেমন জনৈক শিখাধারী নামাবলী গায়ে প্রাচীনপন্থী মানুষ বুঝে থাকি, তিনি মোটেই তেমন নন। তিনি প্যাণ্ট-কোট পরেন না বটে, কিন্তু পোশাক-পরিচ্ছদে একেবারেই সেকেলে নন। গাড়ি চালানো থেকে ফটো তোলা পর্যন্ত বিভিন্ন আধুনিক কাজে তিনি সিদ্ধহস্ত। তিনি এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে যেমন কীর্তন করেছেন, তেমনি পথের প্রচুর ছবি তুলেছেন।

কিন্তু পথের কথা আর নয়, এবারে ঘাটের কথা হোক—নিদয়া ঘাট। একটু আগে যেখানে পৌঁছে আমাদের সাময়িক যাত্রা বিরতি ঘটেছে।

নিদয়া নবদ্বীপের নানা ঘাটের একটি ঘাট মাত্র। বাঁধানো নয়, মাটির বেলাভূমি—বেলেমাটি। খাড়া পাড়। সর্বত্র সমান নয়, এখানে-ওখানে ভাঙা। জল বেশ খানিকটা নিচে। তাই পাঁচ-সাত ফুট চওড়া একটা ঢালু পথের মতো কেটে জলের ধারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানেই খেয়া-নৌকো এসে ভিড়ছে, মানুষ গরু ও গাড়ি নৌকোয় উঠছে।

দুখানি নৌকো। একখানি মানুষ পারাপারের খেয়া, আরেকটি গরু ও গাড়ি পার করবার। বলা বাহুল্য দ্বিতীয়টি বড় এবং দেরিও হচ্ছে তারই জন্য। যাত্রীদের পার হতে তেমন সময় লাগবে না। একবারে চল্লিশ-পঞ্চাশজন যাত্রী উঠছে। খেয়া-নৌকোটি সোজা-সুজি ওপারে যাচ্ছে। এখানে গঙ্গা মোটেই চওড়া নয়।

দেরি হচ্ছে গরু ও গাড়ি পার করাতে। একে মাল বোঝাই গাড়ি, খুব সাবধানে ধরাধরি করে নৌকোয় তুলতে হচ্ছে। এক খেয়ায় একখানি গাড়ি ও দুটি গরুর বেশি যেতে পারছে না। তার ওপরে গাড়ির খেয়াটিকে যেতে হচ্ছে অনেকটা দূরে। কারণ সোজাসুজি ওপারে গেলে পথে আবার একটা খাড়ি পড়বে। যাত্রীরা পায়ে হেঁটে সেটি পার হতে পারছেন কিন্তু গরু বা গাড়ি পার করানো যাবে না। তাই গরুর খেয়াকে যেতে হচ্ছে অনেকটা দূরে সেই খাড়ি ছাড়িয়ে। ফলে প্রতিবারে প্রায় ঘণ্টাদেড়েক করে সময় লাগছে।

ব্যাপারটা জানা ছিল প্রভুপাদের। তাই আমরা যাত্রা করার অনেক আগেই গাড়িগুলো রওনা করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখনও দুখানি গাড়ি এপারে পড়ে আছে।

যাত্রী-খেয়া ফিরে আসছে। আগরতলার দত্তবাবু মাইকে নাম ঘোষণা করছেন। যাঁদের নাম ডাকা হচ্ছে, তাঁরা ঘাটে গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন—নৌকো এলে ওপারে যাবেন। ঠেলা-ঠেলি এড়াবার জন্যই এই ব্যবস্থা।

দত্তবাবু প্রভুপাদের একজন শিক্ষিত সুপ্রতিষ্ঠিত ও উৎসাহী শিষ্য। যাত্রায় যাবেন বলে আগরতলা থেকে এখানে এসেছেন। এসেছেন আরও অনেকে। শুধু আগরতলা অথবা ত্রিপুরা থেকে নয়। এসেছেন আসাম এবং উত্তরবঙ্গ থেকে, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গা থেকে।

যাক্ গে, যেকথা বলছিলাম। দত্তবাবু আমাদের গৌড়মণ্ডল পরিক্রমার একজন উৎসাহী কর্মী। তাঁর পুরো নাম মদনমোহন দত্ত। বয়স বছর চল্লিশ। ছোট ভাইকে নিয়ে যাত্রায় এসেছেন।

প্রথমদল যাত্রীকে নিয়ে খেয়া রওনা হয়ে গেল। যাঁরা চলে গেলেন, তাঁরা ওপারে গিয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করবেন।

নৌকো ছেড়ে দেবার পরে প্রভুপাদ দত্তবাবুকে কাছে ডাকলেন। বললেন, "এর পরের খেয়ায় ঠাকুরের সিংহাসন ও মাইকের ভ্যান ওপারে যাবে। সেই সঙ্গে যে-ক'জন যেতে পারে, নৌকোয় উঠবে। গৌর তাদের সঙ্গে থাকবে।"

গৌর মানে আমাদের গৌরদা—গৌরগোপাল দাশগুপ্ত। পূর্ব-রেলের জনৈক প্রবীণ কর্মচারী, নবব্যারাকপুরে থাকেন। তিনি এই পরিক্রমার ম্যানেজার-কাম্-ক্যাশিয়ার। বলা বাহুল্য ডাইরেক্টার প্রভুপাদ নিজেই।

দত্তবাবু আবার মাইকের কাছে যাচ্ছেন। তিনি প্রভুপাদের নির্দেশ ঘোষণা করবেন। এখানে পৌঁছবার পরে আমাদের সংকীর্তন শোভাযাত্রার সাময়িক বিরতি ঘটেছে। কীর্তন থেমে যাওয়ায় যাত্রীরা গঙ্গার তীরে ছড়িয়ে

পড়েছেন। কেউ গল্প করছেন, কেউ ঘুরে বেড়াচ্ছেন। অতএব প্রভুপাদের নির্দেশ মাইকে ঘোষণা না করলে সবাই শুনতে পাবেন না।

প্রভুপাদ আমাকে কাছে ডাকেন। বলেন, "আমরা ওপারে যাবো তৃতীয় খেয়ায়। শুধু গাড়ি দু'খানা নৌকোয় তোলার জন্য কয়েকজনকে এপারে রেখে আমরা সবাই ওপারে চলে যাবো। আমরা ওপারে পৌঁছলেই যাত্রা শুরু হবে।"

এই একটা আশ্চর্য ব্যাপার। আমি যে তাঁর অতিথি একথাটি প্রভুপাদ আমাকে কখনই ভুলতে দেন না। আমার প্রতি সর্বদাই তিনি বিশেষ নজর রেখে চলেছেন। নইলে এসব কথা আমাকে বলার কি দরকার? আর এসব কথা আমাকে বলা মানেই আমার প্রতি সহযাত্রীদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণের সুযোগ করে দেওয়া। তাঁর কয়েকজন ঘনিষ্ঠ শিষ্য-শিষ্যা ছাড়া সহযাত্রীদের কেউ আমার লেখক পরিচয় জানেন না। সবার সামনে প্রভুপাদ আমাকে ঘোষবাবা বলেই ডাকছেন। কিন্তু এভাবে আমার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে থাকলে শেষ পর্যন্ত আমার প্রকৃত পরিচয় গোপন থাকবে কি? কিন্তু কি করব? মানুষটি যে বড়ই স্নেহশীল, বড়ই কর্তব্যপরায়ণ।

অতএব তাঁকে আর কথাটা মনে করিয়ে দিতে পারি না। শুধু বলি, "আমাদের তাহলে নৌকোয় উঠতে কিছু দেরি আছে।"

"হ্যাঁ, আধঘণ্টা তো বটেই।" প্রভুপাদ বলেন।

"আমি তাহলে ততক্ষণে ওদিকটায় একবার ঘুরে আসি। জায়গাটি ভারী সুন্দর।"

"নিশ্চয়ই।" প্রভুপাদ বলে ওঠেন, "তোমার না দেখলে চলবে কেমন করে? তোমাকে যে দেখতেই হবে।"

এই রে! আবার বলে না ফেলেন—না দেখলে লিখবে কেমন করে?

কিন্তু ভাগ্যি ভাল, শেষ পর্যন্ত তা আর বললেন না। আমিও আর কথা না বাড়িয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলি।

"আমি আপনার সঙ্গে আসব ঘোষদা?"

তাকিয়ে দেখি কৃষ্ণা। কৃষ্ণা প্রভুপাদের শিষ্যা নয়, বোনের মতো। তার বাবা ও মা প্রভুপাদের পিতৃদেবের কাছে দীক্ষা নিয়েছেন। কৃষ্ণা প্রভুপাদকে 'মদনদা' বলেই ডাকে। কৃষ্ণা আধুনিকা, বালিগঞ্জে থাকে, শিক্ষিত ও অবস্থাপন্ন পরিবারের মেয়ে। সে নিজেও একটি ইংরেজী মাধ্যমের স্কুলে শিক্ষকতা করে। প্রতি বছর উৎসবের সময় কৃষ্ণা মাকে নিয়ে নবদ্বীপ আসে।

দিবারাত্র পরিশ্রম করে তার মদনদার উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলে।

বলি, "বেশ তো, এসো।"

কৃষ্ণা আমার পাশে পাশে পথ চলতে থাকে।

হঠাৎ থেমে যায় কৃষ্ণা। সে দাঁড়িয়ে পড়ে।

জিজ্ঞেস করি, "কি হল? থামলে কেন?"

"একটা অন্যায় করে ফেলেছি ঘোষদা!"

"কি আবার করলে?" আমিও দাঁড়িয়ে পড়ি।

"মানসীদিকে ডেকে নিয়ে এলাম না যে।"

একটু হেসে বলি, "না, তোমাকে নিয়ে মাঝে মাঝে সত্যি মুশকিলে পড়ে যাই। আমি ভাবলাম, না জানি কোন্ মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গিয়েছে।"

"সত্যি অন্যায় হয়ে গেছে ঘোষদা! আমরা দুজনে জলের ধারে দাঁড়িয়ে গল্প করছিলাম। মানসীদি বৃন্দাবনের যমুনার কথা বলছিলেন। কিন্তু তাঁর লক্ষ্য ছিল আপনার দিকে। তাই আপনাকে এদিকে আসতে দেখেই বলে উঠলেন—ঐ দেখো, তোমার দাদা টহল মারতে চলেছে। কি করবে, দু-দণ্ড এক জায়গায় বসে থাকা ওর কুষ্ঠিতে লেখা নেই যে! যাও না, ওর সঙ্গে ওদিকটায় ঘুরে এসো একবার। ব্যস, আমি সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলাম আপনার কাছে। ওঁকে ডেকে নিয়ে এলাম না।"

"ডাকলেও আসত না।" আমি চলতে চলতে বলি।

কৃষ্ণাও আমার সঙ্গে হাঁটতে শুরু করে। বলে, "বুঝলেন কেমন করে?"

"নিজে এলে আর তোমাকে আমার সঙ্গে পাঠাবে কেন?"

"আমাকে আপনার সঙ্গে পাঠিয়ে তাঁর লাভ?"

"আহা, আমি যদি গঙ্গার বেলাভূমিতে পা পিছলে পড়ে যাই, আমার খালি পায়ে যদি ক্ষেতের বেড়ার কাঁটা ফোটে অথবা আমি যদি উদাসী হয়ে হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূরে চলে যাই—এমন আর কত বিপদ ঘটতে পারে আমার। তাই সে তোমাকে আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছে।"

কৃষ্ণা কোনো প্রতিবাদ করতে পারে না, সে চুপ করে পথ চলতে থাকে। একটু বাদে বলে, "সত্যি ঘোষদা! সর্বদা আপনার দিকে তাঁর নজর। আপনার জন্য তাঁর চিন্তার শেষ নেই। কাল রাতে শুয়ে শুয়ে কেবল আপনার কথাই বলেছেন।"

"কি কথা?" আমি মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করি।

কৃষ্ণা উত্তর দেয়, "কত কথা। বলেছেন, আপনার স্বাস্থ্য নাকি মোটেই

ভাল নয়, তবু আপনি সর্বদা অনিয়ম করেন। বলেছেন, আপনার নাকি ভয়ানক হাঁপানি আছে, সাইনোসাইটিস আছে।"

"আর কি বলেছে?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"না, আপনার স্বাস্থ্য সম্পর্কে আর কিছু বলেন নি তো!"

"বলবে।"

"কি?"

"বলবে—সেবার মানালীর ট্যুরিস্ট্ বাংলোয় গভীর রাতে আমার হাঁপানির টান ওঠায় সে কেমন বিপদে পড়ে গিয়েছিল। বলবে—ব্রজপরিক্রমার শেষ দিকে আমি মহাবনে অসুস্থ হয়ে পড়ায়, তার কেমন দিন কেটেছে।"

"কিন্তু মানসীদি এসব কথা আমাকে বলবেন না ঘোষদা!"

"কেন বল তো?"

"আমি যে আপনার 'উত্তরস্যাং দিশি' ও 'মধু-বৃন্দাবনে' পড়েছি!"

"তাহলেও দেখো, ঠিক বলবে।"

"আচ্ছা, দেখব আপনার কথা সত্য হয় কিনা।"

"বেশ দেখো।"

আমরা হাঁটতে হাঁটতে বেশ খানিকটা দূরে চলে এসেছি। জায়গাটি সত্যি ভারী সুন্দর। জলের ধারে একফালি জমি শুধু বালিময় বেলাভূমি, তারপরেই ক্ষেত—এখন কলাই বুনেছে, ধান উঠে গেছে। ক্ষেতটা আস্তে আস্তে উঁচু হয়ে বড় রাস্তার ধারে বাড়ি-ঘরের সঙ্গে গিয়ে মিশেছে। ঐ রাস্তা দিয়েই আমরা পোড়ামাতলা থেকে প্রাচীন-মায়াপুরে এসেছি। তারপরে মাটির পথ ধরে এই ঘাটে।

বড় রাস্তার ধারে কিন্তু কেবল বড়গাছ আর বাড়ি-ঘর নয়, মাঝে মাঝে মন্দিরের চূড়াও দেখা যাচ্ছে। আর তা শুধু এপারে নয়, ওপারেও বটে। এপারে প্রাচীন-মায়াপুর আর ওপারে মায়াপুর। এখন এপারের চেয়ে ওপারের খ্যাতি বেশি। তবে ওপার মানে কিন্তু এই নিদয়াঘাটের উল্টোদিকে নয়, অনেকটা পিছিয়ে। আমরা গঙ্গা পার হয়ে খানিকটা পেছিয়ে গেলেও মায়াপুর পর্যন্ত যাবো না, আমরা আজ নিদয়া গ্রামে রাত কাটাবো।

কাছের গঙ্গা ও তার নির্জন সৈকত, দূরের বাড়ি-ঘর ও মন্দির আর মাঝখানের সবুজ ক্ষেত, দেখতে ভারী ভাল লাগছে। আমরা দেখতে দেখতে এগিয়ে চলেছি।

"সত্যি ভাবতে অবাক লাগছে!" চলতে চলতে হঠাৎ কৃষ্ণা বলে ওঠে।

আমি তার দিকে তাকাই। সে বলে, "সত্যি ঘোষদা, এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না, আমি সত্যি সত্যি পরিক্রমায় চলেছি। আমার যে আসার কোনো পরিকল্পনাই ছিল না।"

"কিন্তু কেন ?"

"গতকাল বললাম যে! আমি ঠিক দু-সপ্তাহ বাদে নেপাল যাচ্ছি। উৎসবের ধকলের পরে আবার এই পরিক্রমা। ঠাকুর না করুন, শরীর খারাপ হয়ে পড়লে মহামুশকিল হবে।"

"কিসসু হবে না। নবদ্বীপচন্দ্র তোমাকে সুস্থ শরীরে নেপাল বেড়িয়ে আনবেন।"

হাঁটতে হাঁটতে আমরা বেশ খানিকটা এগিয়ে এসেছি। সহযাত্রীদের দেখতে পাচ্ছি কিন্তু তাদের কথাবার্তার শব্দ আর কানে আসছে না।

"গাড়ির খেয়া ফিরে এলো," হঠাৎ কৃষ্ণা বলে ওঠে।

গঙ্গার দিকে তাকাই, সে ঠিকই বলেছে।

সে আবার বলে, "চলুন, ঘাটে ফেরা যাক।"

"কেন বল তো ?" জিজ্ঞেস করি, "আমরা তো গাড়ির খেয়াতে গঙ্গা পার হব না।"

"আমি একটু গরুর গাড়ি নৌকোয় তোলা দেখব।" কৃষ্ণা বলে।

হেসে বলি, "বেশ তো, ঘাটে গিয়ে দাঁড়াও।"

"যাই তাহলে।"

আমি মাথা নাড়ি! সঙ্গে সঙ্গে সে সত্যি সত্যি ছুট লাগায়। কি করবে বরিশালের বানরিপাড়া গ্রামের গুহঠাকুরতা হলেও তার জন্ম কলকাতায়। বালিগঞ্জে বড় হয়েছে। গরুর গাড়ি নৌকোয় ওঠাতে সে দেখে নি কখনও।

গাড়ির খেয়া তৃতীয় গাড়িখানিকে নিয়ে রওনা হয়ে গেল। আরও একখানি গাড়ি পার করতে হবে। শীতকালের ছোট দিন। পরের গাড়ি ওপারে পৌছবার আগেই সন্ধ্যে হয়ে যাবে। হোক গে। তাতে আমাদের কোনো অসুবিধে হবে না। কারণ প্রথমেই খাবারের গাড়ি পার করে দেওয়া হয়েছে। সে গাড়ি নিশ্চয়ই নিদয়া গ্রামে পৌছে গিয়েছে। এতক্ষণে রান্না চড়ে গিয়েছে। কি রান্না হচ্ছে ? খিচুরি কি ? হয়তো হবে। আলু কড়াইশুটি আর ফুলকপি দিয়ে গরম গরম খিচুরি শীতের রাতে চমৎকার লাগবে।

আমাদের খেয়া ফিরে আসছে। দত্তবাবু মাইকে আমাকে ডাকছেন।

প্রভুপাদ বলেছেন আর কি ! তাড়াতাড়ি ঘাটের দিকে এগিয়ে চলি।

নিদয়া ঘাট—যে ঘাট দিয়ে সেদিন শেষরাতে ন'দের নিমাই নদীয়া ছেড়ে চলে গিয়েছেন, আজ আমরাও সেই ঘাট দিয়ে নবদ্বীপ ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

ঘাটে এসে খেয়া ভিড়ল। প্রভুপাদের সঙ্গে উঠে এলাম নৌকোয়। চতুর্থ গাড়িখানিকে নৌকোয় তোলার জন্য কেবল কয়েকজন যুবক রয়ে গেল এপারে। খেয়া ছেড়ে দিল। শুরু হল সংকীর্তন।

আচ্ছা, সেকালেও তো এমনি খেয়া নৌকোর প্রচলন ছিল। এমনি খেয়ায় চড়েই তো বালক নিমাই রোজ পাঠশালায় যেতেন। আবার পণ্ডিত নিমাই যখন নদীয়ার পথে পথে আর গঙ্গার ঘাটে ঘাটে প্রেম-সংকীর্তনের বন্যা বইয়ে দিয়েছিলেন, তখনও তো এমনি খেয়ায় চড়ে সবাই গঙ্গা পার হতেন! এই তো সেই সুরধুনী, যার বুকে জলক্রীড়া বালক বিশ্বম্ভরের সবচেয়ে প্রিয় খেলা ছিল আর যে জলকেলির প্রতাপে প্রতিদিন স্নানার্থীরা উত্যক্ত হতেন। বন্ধু রঘুনাথ শিরোমণির মুখ চেয়ে নিমাইপণ্ডিত তো সেদিন এই গঙ্গাজলেই তাঁর ন্যায়ের টীকা বিসর্জন দিয়েছিলেন। আবার এই গঙ্গা পার হয়েই তো সেদিন তিনি কাটোয়ায় চলে গিয়েছেন, শ্রীকেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাস নিয়ে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম গ্রহণ করেছিলেন।

'যত জগতেরে তুমি কৃষ্ণ বোলাইয়া।
করাইলা চৈতন্য-কীর্তন প্রকাশিয়া॥
এতেকে তোমার নাম "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"।
করাইলা চৈতন্য-কীর্তন প্রকাশিয়া॥'

প্রভুপাদ কি অন্তর্যামী? নইলে হঠাৎ তিনি শ্রীচৈতন্যভাগবতের এই পঙক্তি কয়টি গেয়ে উঠলেন কেন? আমি অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকাই।

তিনি গান থামিয়ে একটু হাসেন। তারপরে আমাকে জিজ্ঞেস করেন, "কি মনে পড়ছে তো?"

আমি মাথা নাড়ি। তিনি আবার বলেন, "শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসলীলার সেই পুণ্যময় স্থানটি আমরা এ যাত্রায় দর্শন করছি না। কিন্তু সময় করে তুমি একদিন কাটোয়া গিয়ে অবশ্যই দেখে এসো। দেখবে, তাঁর মস্তক মুণ্ডনের স্থানটি পর্যন্ত সযত্নে রক্ষা করা হচ্ছে। তাছাড়া সেখানে রয়েছে শ্রীদাস গদাধরের সমাধি এবং শ্রীকেশব ভারতীর সাধনা ও সিদ্ধির স্থান।"

থামলেন প্রভুপাদ। কিন্তু একটু থেমে আবার বলেন, "সন্ন্যাসলীলার কথা আমি পাঠের সময় বলব, এখন বরং পরিক্রমা সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলে নিই।"

আমরা মাথা নাড়ি। প্রভুপাদ বলতে থাকেন, "আমরা গৌড়মণ্ডল পরিক্রমায় বেরিয়েছি। এই পরিক্রমায় আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত সেকালের নয়টি দ্বীপ অর্থাৎ একালের ন'টি অঞ্চল ভ্রমণ করব। সেকালের দ্বীপগুলির নাম—অন্তর্দ্বীপ, রুদ্রদ্বীপ, সীমন্তদ্বীপ, গোদ্রুমদ্বীপ, মধ্যদ্বীপ, কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ ও মোদদ্রুমদ্বীপ।

"এখন আমরা অন্তর্দ্বীপ অর্থাৎ শহর নবদ্বীপ ও তার উপকণ্ঠ প্রাচীন-মায়াপুর দর্শন করে গঙ্গা পার হয়ে রুদ্রদ্বীপে চলেছি। রাহপুর, শঙ্করপুর, ইদ্রাকপুর ও রুদ্রপাড়া প্রভৃতি জায়গা নিয়ে সেকালের 'রুদ্রদ্বীপ।' কথিত আছে নীললোহিতাদি একাদশ রুদ্র একদা সেখানে সাধন-ভজন করতেন বলে ঐ অঞ্চলের নাম হয়েছে রুদ্রদ্বীপ। এখন অবশ্য এ দ্বীপে আর তেমন কিছুই দর্শনীয় নেই। শুধু শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরজীর প্রতিষ্ঠিত একটি ছোট মঠ আছে।

তবে রুদ্রদ্বীপ থেকে মায়াপুর খুবই কাছে, মাত্র মাইল দুয়েক। কিন্তু আমরা এখন মায়াপুরে যাবো না, পরে দেখা যাবে। আজ রাতটি রুদ্রদ্বীপে কাটিয়ে আগামীকাল সকালে আমরা সীমন্তদ্বীপে রওনা হব। সীমন্তদ্বীপের কথাও কাল হবে। নৌকো পারে এসে গেল, এবারে নামতে হবে।"

তাকিয়ে দেখি তিনি ঠিকই বলেছেন, খেয়া ডাঙায় ভিড়েছে।

প্রভুপাদের কথা শুনতে শুনতে কখন গঙ্গা পেরিয়ে এসেছি, খেয়াল করি নি। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াই। সবার সঙ্গে নেমে আসি পারে। কিন্তু পরপারে নয়। গঙ্গার চড়ায় এসে খেয়া থেমেছে।

বালিময় চড়া পেরিয়ে এগিয়ে চলি। খানিকটা এগিয়ে আবার জল, গঙ্গার একটি ক্ষীণধারাই বলা যেতে পারে। গঙ্গার বুকে চড়া পড়েছে কিন্তু তীরের কাছে একফালি গঙ্গা এখনও বেঁচে রয়েছে।

এটুকু পার হতে অবশ্য কোনো হাঙ্গামা করতে হবে না। দুদিকে দড়ি বেঁধে একখানি ডিঙ্গি নৌকো রেখে দেওয়া হয়েছে। এদিকের দড়ি টানলে নৌকোটা এদিকে আসে, ওদিকের দড়ি টানলে ওদিকে চলে যায়। তাই নৌকোতে নেয়ে নেই। যাত্রীরা নিজেরাই দড়ি টেনে নৌকো চালাচ্ছেন। আমরাও তাই করি।

এপারে এসে খেয়াঘাটের অফিস—বুকিং-কাম্-চেকিং অফিস। ম্যানেজার গৌরদা ভাড়া দেবার দায়িত্ব নেওয়ায় আমরা ছাড়া পেলাম।

বাঁশের বেড়া পেরিয়ে আমরা গঙ্গার বেলাভূমিতে এসে দাঁড়াই। ঠাকুরের সিংহাসন ও মাইকসহ আগের নৌকোর যাত্রীরা সবাই এখানে রয়েছেন।

প্রভুপাদকে দেখতে পেয়েই তাঁরা কীর্তন ধরলেন—

'চলিলেন বৈকুণ্ঠনায়ক গৃহ হৈতে।
সন্ন্যাস করিয়া সর্বজীব উদ্ধারিতে॥
শুন শুন আরে ভাই! প্রভুর সন্ন্যাস।
যে কথা শুনিলে কর্মবন্ধ যায় নাশ॥ ··'

ভক্তবৃন্দ শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত শ্রীচৈতন্যভাগবত থেকে মহাপ্রভুর গৃহত্যাগের কথা কীর্তন করছেন। আমি শুনতে থাকি।

সহসা নজর পড়ে ওদিকে, খানিকটা দূরে—গঙ্গার তীরে। ওখানে দু'খানি গরুর গাড়ি রয়েছে দাঁড়িয়ে! কাদের গাড়ি? আমাদের কি?

এখন এখানে আমাদের ছাড়া আর কার হবে? তবে দুখানি গাড়ি যখন এখানেই রয়েছে, তখন তো খাবারের গাড়ি নিদয়া যায় নি। কিন্তু কেন?

জনৈক সহযাত্রী উত্তর দেন, "এ জায়গাটা ভাল নয়, মাঝে মাঝেই ডাকাত পড়ে। সন্ধ্যে হয়ে আসছে। তাই সবগুলো গাড়ি একসঙ্গে যাবে। আলো এবং বেশ কিছু শক্ত-সমর্থ যাত্রী সঙ্গে থাকতে হবে।"

হায় বৃথাই তখন খিচুরির স্বপ্ন দেখেছি! ডাকাতের হাত এড়িয়ে নিদয়া গ্রামে পৌঁছতে পারলেই খিচুরি। তার এখনও অনেক দেরি। একখানি গাড়ি গঙ্গায় আরেকখানি গঙ্গার ওপারে।

ভক্তবৃন্দ ভয়হীন কণ্ঠে কীর্তন করে চলেছেন—

'শুন শুন আরে ভাই! প্রভুর সন্ন্যাস।
যে কথা শুনিলে কর্মবন্ধ যায় নাশ॥
গঙ্গার হইয়া পার শ্রীগৌরসুন্দর।
সেই দিনে আইলেন কণ্টক-নগর॥'···

সেকালের কণ্টক-নগর একালে কাটোয়া। মহাপ্রভু এই ঘাটে গঙ্গা পার হয়ে কাটোয়া চলে গিয়েছেন। শ্রীকেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাস নিয়ে নিমাই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হয়েছেন। সেই কথাই কীর্তন করছেন ওঁরা।

আমি আস্তে আস্তে ওঁদের ছাড়িয়ে এগিয়ে আসি। এসে দাঁড়াই গাড়ি দু'খানির কাছে।

কানু পেট্রোম্যাক্স জ্বালাচ্ছে। আমরা চারটি পেট্রোম্যাক্স নিয়ে এসেছি। সন্ধ্যে হয়ে এলো। গ্রামের পথ, ডাকাতের উৎপাত, আলোর দরকার।

তৃতীয় গাড়ি এসে গেল। কৃষ্ণা কীর্তন ছেড়ে ছুটে এলো। খুবই স্বাভাবিক। সে গাড়ি নৌকোয় তুলতে দেখেছে, এবারে গাড়ি নৌকো থেকে

ডাঙ্গায় নামছে। এটাও দেখা দরকার বৈকি!

গরু ও গাড়ি নামিয়ে দিয়ে একটা আলো নিয়ে নৌকো আবার ওপারে রওনা হয়ে গেল। চতুর্থ অর্থাৎ শেষ গাড়িখানি নিয়ে আসার জন্যই ওপারে আলোর দরকার হবে। ইতিমধ্যে শীতের সন্ধ্যা নেমে এসেছে গঙ্গার বুকে। আলোময় নৌকোটিকে অভিনব লাগছে। ঢেউয়ের তালে তালে দোলা খেতে খেতে কাছের আলোটা ক্রমেই দূরে চলে যাচ্ছে।

কীর্তন থেমে গেল। প্রভুপাদ মাইকে বলছেন, "আমরা এই ঠাণ্ডার মধ্যে আর এখানে অপেক্ষা করব না। অবশ্য আমরা যেখানে যাচ্ছি সেখানেও আমাদের কোনো উষ্ণ-আশ্রয় জুটবে না। শুধু আজকের রাতটি নয়, আগামী সাতদিন ধরেই আমাদের এমনি কষ্ট করতে হবে, প্রয়োজনে গাছতলায় রাত কাটাতে হবে। কিন্তু নিতাই-গৌরের লীলারসে আমাদের হৃদয়-মন সর্বদা আনন্দময় হয়ে থাকবে।"

"জয় নিতাই, জয় গৌর!" ভক্তবৃন্দ জয়ধ্বনি করে ওঠেন।

প্রভুপাদ আবার বলেন, "এবারে আবার সংকীর্তন শোভাযাত্রা শুরু হবে। মাত্র মাইলখানেক হাঁটতে হবে। অন্ধকার হয়ে গেছে। তাই সবার আগে একটা পেট্রোম্যাক্স যাবে। তারপরে থাকবেন ঠাকুর ও কীর্তনীয়ারা। তাঁদের পেছনে একটা আলো ও মেয়েরা পথ চলবে। মেয়েদের পেছনে থাকব আমরা।"

"আমরা চারটে আলো এনেছি বাবা!" গৌরদা মনে করিয়ে দেন।

"জানি।" প্রভুপাদ একটু হাসেন। বলেন, "একটা আলো নিয়ে জনকয়েক যুবক এখানে অপেক্ষা ক'রো! চতুর্থ গাড়িখানা এসে পৌঁছলে সব গাড়ি নিয়ে নিদয়া রওনা হবে।"

মেয়েরা উলুধ্বনি দিয়ে উঠলেন। ভক্তরা ঠাকুরের সিংহাসন কাঁধে নিলেন। খোল-করতাল বেজে উঠল। প্রভুপাদ গান ধরেন—

'আমরা চলেছি নিত্যানন্দের গণ,
আমরা নহি কভু নিঃস্ব, আমরা নহি কভু রিক্ত
আমরা চৈতন্য কৃপাধন্য।
আমরা চলেছি নিত্যানন্দের গণ॥
নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্য কৃপাধন্য, নহি মোরা নগণ্য।
আমরা চলেছি নিত্যানন্দের গণ॥'...

এটি প্রভুপাদের স্বরচিত গান। তিনি নিজের সুরে রেকর্ড করেছেন। আগেই বলেছি, আমাদের প্রভুপাদ নামাবলী গায়ে টিকিধারী বাবাজী নন,

একজন আধুনিক সুরসিক ও সুদর্শন যুবক। তিনি সুবক্তা ও সুলেখক। তিনি নাট্যকার সুরকার ও সুগায়ক। তিনি একজন বেতার ও দূরদর্শন শিল্পী। তাঁর পাঠের গলাটি যেমন উদাত্ত, গানের গলাটি তেমনি মিঠে।

সেই সুমধুর স্বরেই তিনি প্রথমে গাইছেন, আমরা পরে গাইছি। তিনি গেয়ে চলেছেন—

'নিত্যানন্দের কৃপাগুণে, মোরা ভালোবাসি যেন প্রতিজনে,
এই শপথ এই শুভক্ষণে করি মোরা চৈতন্য কৃপাগুণে।
আমরা চলেছি নিত্যানন্দের গণ॥
আপনারে লয়ে যেন শুধু, বিব্রত নাহি রহি কভু।
সকলের তরে যেন কাঁদে প্রাণ, মুখে সদা লেগে থাকে হরি নাম,
আমরা চলেছি নিত্যানন্দের গণ॥'

॥ দুই ॥

রাত সাতটায় নিদয়া গ্রামে পৌঁছন গেল। শীতকাল বলেই রাত বলছি। গ্রীষ্মকাল হলে বিকেল কিংবা সন্ধ্যে বলতে হত। শীতের সাতটা শহরেই রাত আর এই গণ্ডগ্রামের পক্ষে তো গভীর রাত।

কিন্তু গণ্ডগ্রাম হলেও আজ রাতে নিদয়ার বোধ করি আর ঘুম হবে না। প্রভু-পাদের কয়েকজন ভক্ত ও শিষ্য রেবতী ঘোষ বাস করেন এ গ্রামে। তাঁরা আমাদের আগমনের সংবাদ জানতেন। গ্রামবাসীদের সহায়তায় তাঁরা গ্রামের প্রবেশ পথে তোরণ তৈরি করে প্রতিবেশীদের নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। তাঁরাই আমাদের স্বাগত জানিয়ে সসম্মানে নিয়ে এসেছেন এখানে—এই বারোয়ারী মণ্ডপে। আমরা কীর্তন করতে করতে পথ চলেছি। আর সেই কীর্তনের শব্দ শুনতে পেয়ে শত শত নারী-পুরুষ ও বালক-বালিকা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে।

সুবিশাল সংকীর্তন শোভাযাত্রা এসে থেমেছে গ্রামের বারোয়ারী মণ্ডপের সামনে। টিনের চাল ও ইট-সুরকির দেওয়াল দিয়ে তৈরি বারোয়ারী মণ্ডপ। পাশে ছোট একখানি ভাঁড়ার ঘর। জমি থেকে বেশ খানিকটা উঁচু কিন্তু মাটির মেঝে। সামনে একফালি খোলা মাঠ—'কমিউনিটি হল' বলা যেতে পারে। সারা বছর গ্রামের যাবতীয় পুজা-পার্বণ হয় এই মণ্ডপে আর পালা-কীর্তনের আসর বসে এই মাঠে।

আমাদের ঠাকুরের আসন মণ্ডপে তোলা হল। সেই সঙ্গে শেষ হল সংকীর্তন শোভাযাত্রা। শ্রান্ত সহযাত্রীরা অনেকেই খোলা মাঠে বসে পড়লেন। ভ্যান্ থেকে মাইক্ ও ব্যাটারী নামিয়ে মাইকম্যান চন্দ্রা তার কাজে লেগে গেল।

প্রভুপাদ বললেন, "একটা আলো মন্দিরে রেখে আরেকটা তোমরা নিয়ে নাও। টিউবওয়েলের কাছেই রান্নার জায়গা করা হয়েছে, একটা আলো সেখানে নিয়ে রাখো, তোমাদের হাত-পা ধুতে সুবিধে হবে। হাত-পা ধুয়ে নিয়ে গ্রামের বাড়ি বাড়ি গিয়ে রাতের আশ্রয় ভিক্ষে ক'রো। যে যেখানে আশ্রয় পাবে, সেখানেই রাত কাটাবে।"

ইতিমধ্যে মানসী এসে আমার পাশে দাঁড়িয়েছে। সে ক্ষীণকণ্ঠে প্রশ্ন করে, "তুমি কোথায় থাকবে? আমি কি ওদের সঙ্গে আশ্রয় ভিক্ষে করতে যাবো?"

কিন্তু ওর প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় না আমাকে। তার আগেই প্রভুপাদ কাছে ডাকেন আমাদের। আমাকে বলেন, "তুমি ও রসময়দা মণ্ডপের ভাঁড়ার ঘরে থাকবে। আর মা!" তিনি মানসীর দিকে তাকান, "তুমি গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে এসো, কৃষ্ণা তোমার আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে আসবে।"

না, প্রভুপাদ দেখছি শেষ পর্যন্ত সত্যি একটা গোলমাল না বাঁধিয়ে ছাড়বেন না। একেই তো আমাকে আর মানসীকে নিয়ে সহযাত্রীদের জল্পনার অন্ত নেই। আর এ জল্পনার জন্ত তাঁদের কোনো দোষ দেওয়াও চলে না। সত্যিই তো মানসীর হাতে শাঁখা নেই, সিঁথিতে সিঁদুর নেই অথচ আমরা একসঙ্গে নবদ্বীপ এসেছি। এবং আমাদের দুজনের কথাবার্তা ও আচার-আচরণ দেখে সহযাত্রীদের হয়তো সেই সম্পর্কটাই ধরে নেওয়া স্বাভাবিক। তার ওপরে প্রভুপাদ যদি আমাদের প্রতি এমন বিশেষ দৃষ্টি দেন, তাহলে যে জল্পনা আরও বেড়ে যাবে। এবং হয়তো পরিক্রমা পূর্ণ হবার আগেই আমার পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়বে। কিন্তু তাহলেও এক্ষেত্রে আমার করার কিছুই নেই। তাঁকে এসব কথা মনে করিয়ে দিয়ে কোনো লাভ নেই। তিনি আমাদের সুখ-সুবিধের দিকে খেয়াল না দিয়ে পারবেন না। অতএব নীরবে তাঁর নির্দেশ মেনে নেওয়াই ভাল। অদৃষ্টে যা লেখা আছে, তাই হবে।

মানসী জিজ্ঞেস করে, "তোমার কাঁধের ঝোলায় টর্চ আছে তো?"

আমি মাথা নাড়ি।

সে আবার বলে, "তাহলে চলো হাত-মুখ ধুয়ে আসা যাক। তাছাড়া বেশ শীত পড়েছে, তোমার আর খালিপায়ে থাকা ঠিক নয়। আমার ঝোলায় তোমার হাওয়াই চপ্পল রয়েছে।"

"কিন্তু কেউ তো জুতো পরছেন না, আমার পরা উচিত হবে কি?" আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করি।

"রাতে তো আর পরিক্রমা করছ না, এখন জুতো পায়ে দিলে কোনো দোষ হবে না।" একটু থামে সে। তারপরে যোগ করে, "এই ঠাণ্ডায় তোমাকে আমি কিছুতেই খালি পায়ে হাঁটাহাটি করতে দেব না।"

এর পরে আর কোনো কথা চলতে পারে না। তাই টর্চ বের করে বলি, "বেশ, চলো হাত-পা ধুয়ে আসা যাক।"

রেবতীকে বলতেই সে আমাদের টিউবওয়েলের কাছে নিয়ে আসে। তারপরে নিজেই বলে, "আপনারা হাত-মুখ ধুয়ে নিন, আমি পাম্প্ করছি।"

আমার আপত্তি উপেক্ষা করে সে পাম্প্ করতে লেগে যায়। মানসী

তার ঝোলা থেকে সাবান, দাঁতের মাজন, গামছা ও আমার হাওয়াই চপ্পল বের করে দেয়।

হাত-মুখ ও পা ধুয়ে আমি চপ্পল পায়ে দিই। ব্রজপরিক্রমার কথা মনে পড়ছে।* বনপরিক্রমায় বের হবার আগের দিন সন্ধ্যায় বৃন্দাবনে রঙ্গনাথজীর বাগানবাড়িতে বসে মানসী আমাকে হাওয়াই চপ্পল গামছা, জলের বোতল, টর্চ দেশলাই মোম ও ওষুধপত্র সর্বদা সঙ্গে রাখতে বলেছিল। বলেছিল—হাওয়াই চপ্পল পায়ে দিয়ে পরিক্রমা করলে কোনো দোষ হবে না। কিন্তু সহযাত্রীরা কেউ জুতো পরছেন না বলে, আমি তার সে অনুরোধ রক্ষা করতে পারি নি। হয়তো তাই হেমন্তের ঠাণ্ডা আমার সহ্য হয় নি। পরিক্রমার শেষে গোকুল-মহাবনে পৌঁছে আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি আর তাকে বৃন্দাবন থেকে গোকুলে ছুটে যেতে হয়েছে।

কিন্তু এবারে সে আমাকে খালি পায়ে পরিক্রমা করতে বাধা দেয় নি। শুধু বলছে, রাতে জুতো পরতে হবে। এবং এবারে আর ফাঁকি দেওয়া যাবে না। কারণ সে নিজেই আমার সঙ্গে এসেছে।

অথচ তাকে সঙ্গে আনার কোনো পরিকল্পনাই ছিল না আমার। বরং বনপরিক্রমার সময়েই আমি ওকে সঙ্গে নিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সে রাজী হয় নি। আর এবারে এই পরিক্রমার কথা জানাতেই বৃন্দাবন থেকে সে লিখেছে—'আমিও তোমার সঙ্গে গৌড়মণ্ডল পরিক্রমা করব, সেইভাবে ব্যবস্থা ক'রো।'

তবু বুঝতে পারি নি সে সত্যি সত্যি সঙ্গী হবে। বরং আমার চিঠির উত্তর না পেয়ে ভেবেছি, সে বোধহয় আমার কথা শুনবে। কষ্ট হবে বলে আমি তাকে নিষেধ করে চিঠি দিয়েছিলাম।

কিন্তু দিনচারেক আগে সে হাওড়া পৌঁছে সোজা আমার বাসায় এসে হাজির হল। কলকাতায় এলে সে তার দাদার বাড়িতে ওঠে। কিন্তু এবারে আর সেমুখো হল না। বলল—পরিক্রমা শেষে কলকাতায় ফিরে কয়েকদিন ওখানে থেকে যাবো। এখন আর সময় কোথায়? পরশুই তো নবদ্বীপ চলে যেতে হচ্ছে। কালকের দিনটা গোছগাছ করতে কেটে যাবে, একেবারেই সময় হবে না।

কিন্তু থাক গে এসব ভাবনা। মানসী সত্যই আমার সঙ্গে গৌড়মণ্ডল

---

* লেখকের 'মধু-বৃন্দাবনে' দ্রষ্টব্য।

পরিক্রমায় এসেছে। আমরা নিদয়া গ্রামে পৌঁছে হাত-মুখ ধুতে এসেছি।

মানসীর হাত-মুখ ধোয়া হয়ে যায়। সেও সঙ্গে একজোড়া হাওয়াই চপ্পল এনেছে। তাই বলি, "তুমিও তো চটিটা পরে নিলে পারতে!"

"পাগল হয়েছো!" সে উত্তর দেয়, "মেয়েরা সবাই রয়েছে খালি পায়ে আর আমি একজোড়া জুতো পায়ে দিয়ে প্রভুপাদের সামনে মেমসাহেব হয়ে ঘুরে বেড়াবো!"

একবার থামে সে। তারপরে কোমল কণ্ঠে আমাকে ভরসা দেয়, "তুমি ভয় পেয়ো না, আমি বৃন্দাবনে থাকি। এখানে খালি পায়ে থাকলে আমার ঠাণ্ডা লাগবে না।"

বৃন্দাবন দক্ষিণমেরু নয়, তবু সেখানে নিদয়ার চেয়ে বেশি ঠাণ্ডা তো বটেই! তাছাড়া প্রভুপাদের সামনেই বা সে কেমন করে মেমসাহেব হয়ে ঘুরে বেড়ায়? কিন্তু মুশকিল হল জুতো পরে আমার সাহেব হওয়ায় তার আপত্তি নেই। কিন্তু সে যখন বলেছে, তখন এর আর অন্যথা হবার উপায় নেই। কারণ বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানসীর অনেক পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু তার জিদ বিন্দুমাত্র কমে নি। জিদ করেই সে তার বাবার অমতে বিমলেন্দুকে বিয়ে করেছিল, আবার বিমলেন্দু তার সঙ্গে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করা সত্ত্বেও মানসী জিদ করে আদালতে তার শাস্তি প্রার্থনা করে নি শুধু বিবাহ বিচ্ছেদের আদেশ পেয়ে খুশি থেকেছে। জিদ করেই সে এখন বৃন্দাবনে বৈরাগীর জীবন যাপন করছে আবার হয়তো বা জিদ করেই আমাকে ভালোবেসে ফেলেছে।*

মানসীর কথায় মানসীর ভাবনা হারিয়ে যায়। চলতে চলতে সে বলে, "প্রভুপাদ বললেন, তুমি রসময়দার সঙ্গে মন্দিরে শোবে, কিন্তু মাটির মেঝে, তোমার ঠাণ্ডা লাগবে না তো!"

"না, না, ঠাণ্ডা লাগবে কেন?" তাড়াতাড়ি প্রতিবাদ করে উঠি। বলি, "সারা গাঁয়ে তো একমাত্র দালান এই মণ্ডপ। মেঝে মাটির হলেও আমার ঠাণ্ডা লাগবে কেন, আমি যে ফোমের ম্যাট্রেস আর স্লীপিং ব্যাগ নিয়ে এসেছি।"

কথাটা বোধকরি খেয়াল ছিল না ওর। তাই আর কিছু বলে না, নীরবে হাঁটতে থাকে। একটু বাদে আমি বলি, "জানি না, কৃষ্ণা তোমার জন্য কোথায় আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে পারবে? কিন্তু তুমি তো মাত্র একখানি কম্বল নিয়ে

---

* লেখকের 'উত্তরস্যাং দিশি' ও 'মধু-বৃন্দাবনে' দ্রষ্টব্য।

এলে। এত করে বললাম, তবু আরেকখানি আনলে না। দেখছো তো গ্রামবাংলায় কি রকম ঠাণ্ডা!"

"কোথায়!" মানসী বিস্ময়ের ভান করে। বলে, "বৃন্দাবনের তুলনায় এ কিছুই ঠাণ্ডা নয়, আমি তো বৃন্দাবনেও একখানি কম্বল গায়ে দিই।"

একটু হেসে বলি, "মানসী, বৃন্দাবনে তুমি ঘরে ঘুমোও আর আজ তোমাকে প্রায় বাইরে রাত কাটাতে হবে, গ্রামের বাড়ি-ঘর তো দেখতেই পাচ্ছ।"

"তা হোক্ গে, তুমি অযথা আমার জন্য চিন্তা ক'রো না, আমার কোনো কষ্ট হবে না।"

আবার মনে পড়ে সেই কথা, এর অন্যথা হবার উপায় নেই। সে একখানির বেশি কম্বল কিছুতেই গায়ে দেবে না। অতএব আবার নীরবে হাঁটতে থাকি।

হাঁটতে হাঁটতে আমরা মণ্ডপের সামনে আসি। আর তখুনি দেখতে পাই, দেখে বিস্মিত হই। নিদয়া গণ্ডগ্রাম হলেও এখানে একটা চায়ের দোকান বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। বুঝতে পারছি অস্থায়ী দোকান। আমরা এতগুলো মানুষ আজ এখানে থাকব শুনে দোকানী অন্য কোনো জায়গা থেকে দোকান তুলে নিয়ে এখানে এসেছে। এবং তার 'স্পেকুলেশন' সত্য হয়েছে। আমার সহযাত্রীরা অনেকেই সেখানে ভিড় করেছেন।

মানসীরও নজর পড়ে চায়ের দোকানের দিকে। সে বলে ওঠে, "তুমি আজ বিকেলে চা খাও নি, এক কাপ চা খেয়ে নাও, নইলে তোমার আবার মাথা ধরবে। তাছাড়া বেশ শীত পড়েছে, গরম চা ভালই লাগবে।"

"তুমি খাবে না?" আমি তাকে প্রশ্ন করি।

সে উত্তর দেয়, "না, তোমার যদি আমার কোনো কথা মনে থাকে! আমি যে বৃন্দাবনে যাবার পরে চা ছেড়ে দিয়েছি, তা এরই মধ্যে ভুলে গেলে!"

"না। তাহলেও কথাটা বললাম, এই ঠাণ্ডায় এক গেলাস গরম চা খেলে বৃন্দাবনের বোষ্টমীর জাত যেতো না।"

মানসী হেসে দেয়। সহাস্যে বলে, "আমি যে বৃন্দাবনের বোষ্টমী, কে বললে তোমাকে?"

"তাহলে তুমি কি?"

"আমি কলকাতার লেখকের মানসী।"

"তবে চা খাবে না কেন?"

"চা খেলে শরীর খারাপ হয় বলে।"

"আমাকে যে খেতে বলছ ?"

"আর তোমার সঙ্গে বকবক করতে পারি নে বাপু! চলো তো চা খেয়ে নেবে।"

সেই একই কথা ওর যখন জিদ চেপেছে, আমাকে চা খাওয়াবেই। অতএব আর তর্ক না করে ওর সঙ্গে এসে চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়াই।

দোকানে ভিড়। কাজেই বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে চা পাওয়া গেল। চা খেয়ে নিয়ে আবার মানসীকে নিয়ে মণ্ডপের সামনে আসি। আর এসেই, অবাক হয়ে যাই। ইতিমধ্যে শূন্য-মণ্ডপ পূর্ণ-মন্দিরে রূপান্তরিত। ঠাকুরের সিংহাসনটি ঠিক মাঝখানে বসিয়ে প্রদীপ ও ধূপ জেলে দেওয়া হয়েছে। রাধারাণী ও মদনমোহনের গলায় নতুন মালা পরানো হয়েছে। প্রভুপাদের পিতামহ ও পিতৃদেবের দু'খানি ফটো আমরা নিয়ে চলেছি সঙ্গে। তাঁদেরও মালা পরোনো হয়েছে। সিংহাসনের সামনে ফুল ও প্রসাদের ডালি আর নানা পূজার উপকরণ। প্রভুপাদ আহ্নিকে বসেছেন।

কিছুক্ষণ বাদে আহ্নিক শেষ হল। শুরু হল সন্ধ্যারতি। বেজে উঠল কাসর ও ঘণ্টা। বাজনার তালে তালে প্রভুপাদ আরতি করছেন। আমরা মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাঁর অনুপম আরতি দর্শন করি।

"এসে গেছে ··এসে গেছে···আমাদের গাড়ি এসে গিয়েছে।"

কয়েকজন যাত্রী প্রায় সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন। তাকিয়ে দেখি সত্যই তাই। সারি বেঁধে গাড়িগুলো আসছে। তাদের সামনে ও পেছনে পেট্রোম্যাক্স।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। শেষ পর্যন্ত তাহলে ডাকাতদের দৃষ্টি এড়িয়ে গাড়িগুলো এসে গেছে। আর গাড়ি যখন এসে গেল, তখন যত রাতই হোক, গরম খিচুরি পাওয়া যাবে। তাছাড়া রাতই বা একটা খুব বেশি হবে কেন ? সবে তো আটটা বেজেছে। মুখ ধুতে গিয়ে দেখে এলাম, উনুন তৈরি করে পাশে জ্বালানী কাঠ রেখে দেওয়া হয়েছে। শুধু উনুনে আগুন দিয়ে খিচুরি চড়িয়ে দিলেই হয়।

গাড়ি থামতেই কর্মীরা ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। তাঁদের এখন অনেক কাজ। ঠাকুরকে রান্নার যোগাড় করে দেওয়া, যাত্রীদের মালপত্র দিয়ে দেওয়া, মণ্ডপের সামনে সামিয়ানা টাঙিয়ে সতরঞ্চি বিছিয়ে দেওয়া।

কিন্তু কানু কাশীনাথ রতন দুলাল দত্তবাবু ও তিন গৌরবাবুর হস্তক্ষেপে কিছুক্ষণের মধ্যেই সব কাজ সুষ্ঠুভাবে সুসম্পন্ন হল। মাইকে গ্রামবাসীদের আমন্ত্রণ জানানো শুরু হল। বলা হচ্ছে—এখুনি প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যভাগবৎ পাঠ শুরু করবেন, আপনারা সবাই আসুন। প্রভুপাদের পাঠের পরে বেতার ও

দূরদর্শন শিল্পী রসময় বন্দ্যোপাধ্যায় রামায়ণ গাইবেন ও রাধেশ্যাম দাস গৌরলীলা কীর্তন করবেন।

কিন্তু যা শীত পড়েছে, তাতে গ্রামবাসীরা লেপ-কাঁথার মায়া ছেড়ে ঘরের বাইরে আসবেন কি ?

কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেলাম। দলে দলে নারী-পুরুষ বালক-বালিকা এসে সামিয়ানার নিচে আশ্রয় নিতে শুরু করল।

অবশেষে প্রভুপাদ তাঁর উদাত্তকণ্ঠে পাঠ শুরু করলেন। প্রথমেই আমাদের আশ্রয় দেবার জন্য নিদয়া গ্রামের মানুষদের ধন্যবাদ জানালেন। তারপরে পরিক্রমা সম্পর্কে সামান্য কিছু বক্তব্য রেখে শুরু করলেন—

"প্রায় পাঁচ শ' বছর আগে ১৪০৭ শকাব্দে দোলপূর্ণিমায় অর্থাৎ ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে ফেব্রুয়ারী* এই শ্রীধাম নবদ্বীপের মাটিতে কলির ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আবির্ভূত হয়েছেন। ১৪৫৫ শকাব্দে অর্থাৎ প্রায় আটচল্লিশ বছর বয়সে তিনি অপ্রকট হন। **এই আটচল্লিশ বছর মর্ত্যলীলার মধ্যে তিনি প্রথম চব্বিশ বছর শ্রীধাম নবদ্বীপে বাস করেছেন। চব্বিশ বছর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করার পরে মহাপ্রভু নবদ্বীপ ছেড়ে চলে যান। তারপরে ছ' বছর তিনি কোনো এক জায়গায় বেশিদিন বসবাস করেন নি, শুধু তীর্থভ্রমণ করেছেন। গিয়েছেন পুরী, দক্ষিণ ভারত, কাশী, প্রয়াগ ও বৃন্দাবন। করেছেন ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা। অবশেষে ফিরে এসেছেন শ্রীক্ষেত্রে এবং বাকি আঠারো বছর সেখানেই অতিবাহিত করেছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর মর্ত্যলীলা মাত্র আটচল্লিশ বছর স্থায়ী হলেও, তাঁর কর্মময় মহাজীবন মহাসিন্ধুর মতই সীমাহীন। সুতরাং এই পরিক্রমা কালে আমার পক্ষে তাঁর সমগ্র জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়াও সম্ভব নয়। সে চেষ্টাও করব না। আমি শুধু নবদ্বীপ-লীলা সম্পর্কে সামান্য কিছু কথা বলে কলির ভগবানের একটি মোটামুটি পরিচয় দেবার চেষ্টা করব।

মহাপ্রভুর মহাজীবন নিয়ে বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। আর সে রচনা শুধু বাংলায় নয়, বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায়। কিন্তু এই সব রচনার মূলে চারখানি গ্রন্থ—শ্রীমুরারী গুপ্তের কড়চা, শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীলোচনদাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ও শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর

---

* অনেকের মতে ১৮ই ফেব্রুয়ারী

** ২৯শে জুন, ১৫৩৩ খ্রীঃ

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। বলা বাহুল্য শেষের গ্রন্থখানি সবচেয়ে বেশি তথ্যবহুল এবং প্রামাণ্য। কিন্তু আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহাজীবনের যে অংশটি নিয়ে বেশি আলোচনা করব, সে অংশটি সম্পর্কে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যভাগবত। আমি তাই পরিক্রমাকালে প্রতি সন্ধ্যায় এই অমর গ্রন্থ থেকে আপনাদের কিছু কিছু পাঠ করে শোনাবো।…"

সহসা মেয়েরা উলুধ্বনি করে ওঠেন। তার মানে প্রভুপাদের এই সানন্দ-ঘোষণাকে আমরা স্বাগত জানালাম।

"কিন্তু" প্রভুপাদ আবার আরম্ভ করেন, "মহাপ্রভুর মহাজীবনের কথা শুরু করার আগে কয়েকটি কথা বলে নেওয়া দরকার। তাই বলছি…"

তিনি আবার থেমে যান। সামনে রাখা হারমনিয়ামটিকে কাছে টেনে আনেন। তারপরে তাঁর সুন্দর সুরেলা স্বরে গান ধরেন,

'রাধার মহিমা প্রেমরসসীমা
জগতে জানাতো কে,
যদি গৌর না হ'ত।'

একবার নয়, দুবার নয়, এই তিনটি পঙ্‌ক্তি পর পর তিনবার গাইলেন তিনি। তারপরে হারমনিয়ামটিকে একটু সামনে ঠেলে দিয়ে আবার বলতে শুরু করলেন—

"ভক্তবৃন্দ, আমি বলতে চাইছি, শ্রীচৈতন্যদেব যে সময়ে আবির্ভূত হয়েছেন, ঠিক সেই সময়ে তাঁর যদি আবির্ভাব না ঘটত, তাহলে কি হ'ত? অর্থাৎ গৌর না হ'লে আমাদের কি হ'ত?

এই প্রশ্নের উত্তর পেতে হ'লে শ্রীচৈতন্যদেব যে সময়ে এসেছেন, প্রথমেই আমাদের সেই সময়ের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অবস্থাটির দিকে তাকাতে হবে। তাকালে দেখতে পাবো যে গৌর না হ'লে আজ আমরা যে-স্বরূপে আছি, সে-স্বরূপে থাকতে পারতাম না। আমাদের ভাবের পরিবর্তন হ'ত, আচার ও আচরণের পরিবর্তন হ'ত আর হয়তো বাংলার মাটি থেকে সনাতন ধর্মটাই লুপ্ত হয়ে যেত। তাছাড়া প্রাক-চৈতন্য যুগের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই, তখনও এদেশে মাৎস্যন্যায় চলেছে। রাজা প্রজাকে শাসন করছে, ধনী দরিদ্রকে শোষণ করছে, উচ্চবর্ণ নিম্নবর্ণকে নিষ্পেষণ করছে। শক্তিমানের অত্যাচারে দুর্বলের নাভিশ্বাস উঠেছে। আর ধর্মের নামে চলেছে চরমতম অধর্ম।

সাধারণ মানুষ, শাসিত শোষিত আর অবহেলিত মানুষ, তাই ভালমন্দ

বিচার রহিত হয়ে একটা স্নেহচ্ছায়ার সন্ধান করছিলেন। শোষণ আর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তাঁরা এই মমতাহীন সমাজের সঙ্গে সকল সংস্রব পরিত্যাগ করে শান্তি পেতে চাইছিলেন। স্বাভাবিক ভাবেই রাজধর্ম গ্রহনের একটা প্রবণতা দেখা দিয়েছিল।

দেশের অধিকাংশ মানুষের মানসিকতা যখন এইরকম, ঠিক সেই সময়ে ব্রজের বাঁকা-কালোসখা কলিহত জীবগণকে সুখ ও শান্তি দিতে মাতৃভাবাপন্ন করুণায় বুক ভরে নিয়ে জগৎকে চেতনানন্দে বিভোর করে শ্রীচৈতন্য স্বরূপে এই গুপ্তবৃন্দাবন শ্রীধাম নবদ্বীপে আবির্ভূত হলেন।

তখন শ্রীচৈতন্যদেব যদি উপেক্ষিত লাঞ্ছিত ও নিঃস্বদের দিকে তাঁর প্রেমহর্ষিত হাত দু'খানি বাড়িয়ে না দিতেন, তিনি যদি তাঁদের অন্তর দিয়ে ভাল না বাসতেন, তাহলে সেই ক্ষয়িষ্ণু সমাজের সেদিন অকালমৃত্যু হত এবং সেই সঙ্গে সনাতন ধর্ম ও সংস্কৃতির অবলুপ্তি ঘটত। শ্রীচৈতন্যদেব সেদিন তাঁর মাতৃভাবাপন্ন করুণার কোলে আচণ্ডাল সকলকে ঠাঁই দিয়েছিলেন আবার সেই সঙ্গে অত্যাচারীদের দিকে তর্জনী তুলে ইস্পাত কঠিন কণ্ঠে বলেছিলেন—

'নীচ জাতি নহে কৃষ্ণ-ভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনে যোগ্য॥
যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণ-ভজনে নাই জাতিকুলাদি বিচার॥'

শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী লাঞ্ছিত ও উপেক্ষিত সমাজের ম্রিয়মান মনকে সঞ্জীবিত করে তুলল। অত্যাচারিত ও শোষিত মানুষ প্রথম উপলব্ধি করলেন আপন সমাজ প্রাঙ্গণে নিজের ঘরের ভেতরেই তাঁদের মাথা উঁচু করে মানুষের মতো বাঁচার অধিকার রয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁরা বিপ্লবী শ্রীচৈতন্যের কাছে একথাও শিখেছিলেন যে মাথা উঁচু করে বাঁচার অর্থ এই নয় যে সর্বদা সর্বত্র অবিনীত ভাব প্রকাশ করতে হবে। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁদের শিক্ষা দিয়েছিলেন যে স্বাধীনতা মানে উচ্ছৃঙ্খলতা নয়। তিনি তাঁদের মধ্যে কাউকে না-মানার মন সৃষ্টি করেন নি। সৎকর্মের দায়িত্ব দিয়ে প্রথমে তিনি তাঁদের মনের ক্ষুদ্রতাকে বিনাশ করেছেন, তারপরে তাঁদের মনে মহত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁরা আনন্দে মাথা উঁচু করেছেন। অশিক্ষিত ও অবহেলিত সমাজের মধ্যে শ্রীচৈতন্যদেব যোগ্যতা অর্জনের অদম্য পিপাসার সৃষ্টি করে মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটিয়েছিলেন।

ভক্তবৃন্দ, শ্রীচৈতন্যদেব সেদিন সবাইকে আরও একটা শিক্ষা দান করেছেন। সেটা হল—মান দিয়ে নিজের মান বাড়ানো, নিজের সহিষ্ণুতা দিয়ে অপরকে

সহিষ্ণু ও সহমর্মী করে তোলা। তিনি বললেন—

'তৃণ হইতে নীচ হইয়া সদা নিব নাম।
আপনি নিরভিমানী জীবে দিব মান ॥
তরুসম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিব।
ভর্ৎসন তাড়নে কারে কিছু না বলিব ॥"

একবার থামলেন প্রভুপাদ। তারপরে আবার বলতে শুরু করলেন—

"শ্রীমন্মহাপ্রভু সকলকে দৈন্যশিক্ষা প্রদান করেছেন, কিন্তু তার মানে এই নয় যে তিনি অন্যায়ের কাছে নতি স্বীকার করতে বলেছেন। চাঁদকাজীর কীর্তনবন্ধ আইনের বিরুদ্ধে তিনি যে গণজাগরণ গড়ে তুলেছিলেন, তা নিঃসন্দেহে ভারত-ইতিহাসের প্রথম আইন-অমান্য আন্দোলন। এই আন্দোলনের মাধ্যমে আমরা তাঁর যে ইস্পাতকঠিন-মানসিকতার প্রমাণ পাই, তা এদেশের ইতিহাসে অভূতপূর্ব। শ্রীচৈতন্য সেদিন তাঁর চেতনা দিয়ে সমগ্র জাতির নুয়ে পড়া মেরুদণ্ডকে সোজা করে দিয়েছিলেন। তখন তাঁর মধ্যে 'তৃণ হইতে নীচ' ভাবের নামগন্ধও ছিল না। সেখানে তিনি বৈপ্লবিক আন্দোলনে জন-গণ-মন অধিনায়ক, ইতিহাসের মহানায়ক।

কিন্তু সেই সত্যাগ্রহের কথা আর নয়, সেকথা আমরা কাল কাজীর সমাধির সামনে বসে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করব। আজ আমি শুধু কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করব।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'চৈতন্য যখন পথে বাহির হইলেন তখন বাংলাদেশের গানের সুর পর্যন্ত ফিরিয়া গেল। তখন এককণ্ঠবিহারী বৈঠকি সুরগুলো কোথায় ভাসিয়া গেল। তখন সহস্র হৃদয়ের তরঙ্গহিল্লোল সহস্র কণ্ঠ উচ্ছ্বসিত করিয়া নূতন সুরে আকাশ ব্যাপ্ত হইতে থাকিল। তখন রাগরাগিণী ঘর ছাড়িয়া পথে বাহির হইল, একজনকে ছাড়িয়া সহস্র জনকে বরণ করিল। বিশ্বকে পাগল করিবার জন্য কীর্তন বলিয়া এক নূতন কীর্তন উঠিল।…"

"হরিবোল, হরি হরিবোল…" কয়েকজন শ্রোতা সোচ্চার স্বরে জয়ধ্বনি দিয়ে ওঠেন।

একটু থেমে প্রভুপাদ আবার বলতে থাকেন, "১২৯৪ বঙ্গাব্দের এই একই চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ আরও লিখেছেন—'আমাদের আশ্বাসের কারণও আছে। আমাদের বাঙালির মধ্যে হইতেই তো চৈতন্য জন্মিয়াছিলেন।…তখন তো সাম্য ভ্রাতৃভাব প্রভৃতি কথাগুলোর সৃষ্টি হয় নাই,… তখন এমন কথা কী করিয়া বাহির হইল—

মার খেয়েছি না হয় আরও খাব।
তাই বলে কি প্রেম দিব না? আয়!'

অতএব ভক্তবৃন্দ! আমি আবার সেই গানটি গেয়ে আজকের মতো আপনাদের কাছ থেকে ছুটি নেবো। কিন্তু আসর শেষ হবে না। কারণ আমার পরে রসময়দা রামায়ণ গাইবেন আর রাধেশ্যাম গৌরলীলা কীর্তন করবে।"

একটু থেমে প্রভুপাদ আবার হারমনিয়াম কাছে টেনে নেন। তারপরে তাঁর মিষ্টিগলায় গান ধরেন—"

"যদি গৌর না হইত কেমনে হইত
কেমনে ধরিতাম দে'।
রাধার মহিমা প্রেমরসসীমা
জগতে জানাতো কে॥"

॥ তিন ॥

ঘুম ভাঙল মাইকের শব্দে। বলা বাহুল্য মাইকে প্রভুপাদের গান বাজছে—প্রভাতী সুরের কীর্তন। ভারী ভাল লাগছে।

শুনতে শুনতে বালিশের তলা থেকে টর্চটা বের করি, ঘড়ি দেখি—পাঁচটা বাজে। তাই হবে, বাইরে এখনও অন্ধকার রয়েছে, শীতটাও বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে। তাহলেও স্লীপিং ব্যাগের মায়া কাটিয়ে উঠে বসতে হবে। আমরা গৌড়মণ্ডল পরিক্রমায় বেরিয়েছি। আমাদের দিন শুরু হয়ে গিয়েছে।

গান থেমে গেল, শুরু হল ঘোষণা—ভক্তবৃন্দ, এখুনি প্রভুপাদ মঙ্গলারতি শুরু করবেন, আপনারা মন্দিরের সামনে চলে আসুন! আরতির পরে মালপত্র গুছিয়ে গাড়োয়ানদের দিয়ে দিন। গাড়িগুলো আগে ছেড়ে দিতে হবে। তাছাড়া আরতির পরে সামিয়ানা খুলে দেওয়া হবে।

রসময়দা উঠে বসলেন। আমরা দুজনে মণ্ডপের ভাঁড়ার-ঘরে শুয়েছি। মাটির মেঝে তার ওপরে একদিক খোলা, তবু শীত লাগে নি। লাগবে কেমন করে, আমি যে ফোমের ম্যাট্রেস পেতে স্লীপিং ব্যাগের ভেতরে শুয়েছি। রসময়দাও বেশ ভাল বিছানা নিয়ে এসেছেন। প্রভুপাদ তাঁর তিন ছেলেকে নিয়ে মণ্ডপে শুয়েছেন। তাঁদেরও বোধকরি শীত লাগে নি। কিন্তু মানসীর? জানি না কৃষ্ণা কোথায় তাদের রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করতে পেরেছে?

মণ্ডপে মঙ্গলারতি শুরু হয়ে গেল। আমি ও রসময়দা মালপত্র গোছাতে শুরু করি। সেই সঙ্গে ভেবে চলি গতরাতের কথা—

রাত সাড়ে ন'টা নাগাদ প্রভুপাদের পাঠ শেষ হল। তারপরে শুরু হয়েছে রসময়দার রামায়ণ গান। অবশেষে আসরে এসেছেন রাধেশ্যাম দাস। তাঁর গৌরলীলা কীর্তন মধ্যরাত অবধি নিদয়া গ্রামের সহজ সরল ও দরিদ্র মানুষ-গুলোকে আনন্দময় করে রেখেছে।

আমরা অবশ্য তার আগেই প্রসাদ পেয়েছি। আমার খিচুরির ভাবনাটা মিথ্যে হয় নি। শীতের রাতে খিদের পেটে আলু-কপি দিয়ে গরম-গরম খিচুরি সত্যি ভারী ভাল লেগেছে।

প্রসাদ পাবার পরে আমরা মণ্ডপে এসে শুয়ে পড়েছি। শুয়ে শুয়ে গৌরলীলা কীর্তন শুনেছি। মানসীও কৃষ্ণার সঙ্গে চলে গিয়েছে আশ্রয়ে। সহযাত্রীরা

যাঁরা আশ্রয় সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন, তাঁরা প্রায় সকলেই চলে গিয়েছেন। কিন্তু গ্রামবাসীরা কেউ চলে যান নি। তাঁরা প্রচণ্ড শীতকে উপেক্ষা করে সামিয়ানার নিচে বসে রয়েছেন। কীর্তন শুনেছেন।

সেই সঙ্গে বসে থাকতে হয়েছে আমার অনেক সহযাত্রীকে। তাঁরা আশ্রয় খুঁজে পান নি। কীর্তন শেষ হলে গ্রামবাসীরা সামিয়ানা ছাড়ার পরে তাঁরা সামিয়ানার নিচে বিছানা পেতেছেন। এই প্রচণ্ড শীতে চারিদিক খোলা সামিয়ানার নিচে শুয়ে তাঁদের চোখে ঘুম এসেছে কিনা জানা নেই আমার। তবে সামিয়ানা খুলে ফেলার কথা মাইকে ঘোষণা করা মাত্র, তাঁরা সবাই উঠে বসেছেন। ঘুমোতে না পারলেও তাঁরা অবাধ্য হন নি।

মঙ্গলারাত্রির পরে মালপত্র নিয়ে নেমে আসি মণ্ডপ থেকে। এখনও কুয়াশার জন্য ভোরের আলো ছড়িয়ে পড়তে পারে নি, আলো আর আঁধারের লুকোচুরি চলেছে। কিন্তু আমাদের গৌড়মণ্ডল পরিক্রমার দিন শুরু হয়ে গিয়েছে। কাল রাতে প্রসাদের পরে বাসনপত্র ধুয়ে-মেজে চাল-ডাল তরি-তরকারী তেল-মশলা গুছিয়ে গাড়ি বোঝাই করে রাখা হয়েছিল। এইমাত্র খাবারের গাড়ি রওনা হয়ে গেল। রান্নার ঠাকুর আঁকুল তার দলবল নিয়ে সঙ্গে চলল। আজকের গন্তব্যস্থল রাজাপুর। ওরা সোজা সেখানে চলে যাবে। গিয়েই রান্না চড়িয়ে দেবে। আমরা যাবো ঘোরা পথে। তার মধ্যে রান্না হয়ে যাবে। গিয়েই প্রসাদ পেয়ে যাবো।

এখন বাকি তিনখানি গাড়িতে যাত্রীদের মালপত্র বোঝাই করা হচ্ছে। স্বেচ্ছাসেবকরা তো রয়েছেনই, যাত্রীরাও কেউ কেউ গাড়ি বোঝাইয়ের তদারকি করছেন, অর্থাৎ নিজের বিছানা কিম্বা বাক্সটি ঠিকমত বাঁধা হল কিনা তাই দেখছেন। তবে অধিকাংশ যাত্রী চায়ের দোকানের সামনে হাজির হয়েছেন। মণ্ডপের কাছেই চায়ের দোকান, নিদয়ার একমাত্র রেঁস্তোরা। মুড়ি তেলেভাজা ও চা-বিস্কুট পাওয়া যায়, মানে পাওয়া যেত। কিন্তু এখন পাওয়া দুষ্কর। কারণ আমার শতাধিক সহযাত্রী দোকানীকে ঘেরাও করেছেন। সপরিবারে হাত চালিয়েও সে সরবরাহ করে উঠতে পারছে না। তার দুরবস্থা দেখে আমার চায়ের নেশা কেটে গেল।

অথচ এ নেশা বড় জবর নেশা। কলকাতায় চা না এলে ঘুম ভাঙে না আমার। তার ওপর খুবই শীত পড়েছে। তবু মনে হচ্ছে চা না পেলে আজ আমার কোনো অসুবিধে হবে না। আমি অনায়াসে যাত্রা করতে পারব। পথে কোথাও সুযোগ পেলে খেয়ে নেব, না পেলে খাবো না। তাহলে কি

নেশা মনের দাস ?'

কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাকে নেশা ছাড়তে হল না। মানসী বোধকরি আমার অসহায় অবস্থাটি দূর থেকে দেখে থাকবে। একটু বাদে কৃষ্ণা চা ও মুড়ি এনে হাজির করে। কৃতজ্ঞ চিত্তে আমি তার উপহার গ্রহণ করি।

প্রভুপাদ মণ্ডপ থেকে নেমে গাড়ির কাছে আসেন। আমি তাঁকে অনুসরণ করি। প্রভুকে সামনে পেয়েই গাড়োয়ানদের নেতা গুরুপদ অভিযোগ করে, "আজ মাল বেড়ে গিয়েছে বাবা!"

"সেকিরে! মাল বেড়ে যাবে কেমন করে! লোক তো একই রয়েছে!" প্রভু বিস্মিত হন।

গুরুপদ বলে, "কাল যাঁরা ছোট ব্যাগ কিম্বা পুটুলি সঙ্গে রেখেছিলেন, আজ তাঁরা সেগুলিও গাড়িতে দিয়ে দিয়েছেন।"

কথাটা হয়তো মিথ্যে নয়। কালকের অভিজ্ঞতা থেকে তাঁরা বুঝেছেন, এই সব ছোটমাল নিয়েও পথচলা কষ্টকর। তাই আজ সেগুলি গাড়িতে চাপিয়ে ঝাড়া হাত-পা হয়েছেন। কিন্তু গাড়োয়ান তার গরুদের মুখ চেয়ে প্রতিবাদ না করে পারছে না।

প্রভুপাদ বুঝিয়ে-সুজিয়ে গাড়োনদের শান্ত করলেন। তারপরে গৌরদাকে বললেন, "আজ ঠাকুরের সিংহাসন সাইকেল ভ্যানে যাবে। আর আমরা সাতটার মধ্যে যাত্রা করব।"

তা কিন্তু পারা গেল না। তবে ঠিক সওয়া সাতটায় যাত্রা করা গেল। গাছে ছাওয়া মেটোপথ ধরে সংকীর্তন শোভাযাত্রা এগিয়ে চলল। গ্রামের কয়েকজন নারী-পুরুষ এবং একদল ছেলে-মেয়ে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে, কেউ বা কীর্তন করছে।

এরা আমাদের অপরিচিত তবু এগিয়ে দিতে চলেছে। কতদূর সঙ্গে যাবে বুঝতে পারছি না। তবে ওদের কীর্তন শুনে কেউ বলতে পারবে না, ওরা আমাদের সহযাত্রী নয়।

পথের পাশে পাশে গাঁয়ের বাড়ি-ঘর। দুয়েকটি পাকা ছোটবাড়িও রয়েছে। পথের ধারে একটা বড় আমগাছের তলায় পাঠশালা বসেছে। গুরুমশাই এবং পড়ুয়ারা অবশ্য এখন পড়া বন্ধ করে আমাদের দেখছে।

পাঠশালা ছাড়িয়ে একটা বড় বাগান—আম-কাঠালের বাগান। তারপরেই পাম্প্-হাউস, ক্ষেতে জল সেচন করার বৈদ্যুতিক পাম্প্। তার মানে নিদয়া গ্রামে বিদ্যুৎ এসেছে। কিন্তু গাঁয়ের মানুষরা বৈদ্যুতিক আলো জ্বালাবার

সুযোগ পান নি। তাঁরা এখনও অন্ধকারে রয়েছেন। জানি না কবে তাঁদের আঁধার ঘুচবে?

পাম্প্-হাউস ছাড়িয়ে আমরা বাঁধের ওপরে উঠে এলাম—নদীর বাঁধ। ছোটনদী, এখন সামান্যই জল কিন্তু বেশ উঁচু বাঁধ। বর্ষায় যে এরা রুদ্রমূর্তি ধারণ করে।

এখানেই নিদয়া গ্রাম শেষ হয়ে গেল। এখান থেকেই নিদয়ার মানুষরা বিদায় নিলেন। আমরা সারি বেঁধে বাঁধের ওপর দিয়ে এগিয়ে চলি। বাঁয়ে নদী। নদীর নাম গুরগুরি—গঙ্গায় গিয়ে পড়েছে। আর ডাইনে ক্ষেত—বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত।

খানিকটা এগিয়ে একটি গ্রাম। প্রভুপাদ বলেন, "নিরঞ্জন নগর।"

তিনি শোভাযাত্রা থামাতে বললেন। আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কীর্তন করতে থাকলাম।

প্রভু কেন আমাদের থামতে বলেছেন, বুঝতে পারি একটু বাদে। ক্ষেতের আলের ওপর দিয়ে দলে দলে নারী-পুরুষ আর ছেলে-মেয়ে ছুটে আসছে। আসছে ঐ নিরঞ্জন নগর গ্রাম থেকে।

তারা আসে। ঠাকুর প্রণাম করে, সাধ্যমত পাঁচ-দশ পয়সা প্রণামী দেয়। পরিক্রমা সম্পর্কে দু-চারটি প্রশ্ন করে। আমরা উত্তর দিই।

প্রভুপাদ ইসারা করেন। শোভাযাত্রা নড়ে ওঠে, এগিয়ে চলে বাঁধের পথ ধরে।

একটু বাদে আবার থামতে হল। এবারেও প্রভুর নির্দেশে। তবে এখানে কোনো গ্রাম নেই। কেবল জায়গাটি ভারী সুন্দর। আর তাই প্রভু ক্ষেতে নেমে আমাদের ছবি নিচ্ছেন। প্রভুপাদ যে আমাদের লীডার-কাম্-গাইড-কাম্-ক্যামেরাম্যান্!

ছবি তুলে আমাদের কাছে এসে প্রভুপাদ মাইক হাতে নিলেন। কীর্তন থেমে গেল। প্রভুপাদ বলছেন, "আমরা আজ রুদ্রদ্বীপ থেকে সীমন্তদ্বীপে যাবো। বেলপুকুর, বল্লালদীঘি, সিমুলিয়া, স্বরডাঙ্গা, রাজাপুর ও বামনপুকুর প্রভৃতি গ্রাম নিয়ে সেকালের সীমন্তদ্বীপ। আমরা এখন বেলপুকুর গ্রামে শ্রীগৌরাঙ্গের মাতুলালয়ে চলেছি।"

একবার থামেন প্রভুপাদ। তারপরে আবার বলেন, "বেলপুকুর গ্রামটি নদীর ওপারে। একটু এগিয়ে আমরা একটা খেয়া পাবো। সেখানে নদী পার হলে, পথ কমে যায়। কিন্তু খেয়া নৌকোটি বড়ই ছোট, এতগুলো

মানুষ। পার হতে অনেক সময় লেগে যাবে। তাই আমাদের যেতে হবে বেশ খানিকটা ঘুরে, পুল পেরিয়ে।"

আবার শুরু হল কীর্তন। সংকীর্তন শোভাযাত্রা চলল এগিয়ে। আমরা উত্তরপুবে চলেছি। ধুলিময় প্রশস্ত পথ। পথটা ক্রমেই ডাইনে ঘুরে গেছে। অনেকটা দূরে গিয়ে বাঁয়ে বাঁক ফিরে সোজা নদীর দিকে এগিয়ে পুলে উঠেছে। পুলটা দেখা যাচ্ছে সামনে, কিন্তু পথটা অনেকখানি ঘুরে গিয়ে ওখানে পৌঁচেছে।

অশীতিপরা আশ্রম-মাতা কিন্তু সমানে আমাদের সঙ্গে হেঁটে চলেছেন। ছোট-খাটো সুন্দর মানুষটি। দেখলে সত্যি শ্রদ্ধা হয়। তাই বোধকরি প্রভুপাদ তাঁকে বলেন, "মা, আপনার কষ্ট হলে বলুন! সামনে বড় রাস্তায় রিক্সা পাওয়া যাবে।"

আশ্রম-মাতা হাতজোড় করেন। করুণ কণ্ঠে বলেন, "এমন কথা বলবেন না বাবা! পরিক্রমায় বেরিয়েছি, রিক্সায় উঠব কেমন করে? আমি পারব, আপনার আশীর্বাদে আমি নিশ্চয়ই পারব। আপনি দেখে নেবেন।"

প্রভুপাদ তাঁকে নিশ্চয়ই আশীর্বাদ করলেন। কিন্তু আমি মনে মনে মৃদু না হেসে পারি না। গতকাল আশ্রমমাতা বলেছেন—আজ থেকে সাইকেল রিক্সা করে নেবেন। কিন্তু আজ অন্যকথা বলছেন।

'নিত্যানন্দ নাম ভজো, গৌর গুণধাম…'

কীর্তন করতে করতে আমরা একটা গ্রামে ঢুকলাম। প্রভুপাদ বলেন, "এই হল শ্রীগৌরাঙ্গের মাতুলালয় বেলপুকুর গ্রাম, শুদ্ধ নাম বিল্বপুষ্করিণী।"

বেশ বর্ধিষ্ণু গ্রাম। কৃষ্ণনগর থানার অন্তর্গত। আমরা মাটির পথ ছাড়িয়ে পিচের পথে পৌঁছলাম। পথের পাশে পাকাবাড়ি আর ইলেকট্রিক লাইন। এই পথটি হুলোরঘাট (মায়াপুর) থেকে কৃষ্ণনগর গিয়েছে। এপথে নিয়মিত বাস ও মিনিবাস চলে।

কিন্তু এপথ নগ্নপদ পদযাত্রীদের জন্য নয়, এপথে পদযাত্রা অচল। কারণ পথের অধিকাংশ জায়গাতেই পিচ উঠে গিয়ে পাথরকুচি বেরিয়ে পড়েচে। পায়ে পাথর বিঁধছে। মাটির পথে ধুলো উড়ছিল। তবু সেপথ এর চাইতে অনেক ভাল ছিল।

সুখের কথা আমাদের বেশিক্ষণ পিচ্ পথে পদচারণা করতে হল না। আবার ডানদিকে মাটির পায়ে-চলা পথে নেমে এলাম। মিনিট তিনেক হেঁটে একটি জীর্ণ মন্দিরের সামনে এসে দাড়ালাম।

এখানে বড়-বড় গাছে ছাওয়া অনেকখানি ফাঁকা জায়গা। শীতকাল হলেও বেশ চড়া রোদ উঠেছে। সত্যি বলতে কি গরম লাগছিল। ছায়া-শীতল প্রাঙ্গণটিতে পৌঁছে এখন ভারী আরাম লাগছে।

কিন্তু তীর্থস্থানে পৌঁছে প্রথমেই দর্শন সেরে নিতে হয়। তারপরে বিশ্রাম। তাই এগিয়ে আসি মন্দিরের সামনে। ছোট মন্দির। প্রথমে বারান্দা, তারপরে মন্দির। দরজার দুদিকে লেখা—'বংশানুক্রমিক সেবাইত সাবিত্রী-বালা দেবীর একমাত্র পুত্র ব্রহ্মচারী নিমাইচাঁদ দেবশর্মন।

বিল্বপুস্করিণী, নদীয়া।'

সহযাত্রীদের ভিড় এড়িয়ে উঠে আসি বারান্দায়। মন্দিরে আলোর অভাব। তারই মধ্যে দর্শন করি—কাঠের সিংহাসনে বংশীধারী মদনমোহনের দারুময় বিগ্রহ। বেশ বড় মূর্তি।

আমি প্রণাম করি। শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করি—এখানেই সেকালের প্রখ্যাত পণ্ডিত ও গণৎকার নীলাম্বর চক্রবর্তী বাস করতেন। এখানেই শচীমাতা জন্মগ্রহণ করেছেন আবার এই বাড়িতে বসেই অধ্যাপক জগন্নাথ মিশ্র একদিন শচীদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। এই পুণ্যস্থান প্রতিনিয়ত ন'দের নিমাইয়ের পদধুলিতে পুলকিত হয়ে উঠেছে।…আমার শরীরের শিরায় শিরায়ও পুলকের শিহরণ বয়ে যায়। আমি পুনরায় প্রণাম করি।

নেমে আসি মন্দির থেকে। একটা গাছের ছায়ায় এসে বসি। শুরু হয় কীর্তন।

কীর্তনের পরে প্রভু মাইক হাতে নিলেন। তিনি বলতে শুরু করলেন, "ভক্তবৃন্দ, আমরা এখন একটি অতি পবিত্রস্থানে উপস্থিত হয়েছি। এটি শ্রীচৈতন্যদেবের মহীয়সী মাতা শ্রীশচীদেবীর জন্মস্থান। কিন্তু এই পুণ্যস্থানের কথা বলার আগে তখনকার নবদ্বীপের অবস্থাটি একবার ভেবে নেওয়া ভাল।

ভক্তবৃন্দ, ভক্তকবি শ্রীবৃন্দাবনদাস তাঁর শ্রীচৈতন্যভাগবতে তখনকার নবদ্বীপ সম্পর্কে বলেছেন—

'নানা দেশ হৈতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পঢ়িলে সে বিদ্যারস পায়॥'

নবদ্বীপে প্রথম টোল স্থাপন করেন রামচন্দ্র সিদ্ধান্তবাগীশ। তাঁর আমলে নবদ্বীপে আরও দুজন সুপণ্ডিত অধ্যাপক ছিলেন। তাঁদের একজনের নাম মহেশ্বর বিশারদ, অপরজন নীলাম্বর চক্রবর্তী।

বিশারদের বাড়ি ছিল বিদ্যানগরে। বিশারদের দুই ছেলে বাসুদেব

সার্বভৌম ও বাচস্পতি।

সার্বভৌম ছিলেন যেমন বুদ্ধিমান ও তেমনি মেধাবী। নবদ্বীপের মানুষ তখন ন্যায়শাস্ত্রের প্রতি অতিশয় আগ্রহশীল হলেও পুঁথির অভাবে নবদ্বীপে উচ্চতর ন্যায়শাস্ত্র চর্চার তেমন সুযোগ ছিল না। ন্যায়শাস্ত্র চর্চার প্রধানকেন্দ্র ছিল মিথিলা। গৌড়ীয় ছাত্রদের মিথিলায় গিয়ে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করে আসতে হত। তাঁদের কাউকে কিছু লিখে আনতে দেওয়া হত না। এই অবস্থার অবসান করার সঙ্কল্প নিয়ে সার্বভৌম মিথিলায় গেলেন। কিছুকাল পরে ন্যায়ের প্রধান প্রধান গ্রন্থ মুখস্থ করে নবদ্বীপে ফিরে এলেন। ফিরে এসে বিদ্যানগরে টোল স্থাপন করলেন। ন্যায়শাস্ত্রে মিথিলার একাধিপত্য লোপ পেল। অল্পদিনের মধ্যেই ন্যায়শাস্ত্র চর্চার জন্য নবদ্বীপ ভারত বিখ্যাত হয়ে উঠল। আর তাই বিদ্যারস আস্বাদন করতে নানাদেশ থেকে দলে দলে লোক নবদ্বীপে আসতে শুরু করলেন।

শ্রীহট্ট জেলার ঢাকা-দক্ষিণ গ্রামে শ্রীউপেন্দ্র মিশ্র নামে ভরদ্বাজ গোত্রীয় জনৈক বৈদিক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তাঁর সাত পুত্র, তৃতীয় পুত্রের নাম শ্রীজগন্নাথ মিশ্র। তিনি ছিলেন যেমন রূপবান তেমনি মেধাবী ও জ্ঞানান্বেষী। ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে তিনি নবদ্বীপ এলেন। কিছুকাল অধ্যয়নের পরেই আপন পাণ্ডিত্যের জন্য পুরন্দর উপাধি পেলেন। জগন্নাথের রূপ ও গুণে মুগ্ধ হয়ে নীলাম্বর চক্রবর্তী তাঁর সঙ্গে শচীদেবীর বিয়ে দিলেন।…"

"শ্রীমন্মহাপ্রভুর মাতা শচীদেবী কি নীলাম্বরের একমাত্র মেয়ে ছিলেন?" মাঝখান থেকে জনৈক সহযাত্রী প্রশ্ন করেন।

প্রভুপাদ উত্তর দেন, "না। নীলাম্বরের দুই ছেলে ও দুই মেয়ে। শচীদেবী বড় মেয়ে।" একবার থামেন তিনি। তারপরে আবার বলতে থাকেন, "এই পুণ্যস্থানেই শচীমাতা জন্মগ্রহণ করেছেন, এখানেই তাঁর বিয়ে হয়েছে। এখান থেকেই জগন্নাথ তাঁকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়েছেন।

জগন্নাথ কিন্তু আর শ্রীহট্টে ফিরে গেলেন না। তিনি শচীদেবীকে নিয়ে নবদ্বীপেই সংসার পাতলেন। নবদ্বীপকেই তাঁর বিদ্যাচর্চার কর্মক্ষেত্র নির্বাচিত করলেন।

কিন্তু তাঁদের সংসার সুখের হল না। কারণ পর পর আটটি মেয়ের জন্ম হল, অথচ একজনও বাঁচল না। অবশেষে তাঁদের একটি ছেলে হল। জগন্নাথ তাঁর নাম রাখলেন বিশ্বরূপ।

বিশ্বরূপের বয়স যখন আট বছর তখন জগন্নাথ তাঁর বাবার চিঠি পেয়ে

ছেলে-বউকে নিয়ে নবদ্বীপ থেকে শ্রীহট্ট চলে গেলেন।

কিন্তু বোধকরি বছরখানেকের বেশি বাড়িতে থাকতে পারলেন না। থাকবার কিন্তু ইচ্ছে ছিল। বাস্তবিকপক্ষে জগন্নাথ জন্মস্থানেই স্থায়ী হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পেরে উঠলেন না। একদিন রাতে জগন্নাথের মা শোভাদেবী স্বপ্ন দেখলেন—জনৈক মহাপুরুষ তাঁকে বলছেন, 'তোমার পুত্রবধূর গর্ভে স্বয়ং ভগবান জন্মগ্রহণ করবেন, তাকে তাড়াতাড়ি নবদ্বীপ পাঠিয়ে দাও।'

দশহরা উপলক্ষে গঙ্গাস্নান করবার জন্য একদল যাত্রী শ্রীহট্ট থেকে নবদ্বীপ আসছিলেন। স্ত্রী ও পুত্রকে নিয়ে জগন্নাথ তাঁদের সঙ্গে নবদ্বীপ ফিরে এলেন।

দিন যায়, মাস যায়। শচীদেবীর গর্ভসঞ্চারের পরে বছর ঘুরে এলো, তবু তাঁর সন্তান ভূমিষ্ট হল না। জগন্নাথ ব্যস্ত হয়ে নীলাম্বর চক্রবর্তীর শরণ নিলেন।

নীলাম্বর গণনা করে বললেন—শচীর গর্ভে সত্বর স্বয়ং ভগবান জন্মগ্রহণ করবেন।

শুনে সবাই শান্তিলাভ করলেন।"

সহসা থেমে গেলেন প্রভুপাদ। আমরা তাঁর দিকে তাকাই।

একটু হেসে তিনি বলেন, "ভক্তবৃন্দ, আপাতত আপনাদেরও এই পর্যন্ত শুনে শান্তিলাভ করতে হবে। গৌরাঙ্গজন্মের কথা আমরা পরে আলোচনা করব। এখন আপনারা বরং এঁর কাছ থেকে কিছু শুনুন!"

প্রভুপাদ তাঁর পাশে বসে থাকা একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে দেখিয়ে দেন। তারপরে বলেন, "ইনি এই গ্রামের একজন প্রাচীন বাসিন্দা।"

বৃদ্ধ মাইক হাতে নিয়ে বলতে শুরু করেন, "পুরুষানুক্রমে শ্রীল নীলাম্বর চক্রবর্তীর সেবাইত ছিলেন সাবিত্রীবালা দেবী। অকালে তাঁর পতি বিয়োগ হয়। ভক্তদের দানে তিনি কোনরকমে এই মন্দিরের সেবাপূজা সম্পন্ন করতেন। সেই সঙ্গে তাঁর একমাত্র পুত্রটিকে মানুষ করতে থাকেন। কিন্তু পুত্রটির বয়স যখন সাত বছর, তখন সাবিত্রীদেবী দেহত্যাগ করেন।

সেই থেকে আমি সেই অনাথ শিশুটিকে মানুষ করবার গুরুদায়িত্ব গ্রহন করেছি। এখন তার বয়স চোদ্দ বছর, সে স্কুলে পড়ছে। বলা বাহুল্য মন্দিরের সেবাপূজার ব্যবস্থাও আমাকেই করতে হয়। শ্রীল নীলাম্বর চক্রবর্তীর সেই কিশোর বংশধরের প্রতিপালন এবং এই পুণ্যপীঠের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আমি তাই আপনাদের সাহায্যপ্রার্থী।"

আমরা প্রায় প্রত্যেকেই সাধ্যমত প্রণামী দিলাম। তারপরে আবার কিছুক্ষণ কীর্তন হল। কীর্তনের পরে প্রভু বললেন, "সবে দশটা বেজেছে,

আমরা ঠিক এগারোটায় এখান থেকে রওনা হব। নিদয়া থেকে পাঁচ মাইল এসেছি, আরও ছ' মাইল হাঁটতে হবে। কাছেই চায়ের দোকান আছে, মুড়ি আর বিস্কুট বোধহয় পাওয়া যাবে। তোমরা কিছু খেয়ে নিতে পারো।"

ব্যাস, সঙ্গে সঙ্গে মন্দির ও অঙ্গন ফাঁকা হয়ে গেল। প্রভু শুধু বসে রইলেন মন্দিরের বারান্দায়, মতি তাঁকে জল এনে দিল। মতি মানে শ্রীমতী মতিরাণী দাস। হুগলীর সাহাগঞ্জে থাকে। বিবাহিতা শিক্ষিতা যুবতী, সরকারী চাকরি করে। ছুটি নিয়ে পরিক্রমায় এসেছে। গুরুদেব ও গুরুপুত্রদের যথাসাধ্য সেবা করে চলেছে।

প্রভুর পুত্রদের অর্থাৎ দাদাদের নিয়ে কৃষ্ণা ও মানসীর সঙ্গে চায়ের দোকানে এলাম। রসময়দাও আমাদের সঙ্গে এলেন। রসময়দা মানুষটি বড়ই ভাল। যেমন দেখতে সুন্দর, তেমনি মিষ্টি স্বভাব। শান্ত ধীর স্থির ও সুরুচি সম্পন্ন ভদ্রলোক। বয়সে আমাদের চেয়ে কিছু বড়। অথচ অক্লেশে পরিক্রমার কষ্ট সয়ে চলেছেন। তিনি একজন ব্যস্ত শিল্পী। কিন্তু প্রভুর অনুরোধে সব কাজ ফেলে আমাদের সঙ্গী হয়েছেন। রাতে রামায়ণ গাইবেন।

চা খেয়ে ফিরে এলাম। একটু বাদে ঠিক সওয়া এগারোটায় আবার শোভাযাত্রা শুরু হল।

কীর্তন থামিয়ে প্রভু মাইক হাতে নিলেন। বললেন, "নবদ্বীপের আকৃতি হল একটি অষ্টদল পদ্মের মতো। অন্তর্দ্বীপ অর্থাৎ নবদ্বীপ শহর হচ্ছে সেই পদ্মের কর্ণিকা। তাকে ঘিরে চারিপাশে আটটি দ্বীপ—রুদ্রদ্বীপ, সীমন্তদ্বীপ, গোদ্রুমদ্বীপ, মধ্যদ্বীপ, কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ ও মোদদ্রুমদ্বীপ। আমরা গতকাল অন্তর্দ্বীপ থেকে যাত্রা করে রুদ্রদ্বীপে রাত কাটিয়েছি। আজ সকালে সেখান থেকে এই সীমন্তদ্বীপে এসেছি। এবারে চলেছি গোদ্রুমদ্বীপে। গাদি-গাছা, বালিচর, মহেশগঞ্জ, তিওরখালি, আমঘাটা, সুবর্ণবিহার, শ্যামনগর, দেবপল্লী বা দেপাড়া ও রাজাপুর প্রভৃতি গ্রাম নিয়ে এই দ্বীপ। আজ আমরা রাজাপুর জগন্নাথ বাড়িতে রাত কাটাবো। পথে ভক্ত চাঁদকাজীর সমাধিপীঠ দর্শন করব।"

॥ চার ॥

'নবদ্বীপ মধ্যে মায়াপুর নামে স্থান।
যথা জন্মিলেন গৌরচন্দ্র ভগবান্ ॥...'

আমার সহযাত্রীগণ শ্রীনরহরি চক্রবর্তী রচিত 'ভক্তিরত্নাকর' থেকে কীর্তন করতে করতে গৌড়পরিক্রমা করছেন। আমরা বেলপুকুর থেকে বামনপুকুর চলেছি। সেই একই পথে আবার যাচ্ছি গুরগুরি নদীর দিকে। নদীর সেই পুল পর্যন্ত পুরনো পথ। তারপরে নিদয়ার দিকে অর্থাৎ পশ্চিমে না গিয়ে দক্ষিণ দিকে বামনপুকুরের পথ ধরব। আমরা শ্রীচৈতন্যের মাতুলালয় দর্শন করে ভক্ত চাঁদকাজীর সমাধিপীঠে চলেছি।

'যে দেখে বারেক তা'র তাপ যায় দুর।
হেন মায়াপুরে চলে আচার্যঠাকুর ॥
নরত্তম, রামচন্দ্র দোঁহে সঙ্গে লৈয়া।
প্রবেশয়ে মায়াপুরে অধৈর্য হইয়া ॥'

ভক্তবৃন্দ ভক্তিরত্নাকর থেকে কীর্তন করে চলেছেন। আমিও মনে মনে ভক্তিরত্নাকরের কথাই ভেবে চলি। শ্রীরূপ গোস্বামীর স্নেহধন্য বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর পুত্র নরহরি। তিনি একজন সুদক্ষ গায়ক বাদক পাচক কবি ও ঐতিহাসিক ছিলেন। শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীলোচনদাস ঠাকুর রচিত শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থে যে-সব ভক্ত-গোস্বামীদের কথা তেমন করে লেখা হয়ে ওঠে নি, তাঁদের কথা লেখার জন্যই নরহরি লেখনী ধারণ করে-ছিলেন। এই গ্রন্থের পঞ্চম তরঙ্গে ব্রজপরিক্রমা ও দ্বাদশ তরঙ্গে তিনি শ্রীনিবাসাচার্য, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের গৌড়পরিক্রমার কথা লিখেছেন। সুতরাং ভক্তিরত্নাকর কেবল ভক্তিগ্রন্থ নয়, ভ্রমণ কাহিনীও বটে। এবং বাংলা ভ্রমণসাহিত্যের ইতিহাসে গ্রন্থখানি অতিশয় মূল্যবান। অবশ্য ইতিহাস হিসেবে নাকি ভক্তিরত্নাকরের মূল্য অতি সামান্য। কিন্তু ভ্রমণ-কাহিনী হিসেবে এই গ্রন্থের অসাধারণ মূল্য সম্পর্কে কারও কোনো সন্দেহ নেই। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন—'তিনি (নরহরি) বৃন্দাবন ও নবদ্বীপের যে সুবৃহৎ ও পরিষ্কার মানচিত্র আঁকিয়াছেন, তাহাতে কালের পৃষ্ঠায় এই দুই স্থানের ভৌগোলিক তত্ত্ব চিরদিন অঙ্কিত থাকিবে।'

'রজনী প্রভাতে শ্রীঈশান মহাশয়।
নদীয়া-ভ্রমণে চলে উল্লাস হৃদয় ॥
শ্রীনিবাসাচার্য, নরোত্তম, রামচন্দ্র।
ঈশানের সঙ্গে চলে উথলে আনন্দ ॥'

শ্রীনিবাস তাঁর দুই সঙ্গী নরোত্তম ও রামচন্দ্রকে নিয়ে বৃন্দাবন থেকে বিষ্ণুপুর হয়ে নবদ্বীপে এলেন। তাঁরা শচীমাতার সেবক ও গৌরাঙ্গের পরমপ্রিয় বৃদ্ধ ঈশানের সঙ্গে গৌড়পরিক্রমা করেন। কবি নরহরি ভক্তিরত্নাকরের পঞ্চম তরঙ্গে সেই পরিক্রমার কথাই বর্ণনা করেছেন।

শ্রীনিবাসাচার্য শ্রীচৈতন্যের পার্ষদ না হলেও তাঁর একজন সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচারক। শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম ও বৈষ্ণবশাস্ত্রকে গৌড়দেশে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য তিনি সারাজীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। এবং বলা বাহুল্য তাঁর সে সাধনা সফল হয়েছে।

সহসা প্রভুপাদ হাত উঁচু করেন, থেমে গেল কীর্তন, থেমে যায় আমার ভাবনা। ইতিমধ্যে আমরা পুল ছাড়িয়ে এসেছি। সামনে রাস্তাটা ডাইনে বাঁক নিয়েছে। এখানে কোনো লোকালয় নেই। পথের দুপাশেই চাষের ক্ষেত আর সামনে একটা ছোট খাল। খালের ওপরে বাঁশের সাঁকো। সেটি দেখিয়ে প্রভুপাদ বলেন, "আমরা এবারে বামনপুকুর গ্রামে প্রবেশ করব।" সীমুলিয়া বা সীমন্তদ্বীপের প্রধান গ্রাম বামনপুকুর। নামটি ব্রাহ্মণপুষ্কর শব্দের অপভ্রংশ। বেলপুকুর কৃষ্ণনগর থানায় কিন্তু বামনপুকুর নবদ্বীপ থানার অন্তর্গত। বামনপুকুর কৃষ্ণনগর থেকে মাত্র ৮ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত।"

থামলেন প্রভুপাদ। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল কীর্তন—

'ঐছে কত কহি সঙ্গে লৈয়া তিন জনে।
সিমলিয়া গ্রামে প্রবেশিলা কতক্ষণে ॥
ঈশান ঠাকুর শ্রীনিবাস প্রতি কয়।
দেখ, এই সিমলিয়া গ্রাম শোভাময় ॥'...

আমরাও গ্রামটি দেখতে দেখতে পথ চলেছি। এখন গ্রাম, কিন্তু সেকালে রাজধানী ছিল। বেশ বড় গ্রাম। বহু বাড়ি-ঘর। দলে দলে নারী-পুরুষ পথের পাশে দাঁড়িয়ে আমাদের স্বাগত জানাচ্ছেন।

বেলা একটা নাগাদ আমরা বামনপুকুর বাজারে পৌঁছলাম। বাজারের উল্টোদিকে বড় রাস্তার পাশেই চাঁদকাজীর সমাধিপীঠ। সামনে দেওয়াল দিয়ে ঘেরা একফালি মাঠ। আমরা কীর্তন করতে করতে ভেতরে প্রবেশ করি।

প্রান্তরটুকু পেরিয়ে একটি সুবিশাল গোলকচাঁপা গাছ। গাছটির গোড়া বাঁধানো। চারিদিকে সিমেন্টের রেলিং। পেছনে একটা নিমগাছ।

কিন্তু নিম নয়, দর্শনীয় হচ্ছে এই গোলকচাঁপা। কে এই গাছের নাম রেখেছেন; জানা নেই আমার। তবে এর সঙ্গে চম্পক বা চাঁপাফুল গাছের কোনো মিল নেই। শুনেছি একে দেখে উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানীরাও বিস্মিত হন। আমার নিজের কথা বলতে পারি আলপ্‌স অথবা হিমালয়ের গহন-গিরি কন্দরে, 'কিউ'* কিংবা শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেনসের কোথাও আমি এমন বিচিত্রবৃক্ষ দেখেছি বলে মনে পড়ছে না। তাছাড়া গাছটি নাকি এই সমাধির সমসাময়িক। অর্থাৎ এর বয়স প্রায় পাঁচ শ' বছর। সুতরাং শুধু বৈচিত্র্য নয়, গাছটির প্রাচীনত্বও রীতিমত বিস্ময়কর।

মূল-গাছের গোড়াতেই কাজীর সমাধি। সমাধির সামনে লেখা—

'শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য করুণার পুণ্যধারা বিস্তারে সংসারে।

মহামন্ত্র নামসংকীর্তন ধ্বনিশ্রুতি জীবাতু সঞ্চারে ॥

ইতিহাস প্রসিদ্ধ—

ভক্ত চাঁদকাজীর সমাধিপীঠ।'

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের কাছে এটি পরম পবিত্র স্থান। প্রতিদিন শত শত ভক্ত এই সমাধিপীঠ দর্শন করতে আসেন। তাঁদের সাধারণতঃ মায়াপুর থেকে হেঁটে কিংবা রিক্সা করে এখানে আসতে হয়। আমিও বার তিনেক তাই এসেছি। প্রথম এসেছিলাম প্রায় তিরিশ বছর আগে। মজার ব্যাপার, তখনও এই গোলকচাঁপা গাছটিকে এমনি সতেজ আর প্রাণময় দেখেছি। অবাক হবার কিছু নেই। এতো যেমন তেমন গাছ নয়, এ যে প্রেম-বনস্পতি। তাই এই গোলকচাঁপা ভূলোকের বিস্ময়, এমন অক্ষয় আর অব্যয়।

কীর্তন থেমে গিয়েছে। প্রভুপাদ সমাধির সিঁড়িতে বসে পড়েছেন। মাইক হাতে নিয়েছেন। আমরাও তাড়াতাড়ি যে যেখানে পারি, বসে পড়ি।

প্রভুপাদ বলতে শুরু করেন, "ভক্তবৃন্দ, আমরা এখন শ্রীচৈতন্যের করুণাধন্য ভক্তপ্রবর চাঁদকাজীর সমাধিপীঠে সমবেত হয়েছি।"

একবার থামেন প্রভুপাদ। আমরা তাঁর দিকে তাকাই। তিনি আবার

---

* রয়েল বোটানিক্যাল গার্ডেনস (ইংলণ্ড)

বলতে থাকেন, "মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য হলেন জগতের প্রথম অহিংস বিপ্লবী। চাঁদকাজীর অন্যায় আইনের বিরুদ্ধে তাঁর সেই সংকীর্তন শোভাযাত্রা এদেশের প্রথম আইন-অমান্য আন্দোলন, অবিস্মরণীয় অহিংস সত্যাগ্রহ।

আপনারা জানেন যে তার আগে সুবুদ্ধি রায় ছিলেন গৌড়ের রাজা। হোসেন খাঁ নামে তাঁর একজন পাঠান ভৃত্য ছিল। তাঁকে তিনি একটি দীঘি কাটাবার জন্য টাকা দিয়েছিলেন। একদিন রাজা জানতে পারলেন, হোসেন সেই টাকা চুরি করেছে। ক্রুদ্ধ সুবুদ্ধি হোসেনকে চাবুক মারলেন। প্রতিশোধ নেবার জন্য হোসেন বিশ্বাসঘাতক রাজকর্মচারীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে সুবুদ্ধিকে বন্দী করলেন, নিজে গৌড়ের রাজা হলেন। নূতন নাম নিলেন হোসেন সাহ।

হোসেন বুঝতে পারলেন, রাজত্ব চালাতে হলে কিছু লেখাপড়া জানা দরকার। মৌলানা সিরাজুদ্দিন নামে একজন মৌলভীকে তিনি তাঁর শিক্ষক নিযুক্ত করলেন। পরে তাঁর পাণ্ডিত্যে খুশি হয়ে হোসেন তাঁকে নবদ্বীপের কাজী অর্থাৎ গরগণা শাসক করে দিলেন। সিরাজুদ্দিনের নূতন নাম হল চাঁদকাজী।

এদিকে তখন নিমাই পণ্ডিতের পরামর্শে নবদ্বীপের ঘরে ঘরে সংকীর্তন শুরু হয়ে গিয়েছে। শ্রীবাস অঙ্গনে অহোরাত্র গীত হচ্ছে—

'হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরেরাম হরেরাম রাম রাম হরে হরে॥'

অবৈষ্ণবরা ব্যাপারটা বরদাস্ত করতে পারলেন না। তাঁরা কাজীর কাছে এসে নালিশ জানালেন। কাজী নিমাইকে জানতেন। তিনি ছিলেন নীলাম্বর চক্রবর্তীর প্রতিবেশী। নীলম্বরকে তিনি 'চাচা' বলে ডাকতেন। তিনি নিমাই পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যের কথাও শুনেছিলেন। কিন্তু নিমাই যে নিতান্তই তরুণ, প্রায় বালক বলা যেতে পারে। তাই প্রথমে তিনি সেই সংকীর্তনকে ছেলেমানুষী মনে করে ব্যাপারটায় হস্তক্ষেপ করলেন না। কিন্তু তাঁর কয়েকজন কর্মচারী ক্রমাগত তাঁকে উত্যক্ত করতে থাকল। অবশেষে কাজী একদিন সন্ধ্যায় তাদের সঙ্গে নগর পরিদর্শনে বের হলেন।

তাঁর ভুল ভেঙে গেল। তিনি সবিস্ময়ে শুনতে পেলেন সর্বত্র খোল-করতাল বাজিয়ে কীর্তন চলেছে। কাজী ক্রুদ্ধ হলেন। সঙ্গীরা সুযোগ বুঝে এক বাড়ীতে ঢুকে খোল ভেঙে ফেলল, করতাল কেড়ে নিল।

কাজী কীর্তনকে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করলেন। বললেন—আজ এই পর্যন্ত। কিন্তু এর পরে যদি কেউ নবদ্বীপে কীর্তন করে, তাহলে তাকে জাত খোয়াতে হবে।

নিরুপায় ভক্তবৃন্দ ছুটে এলেন নিমাইয়ের কাছে। নিমাই তাঁদের আশ্বাস দিলেন—তোমরা নির্ভয়ে কীর্তন কর! যদি কেউ কীর্তনে বাধা দেয়, আমি তাকে দণ্ড দেব।

কিন্তু ভক্তবৃন্দ আশ্বস্ত হতে পারলেন না, এমন কি কীর্তন করতেও পারলেন না। কারণ কাজী সৈন্য-সামন্ত নিয়ে প্রতিরাতে নগরের পথে পথে ঘুরে বেড়াতে থাকলেন। ফলে হরি-সংকীর্তন প্রায় বন্ধ হয়ে গেল।

অবশেষে ভক্তগণ আবার নিমাইয়ের কাছে এলেন। বললেন—এদেশে যখন কীর্তন করবার উপায় নেই, তখন আপনি আমাদের বিদায় দিন, আমরা অন্যদেশে গিয়ে বাস করব।

সব শুনে প্রভুর মুখের চেহারা বদলে গেল। তিনি যেন রুদ্রমূর্তি ধারণ করলেন। ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে উঠলেন—বটে, কাজী কীর্তন বন্ধ করবে, শ্রীকৃষ্ণের কীর্তন! বেশ, আমি আজ নবদ্বীপের পথে পথে কীর্তন করব, সে যদি পারে আমার কীর্তন বন্ধ করুক।

তারপরে নিমাই নিতাইকে বললেন—শ্রীপাদ, আমি আজ প্রেমবন্যায় নদীয়া ভাসাবো, আমি আজ কাজীর দর্প চূর্ণ করব। তুমি সবাইকে খবর দাও, তারা যেন দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে একটি করে মশাল নিয়ে বিকেলে আমার বাড়িতে চলে আসে। আমি আজ সন্ধ্যায় নগরের পথে কীর্তন করব।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সংবাদটা সর্বত্র প্রচারিত হয়ে গেল। নিমাই নিজে নগরীর পথে কীর্তন করবেন, তিনি কাজীর দর্প চূর্ণ করবেন। কীর্তনপ্রিয় জনগণের মধ্যে প্রবল উৎসাহ দেখা দিল। তাঁরা খোল-করতাল অথবা মশাল ও ধ্বজা নিয়ে প্রভুর বাড়িতে উপস্থিত হলেন।

কেবল ভক্তবৃন্দ নন, নিমাইয়ের মিত্রগণও সবাই উপস্থিত হলেন। তাঁর শত্রুরাও মজা দেখতে এলো, এলেন নিরপেক্ষরাও। তাঁরা কৌতূহল চরিতার্থ করতে এলেন।

সারা শহরে একটা হুলস্থূল পড়ে গেল।

বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা নিমাইয়ের মঙ্গল কামনায় মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি নিয়ে উপস্থিত হলেন। গৃহিণীরা তাঁদের বাড়ির সামনে কলাগাছ পুঁতে জলভরা ঘট সাজিয়ে আম্রপল্লব দিলেন। কেউ বাড়িতে দীপাবলীর আয়োজন শুরু করে দিলেন, কেউবা খৈ কড়ি ও বাতাসা নিয়ে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে প্রভুর পথ চেয়ে রইলেন।

এদিকে প্রভুর বাড়ির সামনে তখন লোকে লোকারণ্য। তাদের পরনে

বিশুদ্ধ বস্ত্র, কপালে চন্দনের তিলক, গলায় ফুলের মালা আর হাতে তেলের পাত্র সহ এক-একটি মশাল। অথবা খোল-করতাল কিংবা ধ্বজা।

বাড়ির বাইরে যখন এই সাজ-সাজ রব, তখন ভেতরে কি অবস্থা?

সেখানেও তাই। তবে সে বড়ই মজার ব্যাপার। নিমাই সৈন্য-সামন্ত পরিবৃত কাজীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে চলেছেন, অথচ তিনি বর্ম পরিধান করে অস্ত্রধারণ করছেন না। গদাধর তখন তাঁকে বরের বেশে সাজিয়ে দিচ্ছেন। তাই তো দেবেন। নিমাই যে তাঁর প্রেমাস্ত্র দিয়ে কাজীকে দমন করতে চলেছেন।

এবারে সেই সাজের কথায় আসা যাক। গদাধর তাঁর তিলক সেবা সেরে চোখে কাজল দিয়ে দিলেন। তারপরে কেশবিন্যাস করে চূড়া বাঁধলেন। চূড়ায় মালতীর মালা পরিয়ে গদাধর প্রভুর সর্বাঙ্গ চন্দনে চর্চিত করলেন। নিমাই উঠে দাঁড়ালেন। গদাধর তাঁকে মালা পরালেন। তারপরে সুন্দর একখানি পট্টবস্ত্র পরিধান করে নিমাই চাদর গায়ে দিলেন। ভক্তবৃন্দ তাঁর পায়ে নূপুর বেঁধে দিলেন। আর ভক্তকবি তাঁর সেই সাজ ও রূপের বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন—

'ধবলপাটের জোড় পড়েছে
রাঙ্গা রাঙ্গা পাড় দিয়েছে,
চরণ উপর দুলে গেছে কোচা গো।
বাকমল সোনার নূপুর
বেজে যায় মধুর মধুর,
রূপ দেখিতে ভুবন মুরছা গো॥
দীঘল দীঘল চাচর চুল
তায় গুঁজেছে চাঁপার ফুল,
কুদমালতীর মালা বেড়া ঝোঁটা গো।
চন্দন মাখা গোরা গায়
বাহু দুলায়ে চলে যায়,
কপাল মাঝে ভুবন মোহন ফোঁটা গো॥'...

কিন্তু কেবল ভক্তবৃন্দ নন, বাড়ির ভেতরে প্রতিবেশী বয়স্কাদের সঙ্গে শচীমাতাও ছেলের সাজ দেখছিলেন। আর বিষ্ণুপ্রিয়া? তিনিও সখীদের সঙ্গে আড়াল থেকে তাঁর স্বামীকে দেখছিলেন আর হয়তো রবীন্দ্রনাথের 'পুরস্কার' কবিতার সেই কবিগৃহিণীর মতো ভাবছিলেন—

'রাজ পথ দিয়ে চলে এত লোকে,

এমনটি আর পড়িল না চোখে
আমার যেমন আছে ॥"

থামলেন প্রভুপাদ। কিন্তু সামান্য সময়ের জন্য। মুচকি হেসে তিনি আবার শুরু করেন, "যাক্ গে বিষ্ণুপ্রিয়ার কথা, আমরা গৌরকথায় ফিরে আসি। গদাধর ও নরহরি প্রভৃতি ভক্তবৃন্দের যখন প্রভুর সাজ-পোশাক পছন্দ হল, তখন নিমাই ছাড়া পেলেন। তিনি বাড়ির বাইরে এলেন।

নিমাইকে দেখতে পেয়েই ভক্তবৃন্দ আনন্দে করতালি দিয়ে উঠলেন। তাঁরা দুপাশে সরে দাঁড়ালেন। নিমাই আঙিনার মাঝখানে এসে হাত তুলে তাঁদের সবাইকে স্বাগত জানালেন। তারপরে বললেন—আমরা চারটি দলে বিভক্ত হয়ে সংকীর্তন শোভাযাত্রা করে কাজীর বাড়িতে যাবো। প্রথমদলের নেতৃত্ব করবে হরিদাস ঠাকুর, দ্বিতীয়দলের নেতা হবেন শ্রীঅদ্বৈতাচার্য, তৃতীয়দলের নেতা শ্রীবাস পণ্ডিত আর চতুর্থদল আমি পরিচালনা করব। গদাধর ও নিত্যানন্দ আমার সঙ্গে থাকবেন।

চারদলে বিভক্ত হয়ে সংকীর্তন শোভাযাত্রা কাজীর বাড়ির দিকে চলল এগিয়ে। পথের পাশে প্রায় প্রতিটি বাড়িতে আলোকসজ্জা। শোভাযাত্রীদের মশালের আলোর সঙ্গে সেই আলো মিলে মিশে রাতের নবদ্বীপ দিনের মতই আলোময়।

পথের পাশে সারি সারি নর-নারী। তাঁরা সংকীর্তন শোভাযাত্রাকে স্বাগত জানাতে থাকলেন। বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা আশীর্বাদ করছেন। ছেলেরা হরিধ্বনি দিচ্ছেন, মেয়েরা উলুধ্বনি দিয়ে খই বাতাসা ও ফুল ছড়াচ্ছেন। সবাই সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করছেন। প্রভু ঠিকই বলেছিলেন, তাঁর প্রেম-সংকীর্তনের বন্যায় ন'দে ভেসে যায়।

চার দলই গান গাইতে গাইতে এগিয়ে চলেছেন। কোনদল গাইছেন, 'তুঁহারি চরণে মন লাগুহুঁরে, হে সারঙ্গধর ...।'—হে ধনুধারী ভগবান, তোমার চরণে আমার চিত্ত সংযুক্ত হোক্। কোনদল গাইছেন—'বল ভাই হরি ও রাম রাম, হরি ও রাম।' কেউ গাইছেন—

'বিজয় হইলা ন'দে নন্দঘোষের বালা।
হাতে মোহন বাঁশী, গলে দোলে বনমালা' ॥

আবার কেউবা গাইছেন—

'হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥'

এই গেল গানের কথা, এবারে নাচের কথায় আসি।" একবার থামলেন প্রভুপাদ। তারপরে আবার সুর করে শুরু করলেন—

"দেখিয়া প্রভুর নৃত্য অপূর্ব বিকার।
আনন্দে বিহ্বল সব লোক নদীয়ার॥
ক্ষণে হয় প্রভু অঙ্গ সর্ব ধুলাময়।
নয়নের জলে ক্ষণে সব পাখালয়॥
সে কম্প সে ঘর্ম সে বা পুলক দেখিতে।
পাষণ্ডীর চিত্ত-বিত্ত লাগয়ে নাচিতে॥
এই মত অপূর্ব দেখিয়া সর্বজন।
সবেই বলেন এ পুরুষ নারায়ণ॥"

গান থামিয়ে প্রভুপাদ আবার বলতে শুরু করলেন, "অবশেষে সংকীর্তন শোভাযাত্রা কাজীপাড়ার পথে এসে পড়ল। শোভাযাত্রীদের কাজীর কথা মনে পড়ল। তাঁরা গান থামিয়ে 'মার্ কাজী! মার কাজী!' বলে চিৎকার করে উঠলেন। হাজার হাজার মানুষের মিলিত চিৎকার সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো গিয়ে কাজীর বাড়িতে আছড়ে পড়ল।

কাজী তাড়াতাড়ি বাড়ির বাইরে ছুটে এলেন। এসে দেখেন শুধু সমুদ্রের গর্জন নয়, সেই সঙ্গে আলোর বন্যা। তিনি প্রহরীদের বললেন—গিয়ে দেখে এসো তো, কিসের গোলমাল? একি কারও বিয়ে, না সেই ভূতের কেত্তন? নিমাই যদি আবার কেত্তন করে, আমি সবাইকে জাতে মারব। যাও, তাড়াতাড়ি গিয়ে দেখো এসো!

কিন্তু যারা গেল, তারা আর ফিরে এলো না। এদিকে কোলাহল ক্রমেই বাড়ছে। কাজী ব্যস্ত হয়ে আরেকদল প্রহরীকে পাঠালেন। তাদেরও একই হাল হল। কাজী আবার একদলকে পাঠালেন। কিন্তু হায়, যে যায় সে যে আর ফিরে আসে না।

আসবে কেমন করে? নদী কি সাগরের সঙ্গে মিশে আবার ফিরে আসতে পারে? কাজীর সৈন্যরা শোভাযাত্রার সামনে পৌঁছে যখন ব্যাপারটা বুঝতে পারল, তখন তারা আর পালাবার পথ পেল না, চারিদিক থেকে ঘেরাও হয়ে গেল। তারাও হাতের অস্ত্র ফেলে দিয়ে দুহাত তুলে নেচে নেচে হরিনাম কীর্তন করতে থাকল।

অবশেষে সংকীর্তন শোভাযাত্রা এসে কাজীর বাড়িতে উপস্থিত হল। আমি গতকাল নিদয়ায় বসে বলেছি যে মহাপ্রভু সকলকে দৈন্যশিক্ষা প্রদান

করলেও তিনি অন্যায়ের কাছে নতি স্বীকার করতে বলেন নি। এবং একথা স্বীকার করতেই হবে যে সেদিনকার সেই অহিংস সত্যাগ্রহীরা একেবারে অহিংস থাকেন নি। শ্রীবৃন্দাবনদাসের ভাষায়—

'কেহ ঘর ভাঙে কেহ ভাঙেন দুয়ার।
কেহ লাথি মারে কেহ করহে হুঙ্কার॥
আম্র পনসের ডাল ভাঙি কেহ ফেলে।
কেহ কদলির বন ভাঙি হরি বলে॥...'

তার মানে ভাঙচুর কিছু হয়েছিল, কিন্তু তার সবটাই বাড়ি-ঘর ও গাছ-পালার ওপর দিয়ে গিয়েছে। কেউ কারও গায়ে হাত দেয় নি।

নিমাই কিন্তু কাজীর বাড়িতে এসেই নৃত্য এবং কীর্তন সম্বরণ করলেন। এবং তাঁকে দেখে জনতাও মুহূর্তের মধ্যে শান্ত হয়ে গেল। কি আশ্চর্য নেতৃত্ব? কি বিস্ময়কর নিয়মানুবর্তিতা! শৃঙ্খলা ছাড়া সংগ্রাম হয় না, সংযম হারালে বিপ্লব ব্যর্থ হয়।

নিমাই বাড়ির ভেতরে ঢুকলেন। শান্তস্বরে জিজ্ঞেস করলেন—কাজী-সাহেব কোথায়...

অবস্থা বেগতিক দেখে কাজী বাড়ি থেকে পালাবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ততক্ষণে কীর্তনীয়ারা তাঁর বাড়ি ঘেরাও করে ফেলেছেন। পালাবার সুযোগ না পেয়ে কাজী ভেতরের ঘরে লুকিয়েছিলেন। তিনি মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছিলেন। সহসা কোলাহল থেমে গেল। তাঁর মনে বাঁচার ক্ষীণ আশা হল। তারপরেই কানে গেল নিমাইয়ের সেই শান্ত কণ্ঠস্বর—কাজীসাহেব কোথায় গেলেন? তাঁকে ব'লো নিমাইপণ্ডিত একবার দেখা করতে চান।

লুকিয়ে থেকে যে লাভ নেই, তা কাজী আগেই বুঝতে পেরেছিলেন। এবারে খানিকটা আশ্বস্ত হয়ে কাঁপতে কাঁপতে নিমাইয়ের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

নিমাই তাঁকে স্বাগত জানিয়ে সহাস্যে বললেন—এ আপনার কেমন ভদ্রতা? আমি আপনার বাড়িতে এলাম আর আপনি ভেতরে লুকিয়ে রইলেন!

কাজী এতক্ষণ মাথা নিচু করেছিলেন, এবারে তিনি মাথা তুলে প্রভুর মুখের দিকে তাকালেন। দেখলেন সে মুখখানিতে ক্রোধের চিহ্নমাত্র নেই, রয়েছে ক্ষমা আর প্রেমের পরম প্রকাশ। তাঁর মনে হল, প্রভু তাঁর হৃদয়কে আকর্ষণ করছেন। তিনি অনুতপ্ত কণ্ঠে বললেন—তুমি আমাকে ক্ষমা কর নিমাই! তুমি তো জানো আমি তোমার মামা হই। তোমার দাদু আমার চাচা।

দ্বাপরের ভগবান তাঁর মামা কংসকে দমন করবার জন্ত তাঁকে বধ করেছিলেন, কিন্তু কলির ভগবান প্রেম দান করে তাঁর মামাকে দমন করলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ চাঁদকাজীকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। ভক্তবৃন্দ বিস্মিত ও পুলকিত হলেন। তাঁরা কীর্তন করে কাজীকে অভিনন্দিত করলেন। কাজী বললেন—

'ভাগিনার ক্রোধ মামা অবশ্য সহয়।
মাতুলের অপরাধ ভাগিনা না লয়॥'

গৌর বললেন—মামা, তোমার আদেশে নবদ্বীপে এত মৃদঙ্গ ভাঙা হল, তুমি নবদ্বীপে কীর্তন বন্ধ করে দিলে আর আজ যে নিজেই এসে কীর্তনের সরিক হতে চাইছ!

—আজ যে তুমি আমার মনোবাসনা পূর্ণ করলে। কাজী হেসে উত্তর দিলেন।

—কি সে বাসনা?

—তুমি গোরাচাঁদ, ন'দের নিমাই। ভক্তরা তোমাকে ভগবান মনে করেন, তাঁরা তোমার কাছে যান। সবার কাছে তোমার কথা শুনে আমিও তোমার ভক্ত হয়ে পড়েছি। কিন্তু আমি চেয়েছি, ভগবান নিজেই আসবেন আমার কাছে। আজ আমার সে বাসনা পূর্ণ হল।

গৌর আবার কাজীকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তিনি বাষ্পারুদ্ধ কণ্ঠে বললেন—কাজীমামা, তুমি পুণ্যবান তাই কৃষ্ণে তোমার মতি হয়েছে। তিনিই তোমার গতি করে দেবেন।

কাজীরও দুচোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল। তবু তিনি অপলক নয়নে প্রেমাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভুর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

কয়েকটি নীরব মুহূর্ত কেটে যায়। তারপরে গোরা আবার বললেন—মামা, তুমি যেন নদীয়ায় আবার কীর্তন বন্ধ ক'রো না।

'কাজী কহে মোর বংশে যত উপজীবে।
তাহাকে তালাক দিব কীর্তন বাঁধিতে॥"

থামলেন প্রভুপাদ। সঙ্গে সঙ্গে সহযাত্রীগণ সোচ্চার স্বরে গেয়ে উঠলেন—

'হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরেরাম হরেরাম রাম রাম হরে হরে॥'

॥ পাঁচ ॥

কাজীর সমাধি থেকে মায়াপুরের দিকে অর্থাৎ দক্ষিণে না এগিয়ে আমরা খানিকটা পেছিয়ে এসেছি। তারপরে ডানদিকে একটি ধূলিময় মাটির পথ ধরেছি। সেই পথে পুবদিকে প্রায় মাইলখানেক পদচারণার পরে পৌঁচেছি এখানে—রাজাপুরের এই জগন্নাথ মন্দিরে। রাজাপুর খুবই ছোট গ্রাম। জনসংখ্যা মাত্র শ' দুয়েক। আমরা এখনও নবদ্বীপ থানায় রয়েছি।

এখানে পৌঁছেই দর্শন সেরে নিয়েছি। পথের পাশে ঝকঝকে মন্দির। চারিদিকে উঁচু দেওয়াল। লোহার গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে বাঁদিকে ফুলের বাগান, ডানদিকে একফালি বাঁধানো চত্বর। তারপরে নাটমন্দির ও গর্ভমন্দির। নাটমন্দিরের চারিদিক খোলা, কয়েকটি গোল থামের ওপরে ছাদটি দাঁড়িয়ে আছে।

গর্ভমন্দির একটু উঁচুতে। সামনে খোলা বারান্দা। গর্ভমন্দিরের দরজার ওপরে লেখা—কীর্তনীয়া সদা হরি। ভেতরে জগন্নাথ বলরাম ও সুভদ্রার দারু-বিগ্রহ। অনেকটা পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের মতো। শুনেছি এটি সুপ্রাচীন তীর্থ।

কিন্তু কালের করালগ্রাসে সে মন্দির প্রায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। কয়েক-বছর হল 'ইসকন'* মন্দিরটির আমূল সংস্কার সাধন করেছেন। তাঁরাই এই মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ ও সেবাপূজার দায়িত্ব নিয়েছেন। তাঁদের জনৈক ব্রহ্মচারী এখানে বাস করছেন। একটু দূরে তাঁর বাসগৃহ।

দর্শন ও প্রণাম করে মন্দির থেকে নেমে আসতেই মানসী আমার কাছে আসে। বলে, "ব্রহ্মচারীজির কাছে একবার খবর নিও তো সন্ধ্যেবেলা পুজো হবে কিনা?"

হেসে জিজ্ঞেস করি, "সে খবর দিয়ে তুমি কি করবে?

গম্ভীর স্বরে সে জবাব দেয়, "তাহলে আমি একটা পুজো দেবো।"

"কার নামে?"

"জানি না, যাও!"

আমাকে আর কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে সে বেরিয়ে গেল মন্দির

---

* "ইণ্টারন্যাশন্যাল সোসাইটি ফর কৃষ্ণ কনশাসনারস্"

থেকে। মুশকিলে পড়ে গেলাম। কথাটা যখন বলেছে, তখন খবর একটা নিতেই হবে। এখন ব্রহ্মচারীজিকে কোথায় পাই ?

কিন্তু রাখে কৃষ্ণ মারে কে ? হঠাৎ নজর পরে কাশীনাথ এদিকেই আসছে। কাশীনাথ নবদ্বীপের ছেলে আমাদের। আমাদের যাত্রার অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্বেচ্ছাসেবক।

কথাটা বলতেই সে প্রায় লাফিয়ে ওঠে। বলে, "এ আর হাঙ্গামা কি ? সাধুজি ঘরেই রয়েছেন। চলুন, আলাপ করিয়ে দিচ্ছি। তাছাড়া আমারও তাঁর ওখানে দরকার রয়েছে।"

"কি দরকার ?"

"একটা ফোন করতে হবে।"

"ফোন !" আমি বিস্মিত ! "এখানে কি ফোন আছে নাকি ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। এসব ইসকনের ব্যাপার বুঝলেন না। সাধুজির কোয়ার্টার্সে ফোন আছে বৈকি।"

"কোথায় ফোন করবে ?" আমি আবার জিজ্ঞেস করি।

সে উত্তর দেয়, "নবদ্বীপ থানায়।"

"থানায় ! কেন ?"

"এ জায়গাটা ভাল নয়। প্রায়ই ডাকাতি হয়। তাই থানাকে জানিয়ে দিতে হবে যে আজ রাতে আমরা এখানে থাকব।"

কাশীনাথের সঙ্গে কথা বলতে বলতে বেরিয়ে আসি পথে। যেদিক থেকে এখানে এসেছি তার উল্টোদিকে এগিয়ে চলি। বাড়ি-ঘর খুবই কম। পথের বাঁদিকে জঙ্গল। ডানদিকে একটা বাড়ি—টিন আর বাঁশের বেড়ার ঘর। বাড়ির সামনে একটা টিউবওয়েল। কয়েকজন নারী-পুরুষ সেখানে স্নান করছেন। বলা বাহুল্য তাঁরা সবাই আমার সহযাত্রী। শীতকাল হলেও অনেকটা রোদে পুড়ে এসেছেন।

টিউবওয়েল ছাড়িয়ে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। তারপরেই পথের ডানদিকে একটু উঁচুতে কয়েকখানি ঘর। সেখানেই উঠে আসি আমরা। কাশীনাথ জানায় এটাই ব্রহ্মচারীজির কোয়ার্টার্স। এখানেও একটা টিউবওয়েল রয়েছে। এবং এখন সেটিও আমার সহযাত্রীদের দখলে।

কাশীনাথের কাজ হল। কারণ এখানে সত্যি সত্যি একটা টেলিফোন রয়েছে। এবং সামান্য চেষ্টাতেই নবদ্বীপ থানাকে পাওয়া গেল। জনৈক সাব-ইন্‌সপেক্টর আমাদের আশ্বস্ত করে বললেন—নির্ভয়ে রাত্রিবাস করুন।

তবে সবাই মন্দিরের ভেতরে থাকবেন এবং দরজায় তালা লাগাবেন। আর রাতে একটু সজাগ থাকবেন।

তার মানে শুধু ডাকাত নয়, এখানে চোরও আছে। তা থাকৃগে। থানা থেকে আমাদের নির্ভয়ে রাত্রিবাস করবার পরামর্শ দান করেছেন। সুতরাং কাশীনাথ বেজায় খুশি।

কিন্তু মুশকিল হল আমার। আমি যে মানসীকে খুশি করতে পারব না। কারণ ব্রহ্মচারীজি জানালেন—মন্দিরে দৈনিক মাত্র একবার পুজো হয়। আজকের পুজো হয়ে গেছে, আবার পুজো হবে কাল। কিন্তু কাল তো আমরা সকালেই স্বর্ণবিহার রওনা হব।

পুলিশের পরামর্শ মতো আমরা মন্দিরেই রাত্রিবাস করব। ব্রহ্মচারীজিও সে অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু সেখানে রান্না-খাওয়া করা যাবে না বলে মন্দিরের পেছনে আমবাগানে অস্থায়ী শিবির পড়েছে। সেখানেই আসি।

আমবাগানটি বেশ বড়, পরিষ্কার এবং ছায়াশীতল। একদিকে গরুর গাড়িগুলো পড়ে আছে। খাবারের গাড়ি ছাড়া অন্য কোনো গাড়ি এখনও খোলা হয় নি। গাইড গৌরবাবু বলেছেন, সন্ধ্যার আগে খোলা হবে না। ফলে যাঁরা কাঁধের কিট্‌ব্যাগ গাড়িতে দিয়ে দিয়েছেন, তাঁরা মুশকিলে পড়ে গেছেন। তেল-গামছার অভাবে স্নান করতে যেতে পারছেন না। নিরুপায় হয়ে আমের ছায়ায় শুয়ে পড়েছেন।

বাগানের আরেকদিকে রান্না চড়েছে। অতএব প্রধান পাচক আকুলের হাঁক-ডাক শোনা যাচ্ছে।

আমাকে দেখতে পেয়েই প্রভুপাদ কাছে ডাকেন। এসে দাঁড়াতেই তিনি বলেন, "ব'সো। রান্না হয়ে এলো বলে। যাই ব'লো জায়গাটি কিন্তু বনভোজনের আদর্শস্থান।"

আমি মাথা নেড়ে তাঁর পাশে বসে পড়ি। প্রভুপাদ ঠিকই বলেছেন। জায়গাটি সত্যি ভারী সুন্দর। বেলা দুটো নাগাদ আমরা এখানে পৌঁচেছি। তার মানে নিদয়া থেকে বেলপুকুর হয়ে এই এগারো মাইল পথ আসতে প্রায় সাতঘণ্টা লেগেছে। লাগবেই তো, আগেই বলেছি আমার সহযাত্রীদের অধিকাংশই বৃদ্ধ বৃদ্ধা, তার ওপরে আবার জায়গায় জায়গায় থামতে হয়েছে। আনন্দের কথা আশ্রমমাতা ও সেই বৃদ্ধ-অন্ধ সুস্থ শরীরেই এখানে পৌঁচেছেন এবং তাঁরা হেঁটেই এসেছেন।

কয়েকজন মহিলা স্নান করে ফিরে এলেন। যথারীতি তাঁরা প্রভুপাদকে

প্রণাম করলেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন, "টিউবওয়েলে স্নান করলে?"

"না, বাবা! আমরা পাম্প্‌ থেকে চান করে এলাম। ইসকনের কোয়ার্টার্স পেরিয়ে পাম্প্‌ হাউস, ক্ষেতে জল দেবার জন্য, সেখানে অনেক জল। তাছাড়া ইনচার্জ আশুতোষবাবু বড় ভাল লোক। সন্ধ্যেবেলা তিনি আপনার পাঠ শুনতে আসবেন, আমরা তাঁকে নেমন্তন্ন করে এসেছি।"

"বেশ করেছো।" প্রভুপাদ বলেন। তারপরে তিনি কৃষ্ণার দিকে ফিরে বলেন, "তোরাও গিয়ে চট করে চান করে আয়! মাকে সঙ্গে নিয়ে যা।"

মা মানে মানসী। সে কৃষ্ণার পাশেই বসে আছে। প্রভুপাদ অনুমতি দিতেই সে উঠে দাঁড়ায়। কৃষ্ণাকে বলে, "চলো, চান করে আসি।"

পুজোর কথাটা মানসীকে বলা হয় নি আমার। আমিও উঠে দাঁড়াই। সঙ্গে সঙ্গে সে আমার কাছে এগিয়ে এসে বলে, "তুমি এই অবেলায় আর চান ক'রো না যেন!"

আমি তার মুখের দিকে তাকাই। সে আবার বলে, "ডিসেম্বর মাস তার ওপরে অবেলা, তোমার সহ্য হবে না। তুমি ভাল করে হাত-মুখ ধুয়ে নাও।"

যেকথা বলার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছিলাম, তা আর বলা হল না। আমি আবার বসে পড়ি। মানসী কৃষ্ণার সঙ্গে স্নান করতে চলে গেল। প্রভুপাদ আমার দিকে তাকিয়ে শুধু একটু হাসলেন।

দুপুরের প্রসাদ পেতে প্রায় বিকেল গড়িয়ে এলো। অথচ আজ এত দেরি হবার কথা ছিল না। নিদয়া থেকে খাবারের গাড়ি ছেড়ে দেওয়া হয়েছে খুব সকালে। গাড়িগুলো এখানে এসেছে সোজা পথে। আমাদের ট্রান্সপোর্ট অফিসার গৌরবাবু বললেন, খাবারের গাড়ি নাকি বেলা এগারোটার আগেই এখানে পৌঁছে গিয়েছে। তবু রান্না হতে তিনটে বেজে গেল কারণ উনুন জ্বালাতেই একটা বেজেছে। এখানে জ্বালানী কাঠ পাওয়া যায় নি। প্রায় মাইল দুয়েক দূরের বাজার থেকে কাঠ নিয়ে আসতে হয়েছে।

দেরি হলেও বেশ উপাদেয় প্রসাদ পেয়েছি। গরম গরম অন্ন আর ডাল-তরকারী। খিদের পেটে একটু বেশিই খেয়ে ফেলেছি। আর তা বোধকরি আমি একা নয়, প্রায় সকলেই। সুতরাং সহযাত্রীরা অনেকেই যে যেখানে পেরেছেন, শুয়ে পড়েছেন। আমিও শুয়ে পড়ব ভাবছি।

কিন্তু জগন্নাথজী শেষ পর্যন্ত আমাকে সে সুযোগ দিলেন না। কৃষ্ণা হাত ধুতে রাস্তার টিউবওয়েলে গিয়েছিল। ফিরে এসে জানালো "ঘোষদা, মানসীদি আপনাকে ডাকছেন।"

"কোথায় ?"

"মন্দিরে।"

সে-ও কৃষ্ণার সঙ্গে হাত ধুতে গিয়েছিল। কিন্তু হাত ধুয়ে এখানে ফিরে না এসে কেন হঠাৎ মন্দিরে চলে গেল, বুঝতে পারছি না। পুজোর খোঁজ নিতে কি ? কিন্তু সে খোঁজ তো নেওয়া হয়েছে আমার। কথাটা অবশ্য বলা হয় নি তাকে। সে যাই হোক, মানসী যখন ডেকে পাঠিয়েছে, যেতে আমাকে হবেই। অতএব উঠে দাঁড়াই। এগিয়ে চলি জগন্নাথ মন্দিরের দিকে। আমাদের এই আমবাগানের পাশেই মন্দির। কিন্তু এদিকে উঁচু দেওয়াল। মন্দিরের গেট সেই ওদিকে, রাস্তার পাশে।

মন্দিরের গেটে দাঁড়িয়ে রয়েছে মানসী। আমারই পথ চেয়ে আছে। আমাকে দেখতে পেয়ে সে এগিয়ে আসছে এদিকে। কাছে এসে বলে, "ডেকে পাঠিয়েছি বলে রাগ করো নি তো ?"

"না, না, রাগ করব কেন ?" তাড়াতাড়ি জবাব দিই।

সে জবাবদিহি করে, "ওখানে এত লোক যে কথা বলবার জো নেই। অথচ তোমার সঙ্গে বড্ড কথা বলতে ইচ্ছে করছে। কেনই বা করবে না বলো, পরশু নবদ্বীপ আসার পর থেকে যে কথা বলারই সুযোগ পাচ্ছি না।"

কথাটা মিথ্যে নয়। আমরা দূরে দূরে থাকি, কালে-ভদ্রে দেখা হয়। এবারেও বহুদিন বাদে দেখা হয়েছে। এখন এক জায়গায় রয়েছি, একসঙ্গে পথ চলছি, অথচ কথা বলার সুযোগ পাচ্ছি না।

"কিন্তু," আমি বলি, "এখানেও তো অনেকে চলে এসেছেন। এখানেই কথা বলতে পারবে কি ?"

"পারব", মানসী উত্তর দেয়, "তুমি এসো আমার সঙ্গে।"

আমরা গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকি। আমার বেশ কয়েকজন নারীপুরুষ সহযাত্রী নাট-মন্দিরের মেঝেতে শুয়ে বসে বিশ্রাম করছেন। তাঁদেরই একজন বলে ওঠেন, "আয়েন ঘোষদা। প্রসাদটা ভালই হইছে। একটু ঘুমাইয়া লয়েন।"

"আপনারা এখানে বিশ্রাম করুন।" আমি কিছু বলতে পারার আগেই মানসী বলে ওঠে, "আমরা ঐ পেছনের বারান্দায় একটু বসব।"

"বসেন গিয়া। ওদিকে কেউ নাই। ভালই থাইকবেন।"

ভদ্রলোকের কথার ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। তবু আমি কোনো উত্তর দিই না। কিন্তু নীরব থাকে না মানসী। একটু হেসে বলে, "তাই তো আমরা ওদিকটায় বসছি।"

এবারে বক্তাও নীরব হন। আর আমরা তাঁর তির্যক দৃষ্টি এড়িয়ে উঠে আসি মন্দিরে। প্রণাম করে চলে আসি পেছনের বারান্দায়।

না, মানসীর স্থান নির্বাচনকে প্রশংসা করতে হয়। এদিকে যেমন কেউ নেই, তেমনি জায়গাটা একেবারে স্বতন্ত্র। একদিকে মন্দির আর তিনদিকে উঁচু দেওয়াল। আমবাগান, পথ কিম্বা নাট-মন্দির থেকে কেউ দেখতে পাবে না আমাদের।

মানসী বলে, "একটু দাঁড়াও!" সে গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করে আমাকে। বলে, "বৃন্দাবনে গেলে, রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠে তোমাকে প্রণাম করি। এখানে তাও পারছি না।"

আমি ওকে কাছে টেনে নিই। কেটে যায় কয়েকটি নীরব মুহূর্ত। তার-পরে মুখ তোলে মানসী। আস্তে আস্তে ছাড়িয়ে নেয় নিজেকে। আঁচল দিয়ে চোখদুটি মুছে নেয়। তারপরে বলে, "ব'সো! অনেক কথা আছে।"

পাশাপাশি বসে পড়ি দুজনে। মন্দিরের দেওয়ালে হেলান দিয়ে মানসী আমার একখানি হাত নিজের দুহাতের মধ্যে তুলে নেয়। তারপরে আমার দিয়ে তাকিয়ে বলে, "তোমার সঙ্গে যাত্রায় এসেছি, অথচ তোমার কাছ থেকে গৌড়মণ্ডলের কথা কিছুই শোনা হচ্ছে না।"

"বেশ, কি শুনতে চাও বলো!"

"আমরা বামনপুকুর দেখে এখানে এলাম। বামুনপুকুরের আগের নাম ছিল ব্রাহ্মণপুষ্কর। বর্তমান নামটি আগের নামের অপভ্রংশ।"

মাথা নাড়ি। মানসী জিজ্ঞেস করে, "আচ্ছা, ঐ ব্রাহ্মণপুষ্কর নামটির পেছনে কোনো কাহিনী আছে কি?"

"আছে, তবে সেটা স্থানীয় জনশ্রুতি।"

"কী?"

মনে পড়ছে মানালী, নাগর, কুলু ও যোগীন্দর নগরের সেই দিনগুলোর কথা—মানসীর সঙ্গে সেই প্রথম পরিচয় পর্বের কথা।* তারপরে বহু বছর কেটে গেল। ইতিমধ্যে মানসীর শুধু বয়স বাড়ে নি, সেই সঙ্গে তার জীবনের সমস্ত ধারাটাই বদলে গিয়েছে। বৃন্দাবনে বৈষ্ণবীর জীবন যাপন করলেও সে আজ আমার জীবনে পরম সত্য। কিন্তু তার স্বভাবটি বোধ করি একই রয়ে গিয়েছে। কিছুমাত্র কমে নি তার কৌতূহল। কুলু-মানালীর পথে সে

---

* লেখকের 'উত্তরস্যাং দিশি' (হিমালয়-২) দ্রষ্টব্য।

যেমন অনুগত ছাত্রীর মতো আমার কাছ থেকে গিরিতীর্থ মণিমহেশের কথা শুনতে চেয়েছে, আজও সে একই উৎসাহ আর উদ্দীপনা নিয়ে শুনতে চাইছে গৌড়মণ্ডলের কথা। অতএব আমাকে শুরু করতে হয়—

"সেকালে গ্রামটি ছিল ব্রাহ্মণ প্রধান। গ্রামের একজন দরিদ্র বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ছিলেন যেমন ভক্ত, তেমনি সৎ। ধর্মপ্রাণ মানুষটির ইচ্ছে হল তীর্থরাজ পুষ্কর দর্শন করবেন, সেখানে পুণ্যস্নান করে অক্ষয়পুণ্য সঞ্চয় করবেন। কিন্তু পিতামহ ব্রহ্মার সেই যোগতীর্থ পুষ্কর হ্রদ রাজস্থানের আজমীর জেলায়, নদীয়া থেকে বহুদূরে। সেখানে যাবার সঙ্গী ও পাথেয় তিনি পাবেন কোথায়? বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অবুঝ নন, তবু তাঁর মন মানতে চায় না। তিনি শয়নে স্বপনে ও জাগরণে শুধুই তীর্থরাজ পুষ্করের কথা ভাবেন আর তাঁর প্রাণের ঠাকুরকে বলেন—তুমি আমার মনোবাসনা পূর্ণ ক'রো, আমাকে পুষ্করে পুণ্যস্নান করাও।..."

"তুমি তো সেবারে রাজস্থান ভ্রমণের সময় পুষ্কর দর্শন করেছো?"

মানসী মাঝখান থেকে প্রশ্ন করে। আমি মাথা নেড়ে বলি, "হ্যাঁ।"*

"অথচ দেখ, এতকাল বৃন্দাবনে বাস করেও আমার পুষ্করে যাওয়া হল না।" মানসীর স্বরে আপসোস।

আমি বলি, "হবে কেমন করে? সেবারে যে তুমি কিছুতেই সঙ্গী হলে না আমার।"

"হব কেমন করে বলো, সেবারেই তো তুমি খুকুর বিয়ের পাকা কথাবার্তা বললে।"

"ঠিক কথা, খুকুরা তো মথুরাতেই আছে, ভালো আছে আশা করি।"

"হ্যাঁ। তবে ছেলেটা বড়ই দুষ্টু হয়েছে। সামলাতে খুকু হিমসিম খেয়ে যায়। অথচ স্কুল ছুটি হলে আমি ওকে আমার কাছে এনে রাখি, তখন কিন্তু অত দুষ্টুমি করে না।"

"খুকুর ছেলে স্কুলে পড়ে!" আমি রীতিমত বিস্মিত।

"স্কুলে পড়বে না কেন? ক্লাশ টু-য়ে, পড়ে। ছ' বছর বয়স হল যে!"

"ছ' বছর! এই তো সেদিন খুকুর বিয়ে হল।"

"সেদিন কি বলছ! আট বছর হয়ে গেল যে।"

আট বছর। তা বটে। আমাকে যে কন্যাকর্তা হয়ে তখন উপস্থিত

---

* লেখকের 'রাজভূমি-রাজস্থান' দ্রষ্টব্য।

থাকতে হয়েছিল বৃন্দাবনে। খুকু মানসীর পালিতা কন্যা। পাত্রপক্ষকে সেকথা বলা হয়েছিল। দেনা-পাওনা নিয়েও কোনো গোলমাল ছিল না। মানসী জিনিসপত্র ভালই দিয়েছে। শুধু মানসী স্বামী পরিত্যক্তা এমন একটা সংবাদ পাত্র পক্ষের কানে যাওয়ায় সমস্যা দেখা দিয়েছিল। সেই সমস্যা সমাধানের জন্যই আমাকে যেতে হয়েছিল বৃন্দাবন। পালক-পিতা রূপে উপস্থিত থাকতে হয়েছিল খুকুর বিয়েতে।

তারপরে আট বছর কেটে গেল। আর মানালীতে মানসীর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের পরে পনেরো বছর। অথচ মনে হচ্ছে যেন এই সেদিনের কথা।

সেদিন পাঠানকোটে বিদায় নেবার পরে তিন বছর আমাদের কোনো যোগাযোগ ছিল না। কারণ বিদায়বেলায় মানসী ঠিকানা দেয় নি আমাকে। তিন বছর পরে হঠাৎ একদিন সন্ধ্যায় বৃন্দাবনে বঙ্কুবিহারী মন্দিরের সামনে দেখা হয়ে গেল ওর সঙ্গে। তারপরেও একযুগ চলে গেল। কিন্তু আর আমরা কেউ কারও জীবন থেকে হারিয়ে যাই নি। বরং দুজনে দুজনের জীবনে পরমসত্য হয়ে পড়েছি। এরই মাঝে খুকু বড় হয়েছে। তার বিয়ে দিয়েছি। এখন তার ছেলে স্কুলে পড়ছে। আর সেই সঙ্গে আমরাও বুড়ো হয়ে গেছি। মানসী দিদিমা হয়েছে, আমিও দাদু।

"ওকি! চুপ করে রইলে কেন? বল না গো, ব্রাহ্মণপুষ্করের কথা।"

মানসীর কথায় আমার ভাবনা থেমে যায়। কি ভাবতে গিয়ে কি ভাবতে বসেছিলাম। না, সত্যি আমি বুড়ো হয়ে গেছি। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নাকি এমনি হয়। মানুষ ধান ভানতে বসে শিবের গীত গায়।

কিন্তু নিজের কথা থাক। মানসী ব্রাহ্মণপুষ্করের কথা শুনতে চাইছে। আমি আবার শুরু করি—

"নবদ্বীপ থেকে তীর্থরাজ পুষ্কর বহুদূর। সুতরাং বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁর গোপন বাসনা নিজের মনের মাঝেই গোপন করে রাখলেন।

"কিন্তু যিনি অন্তর্যামী, তাঁর কাছে তিনি কেমন করে গোপন রাখবেন!' একদিন তিনি ব্রাহ্মণকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন—পুণ্যপ্রদ-মহাতীর্থ পুষ্কর হ্রদ ভক্তদের অক্ষয় আশ্রয়। কিন্তু যেখানে ভক্ত সেখানেই পুষ্কর। তোমার পুণ্যে এই মুহূর্ত থেকে তোমাদের গাঁয়ের পুষ্করিণীটি লোকপিতা ব্রহ্মার যজ্ঞস্থল তীর্থরাজ পুষ্কর হ্রদের মতো পরম পবিত্র বলে বিবেচিত হবে। সেখানে স্নান করলেই তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হবে। আর তোমার সেই পুণ্যস্নানের পর থেকেই তোমাদের গ্রামের নাম হবে ব্রাহ্মণপুষ্কর।"

"আরেকটা কথা।" আমি থামতেই মানসী বলে। "আচ্ছা তুমি কি জানো, সীমন্তদ্বীপ নাম হল কেন?"

"বলছি, কিন্তু তার আগে বামনপুকুর সম্পর্কে আরেকটি কথা বলে নিই।"

"বেশ বলো।"

আমি বলতে থাকি, "বামনপুকুর কৃষ্ণনগর শহর থেকে ৮ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। বামনপুকুর বাজারের উত্তর-পশ্চিমে রয়েছে বল্লালঢিপি। ৩০ ফুট উঁচু এবং প্রায় ৪০০ ফুট লম্বা ও চওড়া এই বর্গাকার মাটির স্তূপটি সেনরাজ বল্লালসেনের রাজপ্রাসাদের ধ্বংসস্তূপ।"

"এবারে বলো সীমন্তদ্বীপ নাম হ'ল কেন?"

"বাংলায় সেন রাজবংশের রাজত্বকাল ১০৯৫ থেকে ১২৫০ খ্রীষ্টাব্দ। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা দাক্ষিণাত্যভূপতি বীরসেন। সামন্তসেন নামে তাঁর জনৈক বংশধর কালক্রমে রাজা হন। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন বল্লালঢিপি প্রকৃতপক্ষে সামন্তসেনের প্রাসাদেরই ধ্বংসস্তূপ! কারণ সামন্তসেন বৃদ্ধ বয়সে এক পুণ্যাশ্রম নির্মাণ করে গঙ্গাতীরে বাস করেছেন। তাঁরই নামানুসারে এই অঞ্চলের নাম হয় সামন্তদ্বীপ। সামন্তদ্বীপই কালক্রমে লোকমুখে সীমন্তদ্বীপ হয়েছে।"

"তা হতে পারে।" আমি থামতেই মানসী বলে, "কিন্তু সীমন্তদ্বীপ নাম হবার যে আরেকটা কারণ আছে, তা জানো কি?"

"না শুনে বলতে পারি না।"

"আমি বলতে পারি।" মানসী মাথা নেড়ে হাসে। হাসলে এখনো ওর গালে টোল পরে। বোধকরি তেমনি সুন্দর দেখায়। সত্যি বয়স যাই হোক, সেজেগুজে দাঁড়ালে ওকে আজও সুন্দরী যুবতী বলেই মনে হবে। কিন্তু বহুকাল হল সে সাজ-গোছ ছেড়ে দিয়েছে। কলকাতা ছেড়ে বৃন্দাবনে গিয়ে বৈষ্ণবীর বেশ ধারণ করেছে।

"আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কি দেখছ অমন করে?"

"তোমাকে।" আমি উত্তর দিই।

"আমার কি আর সে বয়স আছে সখা!"

শব্দটা কানে আসতেই আমার সারা শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। পনেরো বছর আগে, বিপাশার কলতান আর পাইনের মর্মর শব্দে মুখরিত মানালীর পথে সে আমাকে প্রথম ঐনামে ডেকেছিল। তারপরে কতকাল কেটে গেল, আমাদের দুজনেরও জীবনে কত পরিবর্তন এলো, কিন্তু আমার

কাছে ওর এই সখা সম্বোধনের রোমাঞ্চ কিছুমাত্র কমল না।

"শুধু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবে, না আমার কথাটা শুনবে।"

"দুটোই করব।"

"মানে??"

"তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে তোমার মুখের কথামৃত পান করব।"

"কিন্তু তুমি আমার দিকে অমন করে তাকিয়ে থাকলে যে আমার সব কথা হারিয়ে যায়।"

"যাক্ গে। তখন আমরা দুজনে মুখোমুখি হয়ে ভাবব—

'সমাজ সংসার মিছে সব
মিছে এ জীবনের কলরব।
কেবল আঁখি দিয়ে আঁখির সুধা পিয়ে
হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব—"

"কিন্তু মশাই! এখন তো শীতকাল, এখন যে আকাশ থেকে অনিবার জল ঝরছে না। অতএব মনে করবার কোনো কারণ নেই যে—'জগতে কেহ যেন নাহি আর।"

"আকাশের কথা ছেড়ে মাটিতে নেমে এসো। মাটির কবি এই কবিতাটি তাঁর যে কাব্যগ্রন্থে গ্রন্থিবদ্ধ করেছেন, তার নামটি মনে আছে তো?"

"আছে।"

"কি?"

"মানসী।"

"বর্ষার দিন না হলেও আমি নিভৃত নির্জনে আমার মানসীর মুখোমুখি হয়ে কেবল তার আঁখিসুধা পান করব, হৃদয় দিয়ে হৃদয়কে অনুভব করব।"

মানসী কোনো কথা না বলে শুধু আমার হাতখানি নিজের হাত দু'খানি দিয়ে আরও জোরে চেপে ধরে।

কেটে যায় কিছুক্ষণ। তারপরে বলি, "শীতের বেলা, সন্ধ্যে হতে আর দেরি নেই। দিনের আলো থাকতে থাকতেই গাড়ি থেকে মালপত্র খুঁজে বার করতে হবে। চলো, এবারে ওঠা যাক।"

"কিন্তু সীমন্তদ্বীপ নামের কাহিনীটা তোমাকে শোনানো হল না যে!"

"কোন্ কাহিনী?"

"ভক্তিরত্নাকরের কবি যে কাহিনী বলেছেন।"

কাহিনীটি আমার অজানা নয়, তবু মানসীর মুখ থেকে শোনা যাক

একবার। বলি, "বেশ তো, আরম্ভ ক'রো।"

সে শুরু করে, "শিবের কাছে পার্বতী একদিন শুনতে পেলেন গৌরসুন্দরের কথা। শুনলেন, গুপ্তবৃন্দাবন নদীয়ায় গৌর আবিভূত হয়েছেন। পার্বতীর বড় ইচ্ছে হল তাঁকে একবার দর্শন করার। শিবের অনুমতি নিয়ে তিনি নদীয়ায় এলেন। এখানে এসে গৌরসুন্দরের আরাধনা আরম্ভ করলেন।

দেবীর আরাধনায় প্রসন্ন হয়ে নবদ্বীপ সুধাকর তাঁকে দর্শন দান করলেন। গৌরসুন্দরের ভুবনমোহন রূপ দেখে পার্বতী আর স্থির থাকতে পারলেন না, তাঁর দু'চোখের কোল বেয়ে আনন্দাশ্রু নেমে এলো।

প্রেমাবতার প্রভুও উল্লসিত হলেন। তিনি সুমধুর স্বরে উমাকে বললেন —দেবী, তুমি যা বলবে আমি তাই করব। বল, কি তুমি চাও?

দুর্গা দুহাত জোড় করে প্রভু বিশ্বম্ভরকে বললেন,—তোমার এই প্রকট-লীলায় কলি ধন্য হ'ল। তুমি জগতের যাবতীয় তাপ হরণ ক'রো, সর্বজীবের আনন্দ বর্ধন ক'রো।

—তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হবে দেবী!

পার্বতী তাঁর পায়ে পড়ে প্রণাম করলেন। প্রভু অদৃশ্য হলেন।"

থামল মানসী। আমি ওর মুখের দিকে তাকাই। সে জিজ্ঞেস করে, "এবারে কবির ভাষায় বলি?"

আমি মাথা নাড়ি। সে সুর করে বলতে থাকে—

'পার্বতী ব্যাকুল হইলা প্রভু অদর্শনে।
ক'বে হ'বে প্রকট-বিহার চিন্তে মনে॥
প্রভুর চরণ-ধূলা সীমন্তে ধরিল।
এ হেতু সীমন্তদ্বীপ নাম ব্যক্ত হইল॥"

থামে মানসী। আমি আবার ওর মুখের দিকে তাকাই। ওর চোখে চোখ পড়ে আমার। মানসী মাথা নিচু করে। আস্তে আস্তে আমার হাতখানি ছেড়ে দেয় সে। তারপরে সহসা আমার পায়ের ধুলো নিয়ে নিজের সিঁথিতে ধারণ করে। বলে, "আজ থেকে সীমন্তদ্বীপ আমারও সীমন্তপীঠ হয়ে রইল।"

আমি ওকে কাছে টেনে নিই। ওর চোখের জলে আমার বুক ভেসে যায়।

॥ ছয় ॥

শুরু হল সন্ধ্যারতি। তবে আজ প্রভুপাদ শুধু আমাদের বিজয়-বিগ্রহ রাধামদনমোহনের আরতি করছেন না, জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার সামনেও আরতি করছেন। মন্দিরের ভেতরেই একপাশে আমাদের ঠাকুরের সিংহাসন স্থাপিত করা হয়েছে। একই সঙ্গে সবার আরতি করছেন।

মন্দিরের বারান্দা ও নাটমন্দিরে দাঁড়িয়ে আমরা আরতি দর্শন করছি। আমরা মানে শুধু আমার সহযাত্রীরা নন। বেশ কয়েকজন গ্রামবাসী পাঠ-কীর্তন শুনতে এসে আরতি দর্শন করছেন। এসেছেন আশুতোষ বলাধিকারী, এখানকার পাম্প্ হাউসের ইন্-চার্জ। প্রবীণ সরকারী কর্মচারী, লেখাপড়া জানেন। বহুকাল ধরে বাস করছেন এখানে। অনেক খবর রাখেন।

কথায় কথায় তিনি আমাকে এই মন্দিরের কাহিনী বলে যান—এ গ্রামের নাম রাজাপুর হলেও, আসলে এটি শ্রীক্ষেত্র, পুরীধাম। একদা এই গ্রামে যজ্ঞেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় নামে একজন দৃষ্টিহীন ভক্ত ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তাঁর বড়ই ইচ্ছে হল পুরী যাবার। কিন্তু তিনি যে দৃষ্টিহীন। কেউ না নিয়ে গেলে তো তাঁর পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। যাঁরাই জগন্নাথ দর্শনে যান, তিনি তাঁদের অনুরোধ করেন। কিন্তু কেউ তাঁকে সঙ্গে নিতে রাজী হন না। ব্যর্থকাম যজ্ঞেশ্বরের জগন্নাথের ওপর অভিমান হয়। ভাবেন—জগন্নাথের ইচ্ছে নয় যে আমি তাঁর কাছে যাই।

যজ্ঞেশ্বর প্রতিদিন প্রভাতে স্নান করতে গঙ্গায় যেতেন। একদিন রাতে তিনি স্বপ্ন দেখলেন, জগন্নাথ তাঁকে বলছেন—কাল সকালে গঙ্গায় ডুব দিয়ে যা হাতে ঠেকবে, তাই ঘরে নিয়ে আসবি।

পরদিন গঙ্গায় ডুব দিয়ে ওপরে উঠতেই একটা ভারী কিছু তাঁর হাতে ঠেকল। চাষীদের সাহায্যে সেটা পারে তুলে দেখেন, প্রব ় ও একখানা কাঠ। লোকজন দিয়ে তিনি সেটা বাড়িতে নিয়ে এলেন।

সেদিন রাতে তিনি আবার স্বপ্ন দেখলেন। জগন্নাথ তাঁকে বলছেন—এই কাঠখানি দিয়ে তুই আমার মূর্তি নির্মাণ করে তোদের গ্রামে মন্দির প্রতিষ্ঠা কর। তাহলেই তোর জগন্নাথ দর্শন হবে।

তিনি স্বপ্নে একজন ভাস্করের নাম পর্যন্ত বলে দিলেন।

পরদিন ঘুম থেকে উঠেই যজ্ঞেশ্বর সেই ভাস্করের বাড়িতে লোক পাঠালেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁরা এসে খবর দিল, ভাস্করের কুষ্ঠ হয়েছে। তাঁর পক্ষে মূর্তি নির্মাণ করা সম্ভব নয়।

যজ্ঞেশ্বর বিপদে পড়লেন। ছুটলেন বেলপুকুরে, পণ্ডিতদের কাছে। সব শুনে তাঁরা বললেন—ঐ ভাস্করকে তিনদিন সংযম পালন করতে বলুন, তার কুষ্ঠরোগ সেরে যাবে।

পণ্ডিতদের বিধান সত্য হল। তিনদিন সংযম পালনের পরে সত্যি সত্যি সেই ভাস্করের কুষ্ঠ রোগ সেরে গেল। তারপরে তিনি ঐ কাঠখানি দিয়ে জগন্নাথদেবের এবং অন্য কাঠ দিয়ে বলরাম ও সুভদ্রার মূর্তি নির্মাণ করলেন। শুভদিন দেখে মন্দিরে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হল। যাগ-যজ্ঞ ও পূজা-পাঠ হল।

পূজা শেষে মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে যজ্ঞেশ্বর কাঁদতে কাঁদতে বললেন—ঠাকুর, আমি কি দেখতে পাবো না তোকে? তুই কি দেখা দিবি না আমাকে? যদি তা না দিস, তাহলে আজই গঙ্গায় আমি আত্মবিসর্জন করব। দেখি তাতেও তোর দয়া হয় কিনা?

দয়া হল। যজ্ঞেশ্বর দেখতে পেলেন তাঁর ইষ্টদেবতাকে। দৃষ্টিহীন ভক্ত তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন।

কাহিনী শেষ করে আশুতোষবাবু বলেন, "এই রাজাপুর জগন্নাথ মন্দির যেমন প্রাচীন, তেমনি জাগ্রত।"

আমি মাথা নাড়ি। আশুতোষবাবু বলতে থাকেন, "কিন্তু এই জাগ্রত-তীর্থ অযত্ন আর অবহেলায় ধ্বংস হতে বসেছিল। আমি অনেক লেখা-লেখি করে 'ইসকন্'-কে এটির রক্ষণাবেক্ষণে সম্মত করিয়েছি। তাঁরাই এই মন্দিরের সংস্কার সাধন করেছেন।"

আমিও আশুতোষবাবুকে ধন্যবাদ দিই। তিনি আরতি দর্শনের জন্য এগিয়ে যান। আমি এখানে দাঁড়িয়েই আরতি দেখতে থাকি।

আমরা গাড়ি থেকে জিনিসপত্র নিয়ে এসেছি। ঠিক হয়েছে, সবাই মন্দিরের ঘেরা চৌহদ্দিতে রাত কাটাবো। তবে প্রসাদ নেবার জন্য রাতেও একবার আমবাগানে যেতে হবে।

কিন্তু আজ রাতে আর প্রসাদ পাবার দরকার আছে কি? দুপুরের প্রসাদ পেয়েছি বিকেল চারটায়। তবে রাতের প্রসাদ তো পাওয়া যাবে পাঠ-কীর্তনের পরে, ইংরেজী মতে হয়তো বা কালকের তারিখে। তখন খিদে না পাবার কোনো কারণ নেই। সুতরাং প্রসাদের ভাবনা এখন থাক।

সহযাত্রীদের সঙ্গে আমি আর মানসীও গাড়ি থেকে মালপত্র খুঁজে নিয়ে এসেছি মন্দিরে। কার কোথায় জায়গা হবে কেউ জানি না। তবে প্রভুপাদ বলেছেন, মেয়েরা শোবার পরে নাটমন্দিরে জায়গা থাকলে ছেলেরা বিছানা পাতবে। নইলে মন্দিরের বাঁধানো উঠানে শুতে হবে। আজ আর সামিয়ানা টাঙানো হয় নি। কারণ জায়গা নেই।

আজ রাতে বোধকরি আমাদের নীল আকাশের নিচেই শয্যা পাততে হবে। নিজের জন্ম চিন্তা করছি না। আমার স্লীপিং ব্যাগ রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ সহযাত্রীই তো একখানি কম্বল সম্বল করে যাত্রায় এসেছেন। তাঁদের ঠাণ্ডা লাগবে।

লাগলেও করার কিছু নেই। আজ তো তবু দেওয়াল ঘেরা বাঁধানো চত্বর মিলেছে। আগামী কাল কিম্বা পরশু যে খোলা মাঠে বিছানা পাততে হবে না, তাই বা বলি কেমন করে?

যাক্ গে, এসব ভাবনা। প্রভুপাদ পাঠ শুরু করেছেন। শোনা যাক্—

"ভক্তবৃন্দ! আপনারা তীর্থযাত্রায় এসেছেন। যে পুণ্যস্থান সংসার-সাগর পার করিয়ে দেয়, তারই নাম তীর্থ। আর মহতের পদরজঃ দ্বারা অভিসিঞ্চিত না হওয়া পর্যন্ত, সে তীর্থ যাত্রা সার্থক হয় না। সে বিচারে আজ আমাদের তীর্থযাত্রা সার্থক হয়েছে। আজ আমরা শ্রীচৈতন্যদেবের মাতুলালয় ও ভক্ত চাঁদকাজীর সমাধিপীঠ দর্শন করে এই জগন্নাথ মন্দিরে এসেছি। বাপ-মায়ের সঙ্গে বিশ্বম্ভর যেমন মামাবাড়িতে গিয়েছেন, তেমনি নিমাইপণ্ডিত এসেছেন কাজীর বাড়িতে, ভক্তবৃন্দের সঙ্গে সীমন্তদ্বীপের পথে পথে সংকীর্তন করেছেন। সেই পুণ্য পথের ধূলি আজও শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদরজে অভিসিঞ্চিত। কারণ তাঁর পদধূলি তাঁরই মতো অক্ষয় ও অব্যয়।......"

"হরিবোল, হরিবোল..." ছেলেরা জয়ধ্বনি করে ওঠে, মেয়েরা উলুধ্বনি দেয়। প্রভুপাদ হারমনিয়মটা টেনে নিয়ে কালকের মতই গেয়ে ওঠেন—

'রাধার মহিমা প্রেমরসসীমা
জগতে জানাতো কে?
যদি গৌর না হ'ত॥"

গান শেষ করে প্রভুপাদ আবার শুরু করেন—

"আজ সকালে বেলপুকুরে বসে বলেছি, শচীমাতার গর্ভসঞ্চারের পরে বছর ঘুরে এলো, কিন্তু তাঁর সন্তান ভূমিষ্ঠ হল না। জগন্নাথ ব্যস্ত হয়ে ছুটে গেলেন শ্বশুরমশায়ের কাছে। নীলাম্বর গণনা করে বললেন—শচীর গর্ভে স্বয়ং ভগবান

জন্মগ্রহণ করছেন, তাই এই অনিয়ম।

১৪০৭ শকাব্দের ফাল্গুন মাস। কোকিলের কুহুতান আর দক্ষিণের মলয় সমীরে নবদ্বীপ তখন মধুময়। সেদিন দোলযাত্রা—কৃষ্ণ-ভগবানের একটি সর্বশ্রেষ্ঠ লীলা। এই লীলায় রসময় কৃষ্ণ রসময়ী রাধিকার সঙ্গে হোলি খেলেছেন, দুজনে প্রেমদোলায় বসে প্রেমানন্দময়ী গোপীদের সেবায় আনন্দযুক্ত হয়েছেন। গোপীরা কৃষ্ণ-অনুরাগের আবীর দিয়ে রাধাকৃষ্ণকে রঞ্জিত করেছেন। নবদ্বীপেও সেদিন হোলিখেলার বিরাম ছিল না। সারাদিন ধরে পথে পথে পাড়ায় পাড়ায় বাড়িতে বাড়িতে হোলি উৎসব হয়েছে, হরি সংকীর্তন হয়েছে।

দিনের শেষে সন্ধ্যা হল। মেঘমুক্ত নির্মল আকাশে চাঁদ উঠল—সোনার থালার মতো চাঁদ। চাঁদের আলোয় নবদ্বীপের পথ ও প্রান্তর পুলকিত হয়ে উঠল।

এমন সময়, সহসা রাহুর আবির্ভাব ঘটল। তিনি চাঁদকে গ্রাস করলেন—চন্দ্রগ্রহণ হল। নবদ্বীপের নগরে নগরে আবার হরিধ্বনি উঠল।

আর ঠিক তখুনি নবদ্বীপের মাটিতে নবদ্বীপচন্দ্রের উদয় হল। সিংহ রাশিতে পূর্বফাল্গুনী নক্ষত্রে শচীমাতার সেই বহু আকাঙ্খিত সন্তান ভূমিষ্ঠ হলেন। আতুরঘরটি বাঁধা হয়েছিল একটা বড় নিমগাছের গোড়ায়। নিমের ছায়ায় ন'দের নিমাই জন্মগ্রহণ করলেন।

কিন্তু ধাত্রী দেখলেন, শিশুর দেহে প্রাণের স্পন্দন নেই। তিনি তাড়াতাড়ি কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়া শুরু করে দিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই শিশুর দেহে প্রাণের স্পন্দন ফিরে এলো। সবাই আনন্দে আবার হরিধ্বনি দিয়ে উঠলেন। তাঁরা দেখলেন মানবশিশু তো নয়, যেন পূর্ণিমার চাঁদ। গায়ের রং কাঁচা সোনার মতো আর আকারে সাধারণ শিশুর চেয়ে অনেক বড়। সবাই ভাবলেন সুদীর্ঘ তেরো মাস মাতৃজঠরে থাকার জন্যই ছেলে এমন বড় হয়েছে। জগন্নাথ পুত্রের নাম রাখলেন বিশ্বম্ভর আর শচীমাতা বললেন—নিমের ছায়ায় ভূমিষ্ঠ হয়েছে, ও আমার নিমাই—ন'দের নিমাই।

দিন যায়, মাস যায়, বছর ঘুরে আসে। নিমাই বড় হয়। শচীমাতা দেখেন, তাঁর এই ছোটছেলেটি অন্য শিশুদের মতো নয়। বয়সের তুলনায় শুধু তার শরীর বড় নয়, সে শরীরে রোগ নেই। সে যেমন বলবান, তেমনি চঞ্চল। আরেকটা মজার ব্যাপার, শিশু কাঁদতে থাকলে কেউ যদি 'হরিবোল' বলে, সে তৎক্ষণাৎ চুপ করে যায়।

শিশু হামাগুড়ি দিতে শিখল। ব্যাস, আর কেউ তাকে কোলে রাখতে

পারেন না। নিজেই কোল থেকে নেমে যায়। কিন্তু কোল থেকে নেমে গেলেও স্বস্তি নেই। সর্বদা তার দিকে নজর রাখতে হয়। নইলে কখন কোন্ ফাঁকে কোন্ দিকে ছুটে গিয়ে কি কাণ্ড করবে, তা কেউ জানে না। নিমাইয়ের এই হামাগুড়ি দিয়ে চলার বর্ণনা করতে গিয়ে পদকর্তা বাসুদেব ঘোষ লিখেছেন…'

প্রভুপাদ আবার হারমনিয়াম টেনে নিয়ে গান ধরেন—

'একমুখে কি কহিব গোরাচাঁদের লীলা।
হামাগুড়ি যায় নানা রঙ্গে শচীবালা॥
লালে মুখ ঝরঝর দেখিতে সুন্দর।
পাকা বিম্ব-ফল জিনি সুন্দর অধর॥
অঙ্গদ বলয় শোভে সুবাহু যুগলে।
চরণে মগরা খাড় বাঘ নখ গলে॥
সোনার শিকলি পিঠে পাটের থোপনা।
বাসুদেব ঘোষ কহে নিছনি আপনা॥"

থামলেন প্রভুপাদ। গান থামিয়ে তিনি আবার বলতে শুরু করলেন—

"নিমাই হাঁটতে শিখলেন। বাপ-মা ও দাদা বিশ্বরূপের ঝামেলা বাড়ল। ভাই যে কখন কোন্দিকে ছুটে পালাবে, তার ঠিক নেই। তাই সর্বদা তাঁকে চোখে চোখে রাখতে হয়। কিন্তু চর্মচক্ষুর সাধ্য কতটুকু? একদিন সত্যি সত্যি নিমাই হারিয়ে গেলেন। বাপ-মা, দাদা ও প্রতিবেশীদের মাথায় বাজ ভেঙে পড়ল। যে যেদিকে পারলেন ছুটলেন। বহু খোঁজাখুঁজি হ'ল। কিন্তু কোথায় বিশ্বম্ভর, কোথায় নিমাই, কোথার গৌরহরি? সবাই ব্যর্থ হয়ে বাড়িতে ফিরে এলেন, কান্নার রোল পড়ে গেল।

আর তখুনি কোথা থেকে যেন নিমাই ছুটে এসে হাজির। এসেই বাপের কোলে উঠে বসলেন। হাঁপাতে হাঁপাতে আধো আধো স্বরে বললেন—জানে একজন লোক হঠাৎ আমাকে পথ থেকে তুলে কাঁধে নিল। তারপরেই হাঁটতে থাকল। সে যেন কোথায় চলে যাচ্ছিল। আমি তাকে কিছুই বলি নি কাঁধে চড়ে আমার বেশ মজা লাগছিল। সেও আমাকে কিছু বলে নি কিন্তু তারপরে তার যেন কি হ'ল। সে আবার আমাদের পাড়ায় ফিরে এল আমাকে বাড়ির সামনে নামিয়ে দিয়েই ছুটে পালালো।

সবাই বুঝতে পারলেন, লোকটা ছেলেধরা কিম্বা ডাকাত। শচীমাত শিউরে উঠলেন। কিন্তু কেউ বুঝতে পারলেন না ডাকাতটা নিমাইকে ফিরিয়ে দিয়ে গেল কেন?

পারার কথাও নয়। ভক্তবৃন্দ, একথা বুঝতে হলে শ্রীমদ্‌ভাগবত থেকে শ্রীকৃষ্ণের পূতনাবধলীলাটি একবার স্মরণ করতে হবে। আসুন, আমরাও তাই করি।"

একটু থেমে প্রভুপাদ আবার বলতে থাকেন—

"কৃষ্ণজন্মের কয়েকদিন পরে বার্ষিক রাজকর দিতে মহারাজা নন্দ কংসালয়ে এলেন। কথায় কথায় কংসকে তিনি পুত্রলাভের কথা বললেন।

কংসের কেমন একটা সন্দেহ হল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বকী নামে পূতনা জাতীয় এক রাক্ষসীকে গোকুলে পাঠিয়ে দিলেন।

বকী নন্দের আগেই গোকুলে পৌঁছে গেল। তখন গভীর রাত। কিন্তু মা যশোদা ও রোহিণী শিশুকৃষ্ণের শয্যাপার্শ্বে জেগে রয়েছেন। পূতনা পরমাসুন্দরীর রূপ ধারণ করে সেখানে হাজির হল। যশোদা ও রোহিণী তার রূপ দেখে মুগ্ধ হলেন। সুন্দরী এগিয়ে এলো কৃষ্ণের কাছে। সে শিশুকৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে রইল। কারও মুখে কোনো কথা নেই।

সহসা শিশুকৃষ্ণ চোখ মেলে বকীর দিকে তাকালেন। যশোদা ও রোহিণী কিছু বুঝতে পারার আগেই বকী কৃষ্ণকে বুকে তুলে নিল, তার মুখে নিজের স্তন প্রদান করল। শিশুকৃষ্ণ দুহাতে স্তনটিকে ধরে সজোরে দুগ্ধ পান করতে থাকল। ছয় দিনের শিশু কিন্তু কি প্রচণ্ড শক্তি! কোথায় পূতনার স্তন থেকে বিষধারা ক্ষরিত হয়ে কৃষ্ণের মৃত্যু হবে আর এখন দুগ্ধদানের যন্ত্রণায় বকীর প্রাণ যায়! 'ছাড়, ছাড়' বলে বকী চিৎকার করে উঠল।

কিন্তু শিশু তার স্তন ছাড়ল না! সে চেষ্টা করে তাঁকে ছাড়াতে পারল না। সে হাত-পা ছুঁড়তে থাকল। বকীও নিজের রূপ ধারণ করল। কৃষ্ণকে বুকে নিয়েই আকাশে উঠল।

বেশিদূর যেতে পারল না। একটু বাদেই কংসের বিলাস উদ্যানের ওপর পড়ে গেল। শ্রীহরিকে বুকে নিয়ে বকী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। শ্রীকৃষ্ণের নিঃশ্বাসের সঙ্গে তার নিঃশ্বাস মিশে গেল। মৃত্যুকালে ভগবানের স্পর্শলাভ করায় পূতনার সাধুজনোচিত সঙ্গতি হল।

গোপ-গোপীগণ খুঁজতে খুঁজতে সেখানে উপস্থিত হলেন। দেখলেন, 'বালঞ্চ তস্যা উরসি ক্রীড়ন্তমকুতোভয়ম'—সুন্দরের চেয়ে সুন্দরতর একটি শিশু নির্ভয়ে সেই ভীষণা রাক্ষসীর বিশাল বুকের ওপরে খেলা করছে। তাঁর ঘনশ্যামবর্ণে চারিদিক স্নিগ্ধ হয়ে গিয়েছে। কুঞ্চিত কেশদাম বায়ুসঞ্চারে ইতস্ততঃ কম্পিত হচ্ছে। পায়ের নূপুর বেজে উঠছে। অতি সুন্দর ও অতি কুৎসিতের

সে এক আশ্চর্য সমন্বয়।

শিশুকৃষ্ণকে নিরাপদ দেখে তাঁরা সবাই আনন্দিতা হলেন। মহারাজা নন্দ তাড়াতাড়ি কৃষ্ণকে কোলে তুলে নিলেন।"

একবার থামলেন প্রভুপাদ। তারপরে আবার বলতে শুরু করলেন—

"ভক্তবৃন্দ, ভাগবতের কৃষ্ণকথা শেষ হল, এবারে আসুন আমরা চৈতন্য-ভাগবতের কৃষ্ণচৈতন্যের কথায় আসি। যে দস্যু সেদিন শিশু নিমাইকে চুরি করেছিল, তার নাম মেঘমালী। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েকে পথ থেকে ধরে গায়ের গয়না খুলে নিয়ে তাদের মেরে ফেলাই তার কাজ।

সেদিন সে নিমাইকে পথে পেয়ে গেল। ভাবল—ছেলেটার যেমন রূপ, তেমনি সাজ—গলায় হার, হাতে বাজু ও বালা, কোমরে শেকল, পায়ে নূপুর। মেঘমালী দেখল, ছেলেটা একা, কেউ তার সঙ্গে নেই। এমন মওকা সে বহুদিনে পায় নি। এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে সুযোগমত সে চট করে শিশু-নিমাইকে কাঁধে তুলে নিল। আশ্চর্য! ছেলেটা কাঁদল না, বাড়ি যেতে চাইল না, এমন কি নামিয়ে দিতেও বলল না। চুপচাপ তার কাঁধে বসে রইল। মেঘমালী মনে মনে ভারী খুশি হল। তাড়াতাড়ি পথ চলতে থাকল।

কিন্তু বেশিক্ষণ চলতে পারল না। কিছুক্ষণ চলার পর তার মনে ছেলেটার জন্য কেমন যেন একটা মায়া হতে থাকল। আহা এমন শান্ত-সুন্দর ছেলেটার সে সর্বস্ব অপহরণ করবে, এমন ফুলের মতো শিশুটিকে সে মেরে ফেলবে! তার স্নেহময়ী মায়ের বুক সে খালি করে দেবে?

ছিঃ ছিঃ সে এত নৃশংস, এমন দুরাচার!

অতীতের সমস্ত দুষ্কর্ম তার চোখের সামনে ছবির মতো ভেসে উঠতে থাকল। প্রাণধারণের জন্য এমন কত প্রাণ সে নষ্ট করেছে। কত শিশু বধ করেছে, কত মায়ের বুক খালি করেছে। তার এই নিষ্ঠুর প্রাণের কি মূল্য? তার যে নরকেও ঠাঁই হবে না!

মেঘমালী চলা বন্ধ করল, সে ঘুরে দাঁড়ালো। যে পথ দিয়ে নিমাইকে নিয়ে এসেছিল, সেই পথে ফিরে চলল।

ফিরে এলো জগন্নাথ মিশ্রের বাড়ির সামনে। সস্নেহে নিমাইকে কাঁধ থেকে নামিয়ে একবার বুকে জড়িয়ে ধরল। তারপরে তার শ্রীমুখ চুম্বন করে মাটিতে নামিয়ে দিল। স্নেহজড়িত স্বরে জিজ্ঞেস করল—তোমাদের বাড়ি চিনতে পারছ?

নিমাই মাথা নাড়ল। মেঘমালীর মনে আবার দোলা লাগল। সে

আরেকবার নিমাইয়ের মুখখানি দেখল। তারপরে বলল—তাহলে এখন বাড়ি ফিরে যাও!

বিশ্বম্ভর বাড়ির ভেতরে ছুটে গেল আর মেঘমালী?

অনুতপ্ত দস্যু সেদিন সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করল।

দ্বাপরের ভগবান রাক্ষসী পুতনাকে বধ করে নিজের প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন, আর কলির ভগবান স্নেহের আকর্ষণে দস্যু মেঘমালীর চিত্তশুদ্ধ করে তাকে মানুষে রূপান্তরিত করেছেন।"

॥ সাত ॥

আজ সকালেও ঘুম ভাঙল মাইকের শব্দে। সেই একই ঘোষণা—ভক্তবৃন্দ, আপনারা উঠে পড়ুন। প্রভুপাদ এখুনি মঙ্গলারতি শুরু করবেন। আরতি শেষ হবার পরে আপনারা মালপত্র গুছিয়ে গাড়িতে দিয়ে দেবেন।

ঘড়ি দেখি। সবে চারটে বেজেছে। তার মানে আমি সকাল বললেও সত্যি সত্যি সকাল হয় নি। এখনও বেশ অন্ধকার রয়েছে। কিন্তু আমরা যে গৌড়-পরিক্রমায় বেরিয়েছি। আমাদের সকাল শুরু হয়ে গেছে। অতএব উঠে বসতে হয়।

মন্দিরের দিকে নজর পড়ে। প্রভুপাদ মঙ্গলারতির আয়োজন প্রায় শেষ করে এনেছেন। তার মানে তিনি অন্তত ঘণ্টাখানেক আগে ঘুম থেকে উঠেছেন। স্নান আহ্নিক ও তিলকসেবা সেরে মঙ্গলারাতির আয়োজন শেষ করেছেন। বোধকরি ঘণ্টা তিনেকও ঘুমোতে পারেন নি।

ঘুমোতে অবশ্য আমিও পারি নি। গাড়ির গাড়োয়ানরা ছাড়া আমরা সবাই জগন্নাথ মন্দির চত্বরে রাত কাটিয়েছি। চোর ডাকাতের উপদ্রব বলে গেটে তালা লাগানো হয়েছিল। চাবি ছিল আমার কাছে। যাত্রীদের যখুনি যাঁর প্রাকৃতিক কারণে বাইরে যাবার দরকার পড়েছে, তখুনি চাবির জন্য তিনি আমার ঘুম ভাঙিয়েছেন। তারই মধ্যে যতটুকু পেরেছি, ঘুমিয়ে নিয়েছি।

নেহাৎ শ্রান্ত দেহ এবং অনেক রাতে শোবার জন্যই বোধকরি সামান্য ঘুমটুকু হয়েছে। নইলে পরিবেশ অনুযায়ী ঘুম না হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। মেয়েরা বিছানা পাতার পরে মন্দিরের বারান্দা ও নাটমন্দিরে যতটুকু জায়গা ছিল, তা বৃদ্ধদের জন্য নির্দিষ্ট হল। আমাদের বিছানা পাততে হল নাটমন্দিরের তিনদিকে বাঁধানো আঙ্গিনায়। ডানদিকে একটা বড় গাছ থাকায় সেদিকে ভিড় বেশি হল। রসময়দা ও গৌরদার সঙ্গে আমি ঠাঁই পেলাম নাটমন্দিরের বাঁদিকে একেবারে খোলা আকাশের নিচে। আমার স্লীপিং ব্যাগ ও ফোমের ম্যাট্রেস আছে, সুতরাং ঠাণ্ডা লাগার কথা নয়। কিন্তু সেকথা মানসীকে বোঝাতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে। তার সেই এক কথা—বাইরে শুলে তোমার হাঁপানির টান উঠবে।

ভাগ্যিস প্রভুপাদের কানে যাবার আগেই আমি তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে

ফেরৎ পাঠাতে পেরেছিলাম। নইলে তিনি নিশ্চয়ই আমাকে তাঁর পাশে বিছানা পাতার নির্দেশ দিতেন। তিনি ছেলেদের নিয়ে মন্দিরের সামনে বারান্দায় শুয়েছেন। কতক্ষণ শুয়েছিলেন, তা অবশ্য বলতে পারছি না। তবে আগেই বলেছি, অন্তত ঘণ্টাখানেক আগে উঠে পড়েছেন।

শেষ পর্যন্ত আমার কথা শুনে মানসী নাটমন্দিরে গিয়ে শুয়ে পড়েছে। কিন্তু সেও ঘুমোতে পেরেছে বলে মনে হয় না। ঘুম হবার কথাও নয়। কারণ সে ঘরে শুয়েছে আর আমি বাইরে এবং আমার হাঁপানি আছে।

এই হাঁপানির জন্য সেবারে কুলুতে যে তাকে বড়ই ঝামেলা পোহাতে হয়েছিল। সেদিন রাতে হঠাৎ আমার হাঁপানির টান উঠল। সেই গভীর রাতে প্রচণ্ড শীতের মধ্যে অজানা শহরে একা প্রায় মাইলখানেক জনহীন পথ পেরিয়ে সে আমার জন্য ওষুধ নিয়ে এসেছিল।

যাক্ গে, সেসব কথা। এবারে গেটের তালা খুলে দেওয়া যাক। মন্দিরে প্রণাম করে মুখ ধুয়ে এসে বিছানা গুটিয়ে ফেলতে হবে।

এসে দেখি নিজের ব্যাগ ও বিছানা নিয়ে মানসী আমার ম্যাট্রেসের ওপর বসে আছে। আমি কাছে আসতেই উঠে দাঁড়ায়। বলে, "ঠাণ্ডা লাগে নি তো?"

"না, না। ঠাণ্ডা লাগবে কেন?" আমি ওর আশঙ্কাটাকে উড়িয়ে দিতে চাই।

সে কিন্তু গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করে, "তাহলে চোখদুটো এমন জবাফুলের মতো লাল হয়ে আছে কেন?"

"ভাল ঘুম হয় নি, তাই।" আমি জবাবদিহি করি।

"না, জ্বর হয়েছে!" বলেই সে তার ডানহাতখানি আমার কপালে রাখে।

চোখ বুজে চুপ করে থাকি। মনে মনে নবদ্বীপচন্দ্রকে স্মরণ করি। এবং তাঁর করুণায় পার পেয়ে যাই।

মানসী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। হাতখানি সরিয়ে নেয়। বলে, "শ্রীগৌরাঙ্গের অশেষ দয়া। জ্বর হয় নি।"

আমিও স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ি। মানসী আবার বলে, "তুমি জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও। আমার জিনিস এখানেই থাক। আমি মন্দিরে প্রণাম সেরে মুখ ধুয়ে আসছি।"

সে চলে যায়। আমি মুক্তির আনন্দে পুলকিত হয়ে উঠি। আশে-পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সহযাত্রীরা মুচকি হাসেন।

গাড়িতে মালপত্র দিয়ে প্রাতঃকৃত্য সেরে তৈরি হতে প্রায় সাতটা বেজে গেল। বিভিন্ন বয়সের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির এতগুলো মানুষ। তৈরি হওয়া কি সহজ কথা! সবচেয়ে দুঃখের কথা, আজ আর চা পাওয়া গেল না। নিদয়ার মতো কোনো চায়ের দোকান বসে নি এখানে। আর তার জন্য যত আপসোস মানসীর। অথচ সে চা খায় না।

বলা বাহুল্য তার আপসোস আমার জন্য। আর এজন্য তাকে দোষ দেওয়া বৃথা। আমি যে সত্যই চায়ের কাপ হাতে না পেলে বিছানা ছাড়তে পারি না। অথচ আশ্চর্য আজ কোনো অসুবিধে বোধ করছি না! কি জানি, নেশা মানেই তো মনের রোগ। আর আজ আমার মন সেই রোগমুক্ত। কিন্তু কেন? গৌড়-পরিক্রমায় বেরিয়েছি বলে কি?

সকাল সওয়া সাতটায় সংকীর্তন শোভাযাত্রা জগন্নাথ মন্দির থেকে পথে নেমে এলো। রাজাপুরের মাটির পথ বেয়ে আমরা এগিয়ে চললাম সুবর্ণ বিহারের দিকে। রাজাপুর থেকে সুবর্ণবিহার সাড়ে ছয় মাইল। পরশুও সাড়ে ছ' মাইল হেঁটেছি। পরশুর মতো আজও আমাদের নদী পার হতে হবে। তবে গঙ্গা নয়, জলঙ্গী।

পরশু আমরা অন্তর্দ্বীপ থেকে রুদ্রদ্বীপ গিয়েছি। গতকাল রুদ্রদ্বীপ থেকে সীমন্তদ্বীপে এসেছি। আর আজ সীমন্তদ্বীপ থেকে গোদ্রুমদ্বীপে চলেছি।

আজ আর রসময়দা আমাদের সঙ্গী হলেন না। তিনি এখান থেকে নবদ্বীপ চলে গেলেন। সন্ধ্যায় সেখানে তাঁর গান আছে। আগামীকাল তিনি সোজা গাজনতলা চলে যাবেন, আমাদের সঙ্গে মিলিত হবেন।

আগেই বলেছি রসময়দা মানুষটি চমৎকার। ভারী অমায়িক আর শান্ত। সুপুরুষ ও সুগায়ক। ব্যবহারটিও মধুর। তিনি ব্যস্ত শিল্পী। তবু এই পরিক্রমাকে আনন্দময় করে তুলবার জন্য আমাদের সঙ্গী হয়েছেন। আজ রাতে আমরা খুবই তাঁর অভাব বোধ করব। তবে আগামীকাল গাজনতলায় আবার তাঁর রামায়ণ গান শুনতে পাবো।

সংকীর্তন শোভাযাত্রা চলেছে এগিয়ে। সেই একই 'ক্রম' রয়ে গেছে, একই থাকবে। প্রথমে হরিভক্তি প্রচারিণী সভার ফেস্টুন, তারপরে সাইকেল ভ্যানে ঠাকুরের সিংহাসন ও মাইক এবং কীর্তনীয়াদের দল। তাঁদের পেছনে মেয়েরা আর সবার শেষে আমরা।

পথের প্রকৃতিও একই রকম। সেই ভাঙা-চোড়া ধূলিময় মাটির পথ। পথের পাশে বাড়ি-ঘর কম, গাছপালা আর বন-জঙ্গলই বেশি। কিন্তু

যেখানেই বাড়ি, সেখানেই সারি সারি নর-নারী। তারা কীর্তনের শব্দ শুনে ছেলে-মেয়ে নিয়ে কাজ ফেলে ছুটে এসেছে। ঠাকুর-প্রণাম করছে, কেউ হাতজোড় করে কেউবা ধূলিতে লুটিয়ে

পুরুষদের অনেকের পরনেই লুঙ্গি। লুঙ্গি এখন আর কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের পোশাক নয়। অতএব এরা হিন্দু কি মুসলমান বুঝতে পারছি না। শুধু দেখছি সবাই হাতজোড় করে আছে এবং কেউ কেউ ঠাকুরের থালায় পাঁচ-দশ পয়সা প্রণামী দিচ্ছে।

প্রভুপাদ বলেন, "এ গ্রামের নাম সরডাঙ্গা। বেশ বড় এবং বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। শ' দুয়েক বাড়ি রয়েছে, প্রায় হাজার দেড়েক মানুষের বাস। আমরা এখনও নবদ্বীপ থানায় রয়েছি!"

দেখে সত্যি বর্দ্ধিষ্ণু মনে হচ্ছে। কয়েকটি পাকা বাড়ি রয়েছে। আর দেখতে পাচ্ছি ইলেক্‌ট্রিকের তার। বিদ্যুৎ পর্ষদের খাতায় নিশ্চয়ই সরডাঙ্গা গ্রামের নাম লেখা আছে। কিন্তু নির্মাণ বিভাগ নামটি শুনেছেন কি? বোধকরি না। শুনলে পথটির এমন হাল হবে কেন? অবশ্য গ্রামে বিদ্যুৎ এসেছে, এটা সুখের কথা। কিন্তু সেই সঙ্গে যে গ্রামের পথটিরও সংস্কার করা প্রয়োজন। এখন শীতকাল আমাদের খালি পা, তাই শুধু ধুলো উড়ছে। কিন্তু বর্ষাকালে যে এপথ একেবারেই অগম্য হয়ে ওঠে। আর তখন বোধকরি বৈদ্যুতিক আলো প্রহসনের মতো মনে হয়।

আমি বাঙালী। বাংলা গ্রামপ্রধান রাজ্য। কিন্তু গ্রামবাংলার সঙ্গে আমার সম্পর্ক তেমন নিবিড় নয়। তুলনায় আমি পাঞ্জাব উত্তরপ্রদেশ গুজরাত মহারাষ্ট্র ও গোয়া প্রভৃতি রাজ্যের গ্রামে বেশি ঘুরেছি। আমার ধারণা গ্রামবাংলার চেয়ে ঐসব রাজ্যের গ্রাম এখন বেশি উন্নত। অথচ স্বাধীনতা লাভের আগে গ্রামবাংলা বেশি উন্নত ছিল। বিগত পঁয়ত্রিশ বছরে ওরা অনেকটা এগিয়ে গিয়েছেন আর আমরা প্রায় একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছি।

তাহলেও বলব দেশে-বিদেশে বহু ঘুরেও আমি যে দুয়ের কোনো বিকল্প পাই নি তা হল, বাংলার নারী আর বাংলার গ্রাম। বাঙালী মেয়েদের মতো স্নেহময়ী রমণী যেমন আমি কোথাও দেখি নি, তেমনি গ্রামবাংলার মতো অনাবিল শান্তি আমি আর কোথাও পাই নি। আমি লণ্ডন ও প্যারী শহরের উপকণ্ঠে অনেক মনোরম ও উন্নত গ্রাম দেখেছি, কিন্তু অধঃপতিত সরডাঙ্গার এই ধূলিময় পথে পদচারণা করে যে অনাবিল শান্তি লাভ করছি, তার তুলনা নেই।

সরডাঙ্গা পেরিয়ে এসেই গরুর গাড়ির পথটি সামনে প্রসারিত হল, আমরা ডানদিকের সংকীর্ণ পথে এগিয়ে চললাম। এটি সংক্ষিপ্ত পথ, সংকীর্ণ হলেও সাইকেল ভ্যানটিকে টেনে নিয়ে যেতে খুব একটা অসুবিধে হচ্ছে না। তবে শোভাযাত্রাটি দীর্ঘতর হয়েছে আর সেই সঙ্গে আমাদের গতিবেগ গিয়েছে কমে।

এপথের পাশে বসতবাড়ি নেই, শুধুই ক্ষেত আর জঙ্গল। জঙ্গলে যাবতীয় গাছপালা আর ঝোপঝাড়। তবে ক্ষেত বলতে আখের ক্ষেতই বেশি। এ অঞ্চলে খুব আখ হয় দেখতে পাচ্ছি। আর তাই মাঝে মাঝে আখের কল অর্থাৎ গুড় তৈরির কারখানা রয়েছে।

আমরা এখন জলঙ্গীর দিকে পথ চলেছি। জলঙ্গী নদীয়া জেলার একটি বড় নদী। জেলাসদর কৃষ্ণনগর এই নদীর তীরে অবস্থিত। নদীয়া জেলার অন্যান্য উল্লেখযোগ্য নদীগুলি হল—মাথাভাঙ্গা, চূর্ণী, ইছামতী এবং ভাগীরথী। বলা বাহুল্য ভাগীরথী বা গঙ্গা এ জেলার প্রধান নদী। আর পদ্মা এই জেলার উত্তরসীমা দিয়ে প্রবাহিত।

পদ্মা থেকেই সৃষ্ট হয়েছে জলঙ্গী। জন্ম নেবার পরে কিছুদূর পর্যন্ত নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলার সীমারেখা টেনে জলঙ্গী নদীয়া জেলার ভেতরে প্রবেশ করেছে। তারপরে দক্ষিণবাহিনী হয়ে কৃষ্ণনগরে এসেছে। কৃষ্ণনগর থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রবাহিত হয়ে অবশেষে নবদ্বীপের উল্টোদিকে স্বরূপগঞ্জে গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। গঙ্গা ও পদ্মার মিলনপ্রবাহ জলঙ্গী।

নদীয়া জেলায় জলঙ্গীর প্রবাহপথের দৈর্ঘ্য ১৬৬ কিলোমিটার। ইংরেজ আমলে জলঙ্গীর সঙ্গম থেকে দক্ষিণে ভাগীরথীকে বলা হত হুগলী। এখন ভাগীরথী বা হুগলী বড় একটা বলা হয় না, সবাই বলেন গঙ্গা, শুধুই গঙ্গা।

তিন চার শ’ বছর আগে জলঙ্গী ভৈরবকে জল যোগাতো। সে আগাগোড়া নাব্য ছিল। কিন্তু পদ্মা ও গঙ্গার পরিবর্তনের ফলে জলঙ্গীও পরিবর্তিত হয়েছে। এখন সে মাঝে মাঝেই মজে গিয়েছে।

এই মজে যাওয়া অবশ্য কোনো সাম্প্রতিক সংবাদ নয়। ১৯০৯ সালে প্রকাশিত ইম্পিরিয়াল গেজেটীয়ারে দেখেছি, রেলপথ তৈরি হবার আগে এই জেলায় নদীপথই পরিবহনের প্রধান মাধ্যম ছিল। কিন্তু তখনও শীতকালে কোনো কোনো নদীর কোথাও কোথাও জল শুকিয়ে যেতো। তাই প্রধান জলপথগুলি সচল রাখার জন্য নদীগুলিকে প্রায়ই কাটাতে হত। তখন সারা বছর কলকাতা থেকে শান্তিপুর হয়ে কালনা পর্যন্ত প্রতিদিন স্টীমার যাতায়াত

করত। বর্ষাকালে একদিন অন্তর কালনা থেকে নবদ্বীপ হয়ে মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত স্টীমার যেতো। বলা বাহুল্য সে পথটি ছিল জলঙ্গী দিয়ে।

নদীয়া জেলার প্রাকৃতিক গঠনেও স্থানীয় নদীগুলির উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। ভাগীরথী ও তার উপনদীদের গতিপথ পরিবর্তনের ফলে বার বার এ জেলার ভূগঠনের পরিবর্তন ঘটেছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আমলে এ অঞ্চলে আরও কয়েকটি স্থানীয় নদী ছিল। এখন তারা সম্পূর্ণ মজে গিয়েছে, তাদের প্রবাহ-পথের ওপরে গড়ে উঠেছে জনপদ।

রাজাপুর থেকে রওনা হবার ঘণ্টাখানেক বাদে আমরা জলঙ্গীর তীরে এলাম। না, জলঙ্গী এখানে মোটেই মজে যাওয়া নদী নয়। শান্ত এবং ছোটনদী হলেও ভারী টলটলে জল। আমরা নদীর তীরে বসে পড়লাম। বসে জলঙ্গীর দিকে তাকিয়ে রইলাম।

ভারী সুন্দর নদী। সত্যি বলতে কি জলঙ্গীর জল দেখে আমার বড্ড স্নান করতে ইচ্ছে করছে। আমার মনের ইচ্ছে আমি মনে গোপন করে রাখলেও মানসী তা প্রকাশ করে ফেলে। বলে, "এখানে কিন্তু চান করে নেওয়া যেত।"

"না মা!" কথাটা কানে আসতেই প্রভুপাদ মানসীকে নিষেধ করেন। বলেন, "এপারে কেউ স্নান করবে না। এখনও ঠিকমত রোদ ওঠে নি, ঠাণ্ডা লেগে যাবে। ওপারে গিয়ে চিঁড়ে মহোৎসব হবে, তখন স্নান করে নেবে।"

"চিঁড়ে মহোৎসব হবে নাকি বাবা?" জনৈক শিষ্য আনন্দে প্রায় চেঁচিয়ে ওঠেন।

"চিঁড়ে মহোৎসব বলতে তোমরা যা বোঝ, ঠিক তা নয়। কেমন করেই বা হবে বলো। দই কলা সন্দেশ কিছুই যে সঙ্গে নেই। তবে ওপারে গিয়ে চিঁড়ে আর গুড় পাবে।"

"তাই আমাদের কাছে চিঁড়ো মহোৎসব হয়ে থাকবে বাবা!"

"জয় নিতাই, জয় গৌর, জয় গুরু····· "

ভক্তবৃন্দ আনন্দে সোচ্চার হয়ে ওঠেন।

গাড়িগুলো ঘোরা পথে এখানে এসেছে। কিন্তু গাড়ি রওনা হয়েছে আমাদের অনেক আগে। তাই সব গাড়ি পৌঁছে গিয়েছে ঘাটে।

ঘাট মানে নিদয়ার চেয়েও খারাপ অবস্থা, খেয়াও তাই। এখন পর্যন্ত একখানি গাড়িও পার করা যায় নি। আমাদের ট্রান্সপোর্ট অফিসার গৌরবাবু বললেন, "এখানে গাড়ির খেয়া নেই, এটা শুধুই মানুষ পারাপারের ছোট নৌকো।"

"তাহলে গাড়ি পার করবেন কেমন করে?" কৃষ্ণা প্রশ্ন করে।

গৌরবাবু উত্তর দেন, "এই নৌকোতেই পার করতে হবে। তাই মাটি কেটে গাড়ি নামাবার ঘাট তৈরি করছি।"

এতক্ষণে বুঝতে পারি ব্যাপারটা। নদীর উঁচু পার থেকে জল পর্যন্ত ঢালু পথ তৈরি করা হচ্ছে। দুজন স্থানীয় মানুষ কোদাল দিয়ে মাটি কাটছে, গাড়োয়ানরা তাদের সাহায্য করছে।

পথ না হয় তৈরি হয়ে যাবে। কিন্তু অতটুকু নৌকোয় এই মালবোঝাই গাড়ি তুলবে কেমন করে? তাছাড়া গড়িগুলো যে নৌকোটার চেয়ে চওড়া। এই গাড়িতে এতগুলো মানুষের যথাসর্বস্ব রয়েছে। ডুবে টুবে গেলে যে সর্বনাশ!

কানুও কিন্তু একই কথা বলে, "এখানে প্রায় প্রতিবছর যাত্রার সময় দুয়েকখানা গাড়ি ডুবে যায়।"

"তাহলে আমরা এখান থেকে পার হচ্ছি কেন?" মানসী জিজ্ঞেস করে।

কানু উত্তর দেয়, "নইলে যে এগারো মাইল পথ ঘুরে, সেই হুলোর ঘাট দিয়ে গাড়ি পার করতে হবে।"

মানসী আর কোনো প্রশ্ন করে না বোধকরি মনে মনে দুশ্চিন্তার জাল বুনছে।

কিন্তু সত্যই কি দুশ্চিন্তার কিছু আছে? পরিবহনের দায়িত্ব দিয়ে প্রভুপাদ যাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন সেই গৌর দাস এ পথের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য 'গাইড্'। তিনি প্রায় পনেরো ষোলো বছর ধরে বিভিন্ন দলের হয়ে পরিক্রমার ব্যবস্থা করছেন। সুতরাং তিনি যখন বলছেন, এই নৌকোতেই গাড়ি পার হবে, তখন আমাদের দুশ্চিন্তার কি কারণ থাকতে পারে?

গৌরবাবু বুঝতে পারেন, আমরা তাঁর কথা ঠিক বুঝতে পারছি না। তাই তিনি আবার আমাদের কাছে আসেন। বলেন, "নৌকাটা লম্বা করে পারে লাগানো হবে, গলুইটা থাকবে পারে মাটির ওপরে। একখানি করে গাড়ি ধরাধরি করে ঐ গলুইয়ের ওপর বসিয়ে দেওয়া হবে। গাড়ির চাকাদুটো থাকবে দুদিকে, নৌকোর বাইরে। তারপরে কয়েকজন করে যাত্রী গিয়ে নৌকোর আরেকদিকে বসবেন। তাঁদের ওজনে গাড়ির দিকটা উঁচু হয়ে যাবে। মাঝি নৌকো ছাড়বে। গৌরহরির কৃপায় আমিই এই পদ্ধতির প্রচলন করেছি।"

"কিন্তু মাঝনদীতে গিয়ে যদি গাড়ির একটা দিক কোনমতে কাত হয়ে যায়?" মানসীর আশাঙ্কা দূর হয় নি।

গৌরবাবু নির্বিকার স্বরে উত্তর দেন, "তাহলে নৌকো ডুবে যাবে। তবে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন মা! বাবার আশীর্বাদে সে রকম কিছু হবে না।"

"আচ্ছা, গরু পার করাবেন কেমন করে?" মাঝখান থেকে মতি জিজ্ঞেস করে।

মতি প্রভুপাদের শিষ্যা। বয়সে বোধকরি কৃষ্ণার চেয়ে বড়, সে বিবাহিতা। চাকরি করে, হুগলিতে থাকে। ছুটি নিয়ে পরিক্রমায় এসেছে, স্বামী আসতে পারেন নি। মতি সাধারণতঃ গুরু ও গুরুপুত্রদের সেবায় ব্যস্ত থাকে বলে অন্যদিকে বড় একটা নজর দিতে পারে না। এখন অবসর বলে আমাদের মাঝে এসে দাঁড়িয়েছে।

মতির প্রশ্নের উত্তরে গৌরবাবু বলেন, "এতটুকু নৌকোয় গরু পার করা যায় না, ওরা জল দেখলে বড় ছটফট করে।"

"তাহলে গরু পার হবে কেমন করে?"

"সাঁতরে।"

"মানে! গরু সাঁতার জানে?"

"জানে বৈকি!" গৌরবাবু উত্তর দেন। বলেন, "গাড়োয়ান যার যার গরুর দড়ি ধরে জলে নামবে। গরু তার সঙ্গে সাঁতার দিয়ে ওপারে চলে যাবে। একবারেই একজোড়া করে গরু পার হয়ে যাবে।" একবার থামেন গৌরবাবু। তারপরে বলেন, "একটু অপেক্ষা করুন মা, গরুর সাঁতার কাটা দেখতে পাবেন। আগে রাস্তাটা তৈরি হয়ে যাক।"

"ওরা ওদের কাজ করুক।" এবারে প্রভুপাদ কথা বলেন, "আমরা বরং চলো ঐ গাছের ছায়ায় গিয়ে একটু বসি, বড্ড রোদ উঠেছে।"

আমরা তাঁর সঙ্গে খানিকটা হেঁটে সেই গাছের গোড়ায় আসি। বেশ বড় বটগাছ, চমৎকার ছায়াশীতল। বৌদি মতি কৃষ্ণা জবা মানসী দুলাল গৌরদা আরও কয়েকজন এসেছেন। এবং আমাদের দেখাদেখি আরও অনেকে আসছেন।

মতি আসন পেতে প্রভুপাদের বসার জায়গা করে দেয়। তিনি আসন গ্রহণ করার পরে আমরা সবাই বসে পড়ি। আর বসে পড়েই মানসী জিজ্ঞেস করে, "আজ সন্ধ্যায় কি কালকের পর থেকে পাঠ শুরু করবেন?"

"ঠিক ওভাবে, তো পাওয়া যাবে না মা! এতবড় কর্মময় মহাজীবনের কথা সাতদিনে শেষ করব কেমন করে? তাই আজ ভাবছি বিশ্বরূপের সন্ন্যাস ও বিশ্বম্ভরের শিক্ষার কথা বলব।"

"ও মা! নিমাইয়ের দুষ্টুমির কথা একটুও বলবেন না, সব বাদ দেবেন?"

"কি করব বল? সব কথা বলতে চাইলে যে কোন কথাই বলা হয়ে উঠবে না।"

চুপ করে মানসী কি যেন একটু ভাবে। তারপরে বলে, "এখন তো আমাদের হাতে কোন কাজ নেই, আমরা বসে আছি। তাহলে এখন একটু বলুন না নিমাইয়ের দুষ্টুমির কথা।"

মানসীর কৌতূহলের কথা প্রভুপাদের অজানা নয়। তিনি আমার 'উত্তরশ্যাং দিশি' পড়েছেন। অতএব আর আপত্তি না করে বলতে শুরু করেন—

"মা, তুমি গৌরহরির দুষ্টুমির কথা শুনতে চাইছ, বেশ বলব। কিন্তু তার আগে শিশু গোরাচাঁদের রূপের কথা একটু শুনে নাও।"

"বেশ বলুন।" মানসী মাথা নাড়ে, একটু নড়ে-চড়ে বসে। তার চোখে-মুখে আনন্দের জোয়ার। এ জোয়ারে বোধকরি কোনদিন ভাটা পড়বে না।

প্রভুপাদ শুরু করেন, "মানুষের গায়ের রং কাচা হলুদের মতো হয়, এটা নেহাৎই কথার কথা। কিন্তু সেকালে নবদ্বীপের মানুষ সেই কথাকেই সত্য হতে দেখেছেন। গৌরহরির গায়ের রং ছিল সত্যই কাঁচা হলুদের মতো। অথচ তাঁর হাত-পায়ের পাতা ও ঠোঁটদুটি ছিল লাল—তাজা রক্তের মতো। সর্বদা সে ঠোঁটে হাসি লেগে রইত। তবে তাঁর দিকে তাকালেই প্রথম নজর পড়ত চোখদুটির দিকে। চোখ যে এমন দীঘল আর করুণাময় হতে পারে, তা কারও জানা ছিল না। শুধু চোখ নয়, সেই সঙ্গে চোখের দৃষ্টি। বালক নিমাই যার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করতেন, তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁর চিত্ত হরণ করে নিতেন।"

"তাঁর শরীর কি রকম ছিল বাবা?" জনৈক বৃদ্ধ ভক্ত জিজ্ঞেস করেন।

প্রভুপাদ উত্তর দেন, "চমৎকার। প্রতিটি অঙ্গের সুঠাম গঠন। অন্যান্য বালকদের চেয়ে বলিষ্ঠ দেহ। বুকখানি চওড়া কিন্তু কোমরটি সরু। বাহু আজানুলম্বিত অর্থাৎ হাত দুখানি হাঁটু পর্যন্ত প্রসারিত।"

একবার থামেন প্রভুপাদ। তারপরে আবার বলতে শুরু করেন, "বালক নিমাইয়ের মধ্যে আরেকটা অপ্রাকৃত ব্যাপার ছিল। তাঁকে কোলে নিলে সারা শরীরে কেমন একটা পুলকের শিহরণ বয়ে যেত। তাই প্রতিবেশীদের মধ্যে নিমাইকে কোলে নেবার জন্য সর্বদা কাড়াকাড়ি লেগে থাকত। ফলে শচীদেবী আর ছেলেকে কোলে নেবার সুযোগই পেতেন না।" আবার থামলেন প্রভুপাদ। আমরা তাঁর দিকে তাকাই।

একটু হেসে তিনি মানসীকে বলেন, "এবারে তোমার কথায় আসছি মা, বালক গৌরহরির দুষ্টুমির কথা বলছি।"

"বলুন।" মানসী আবার একটু নড়ে বসে। তার মুখে তেমনি আনন্দের জোয়ার।

প্রভুপাদ শুরু করেন—

"গৌরহরি পাঁচ বছরে পড়লেন। জগন্নাথ শুভদিন দেখে তাঁর হাতে খড়ি দিয়ে দিলেন। তখন নিম্ন-পাঠশালার গুরুমশায়দের বলা হত ওঝা। তাঁরা ছেলেদের বাংলা লেখা-পড়া হিসেবপত্র ও দলিল লিখতে শেখাতেন। নিমাই সুদর্শন ওঝার পাঠশালায় ভর্তি হলেন। সুদর্শন তাঁর মেধার পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হয়ে গেলেন। মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই নিমাই লিখতে ও পড়তে শিখে গেলেন। জগন্নাথ ও শচীমাতা ভারী আনন্দিত হলেন। তাঁদের বড়ছেলে বিশ্বরূপ তখন টোলে শাস্ত্র অধ্যয়ন করছেন। তিনিও ভাইয়ের স্মরণশক্তি দেখে খুবই খুশি হলেন।

স্মরণশক্তি যতই ভাল হ'ক, বালক বিশ্বম্ভর কিন্তু মোটেই মনোযোগী ছাত্র ছিলেন না। গুরুমশায়ের দেওয়া পড়াটুকু শিখে নিতে তাঁর সামান্যই সময় লাগত। তারপরেই শুরু হয়ে যেত খেলা। ওঝা চাইতেন মেধাবী ছাত্রটি লেখাপড়ায় মনোযোগী হয়, কিন্তু খেলাতেই তাঁর বেশি মনোযোগ।

সারাদিন শুধুই খেলা। আর খেলা মানেই দুষ্টামি। মা ধুইয়ে মুছিয়ে সাজিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু ছাড়া পেয়েই পথে নেমে ধুলোয় গড়াগড়ি। অতটুকু ছেলে কিন্তু তাঁর শীত-গ্রীষ্ম বোধ নেই, খাওয়া নেই, ঘুম নেই, কেবলি ক্লান্তিহীন দুরন্তপনা।

মা খেতে ডাকছেন, ঘুমুতে ডাকছেন, কিন্তু নিমাই খেলা ছেড়ে আসবেন না। মা ধরতে এলে ছুটে পালাবেন। শচীর সাধ্য কি তাঁকে ধরতে পারেন? না পেরে মা কেঁদে ফেলেন। আর আশ্চর্য, সঙ্গে সঙ্গে নিমাই কাছে এসে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরেন।

যতই দুরন্ত হোন, প্রিয়দর্শন বালকের প্রতি প্রতিবেশীদের প্রায় প্রত্যেকের প্রবল স্নেহ ছিল। তাঁরা তাঁর সব অত্যাচার হাসিমুখে সহ্য করতেন। পাড়ায় এক মোদক পরিবার বাস করতেন। তাঁদের একটা মিষ্টির দোকান ছিল। নিমাইকে পেলেই তাঁরা তাঁকে আদর করে ডেকে নিয়ে গিয়ে মিষ্টি খাওয়াতেন! তাঁকে খাইয়ে তাঁরা যে ভারী আনন্দ লাভ করতেন!

বালক বিশ্বম্ভরের আরও অনেক রকম দুষ্টুমি ছিল। যেমন মাঝে মাঝেই

তিনি ঠাকুরঘরে ঢুকে ঠাকুরের গলা থেকে ফুলের মালা খুলে নিজের গলায় পরে একেবারে মায়ের সামনে এসে দাঁড়াতেন। ভয়ে মায়ের প্রাণ কেঁপে উঠত। তিনি তাড়াতাড়ি পাগল ছেলেকে বুকে টেনে নিতেন। বার বার ঠাকুরের কাছে ছেলের হয়ে নিজে ক্ষমা ভিক্ষা করতেন।

সংসার প্রতিপালনের জন্য জগন্নাথ বাড়ির বাইরে থাকেন, বিদ্যাশিক্ষার জন্য বিশ্বরূপও টোলে দিন কাটান, ফলে দুষ্টু ছেলেকে নিয়ে শচীমাতা সারাদিন ব্যতিব্যস্ত হন। তবু তাঁর চেয়ে সুখী জননী নবদ্বীপে বোধকরি আর কেউ ছিলেন না। কিন্তু সে সুখ শুধুই মায়ের মনে। বাইরে সবাই তাঁর কষ্ট দেখে ব্যথিত হতেন।

একদিন এক তীর্থযাত্রী বিপ্র শচীমাতার অতিথি হলেন। তিনি বালগোপাল রূপে কৃষ্ণের আরাধনা করতেন। ভক্তি ও যত্ন সহকারে শচী তাঁর সেবার আয়োজন করে দিলেন। ব্রাহ্মণ রান্না শেষ করে খেতে বসলেন। খাওয়া শুরু করার আগে তিনি যথারীতি চোখ বুজে তাঁর ইষ্টদেবতাকে ভোগ নিবেদন করছেন, ঠিক সেই মুহূর্তে বিশ্বম্ভর ঘরে ঢুকে তাঁর সামনে বসে পড়ে তাঁর খাবার খেতে শুরু করে দিলেন। ব্রাহ্মণ চোখ মেললেন। খেতে খেতে নিমাই বললেন—আমি খাচ্ছি।

বালকের উচ্ছিষ্ট অন্ন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কেমন করে গ্রহণ করেন? তিনি বিরক্ত হয়ে উঠে পড়েন। হাত-মুখ ধুয়ে চলে যেতে চান।

কিন্তু পারেন না। শচী ও জগন্নাথের অনুরোধে আবার রান্না করেন। কিন্তু এবারেও একই ঘটনা ঘটে। খাবার আগে তিনি চোখবুজে যেই তাঁর বালগোপালকে স্মরণ করেছেন, অমনি কোথা থেকে নিমাই ছুটে এসে সেই খাবার খেতে শুরু করে দিলেন।

ব্রাহ্মণ এবারে বিস্মিত হন। কিছুতেই বুঝতে পারেন না, কেমন করে এমন ঘটনা ঘটছে। তাঁর কেমন একটা জিদ চেপে বসে। তাই আবার রান্না করতে লেগে যান। তখন গভীর রাত। সারা নবদ্বীপ ঘুমিয়ে পড়েছে। বালক নিমাইকে ঘরে আটকে রাখা হয়েছে। এতক্ষণে তিনিও নিশ্চয়ই ঘুমে অচেতন।

নিশ্চিন্ত মনে তিনি রান্না শেষ করেন। তারপরে খাবার সামনে নিয়ে তেমনি তাঁর ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নিমাই এসে খেতে শুরু করে দিলেন।

ব্রাহ্মণ বলে ওঠেন—তুমি কে? কেন তুমি বার বার আমার ইষ্টদেবের ভোগ উচ্ছিষ্ট করে দিচ্ছ?

—সে কি ! বালক উত্তর দেন—তুমিই তো আমাকে স্মরণ করছ। ভক্ত ডাক দিলে আমি কি না এসে থাকতে পারি ? তাই তো আমি এসে তোমার ভোগ গ্রহণ করছি।

—তুমি কে ?

···আমি···।

ব্রাহ্মণ স্পষ্ট দেখতে পেলেন বালক নিমাই নন, তাঁর সামনে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী স্বয়ং নারায়ণ চতুর্ভুজ মূর্তিতে দণ্ডায়মান।

ব্রাহ্মণ আনন্দে চিৎকার করে উঠতে চান। পারেন না। নারায়ণ আদেশ করেন—কাউকে একথা বলবে না, বললে তোমার ক্ষতি হবে।

তারপরেই ব্রাহ্মণ দেখলেন, নারায়ণ নয় নিমাই—বালক নিমাই তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে হাসছেন। তৈর্থিক বিপ্র তাঁকে প্রণাম করলেন। তিনি সশ্রদ্ধ চিত্তে বালকের সেই উচ্ছিষ্ট অন্ন গ্রহণ করে ধন্য হলেন।"

থামলেন প্রভুপাদ। বাস্তবে ফিরে আসি। আমরা গৌড়মণ্ডল পরিক্রমায় বেরিয়ে রাজাপুর থেকে স্বর্ণবিহারে চলেছি। পথে জলঙ্গীর তীরে গৌরকথার আসর বসেছে।

কিন্তু প্রভুপাদের গৌরকথা কি শেষ হয়ে গেল ? একটু আগে সবে প্রথম গাড়িটি নৌকোয় তোলা হয়েছে। আমরা তো চতুর্থ গাড়ির সঙ্গে ওপারে যাবো। তার এখনও অনেক দেরি।

না, প্রভুপাদ আবার গৌরকথা শুরু করেছেন। তিনি বলছেন—

"পিতামাতা ও প্রতিবেশীদের কছে বালক বিশ্বম্ভরের আরেকটি আকর্ষণ ছিল, তিনি ভারী সুন্দর নাচতে পারতেন। তাঁর নাচ দেখার জন্য প্রতিবেশীরা তাঁকে সন্দেশ ও কলা খেতে দিতেন। একহাতে সন্দেশ ও একহাতে কলা নিয়ে দুহাত ওপরে তুলে অপূর্ব ভঙ্গিতে নিমাই নাচতে থাকতেন। আর আশ্চর্য, সেই নাচ দেখে সবার মন আনন্দময় হয়ে উঠত। শরীর রোমাঞ্চিত হত, হৃদয় নেচে উঠত। কিন্তু পাছে লোকে পাগোল বলে, তাই তাঁরা তাঁর সঙ্গে নাচতে পারতেন না।

পাঠশালায় ভর্তি হবার পর থেকেই নিমাইয়ের দুরন্তপনার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছিল। এখন তিনি পাঠশালায় যাওয়া-আসার পথে বেশির ভাগ সময় পথে আর গঙ্গাতীরে কাটান। গঙ্গার বালুকাবেলায় ছুটোছুটি আর জলে নেমে স্নানার্থীদের উত্যক্ত করাই তাঁর প্রধান কাজ। তাঁরা গঙ্গার ঘাটে স্নান-আহ্নিক পুজো-পাঠ কিছুই করতে পারেন না। নিষেধ করলে নিমাই আরও

বেশি উপদ্রব করেন। তাড়া করলে ছুটে পালান। ধরা পড়লে অনুনয় বিনয় করে তাঁদের মোহিত করেন।

স্নানার্থীরা প্রায়ই জগন্নাথের কাছে নালিশ করেন। বাপ রেগে গিয়ে ছেলেকে শাস্তি দিতে চান। কিন্তু মা ছুটে এসে তাঁকে বুকে টেনে নেন। কোনদিন যদিবা জগন্নাথ ছেলের গায়ে হাত দিয়ে ফেলেন, পরে ছেলের করুণ কান্না শুনে বড়ই কষ্ট পান।

তবু নিমাই বাপকে একটু ভয় করতেন। কিন্তু মাকে বিন্দুমাত্র নয়। তিনি ভয় করতেন দাদা বিশ্বরূপকে। দাদা ভাইয়ের চেয়ে দশ বছরের বড়। তবে তিনি সারাদিন নিজের লেখাপড়া নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। ভাইয়ের দুরন্তপনা নিয়ে তিনি বড় একটা মাথা ঘামান না। ফলে নিমাইয়ের দুষ্টুমি দিন দিন বেড়েই চলল।

আর তাঁর দুষ্টুমির বেশির ভাগ ছিল মায়ের সঙ্গে। যেমন মা তাঁর চাঁদের মতো সুন্দর মুখখানি দেখতে বড়ই ভালোবাসতেন। কিন্তু অতটুকু ছেলে হলে কি হয়, মায়ের এই দুর্বলতাটুকু ঠিক বুঝতে পেরেছিলেন। তাই মায়ের সামনে গিয়ে নিমাই তাঁর দিকে পেছন ফিরে দাঁড়াতেন। মা ছেলেকে তাঁর দিকে ফিরতে বলতেন, নিমাই ভ্রুক্ষেপ করতেন না। মা রাগ হয়ে তাঁকে ধরতে যেতেন। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে নিমাই আস্তাকুড়ে দাঁড়াতেন। মা সেখানে যেতে পারতেন না।

বিশ্বম্ভরের এসব আচরণ মায়ের ভাল লাগত না। কিন্তু তিনি বুঝতে পারতেন, তাঁর ছেলে অন্য ছেলেদের মতো নয়। হয় সে পাগোল, নয় সে দেবাবিষ্ট।

যাই হোক, এ ভাবেই শচীর দিন কাটছিল। এই সময় নিমাই একদিন আবার এক নূতন ঝামেলা বাঁধালেন। জগন্নাথ মিশ্রের বাড়ির কাছে জগদীশ পণ্ডিত ও হিরণ্য ভাগবত নামে দু'জন ব্রাহ্মণ বাস করতেন। এক একাদশীর দিনে নিমাই বায়না ধরলেন, তাঁদের বাড়ির একাদশীর নৈবেদ্য তাঁকে খেতে দিতে হবে। মা অনেক চেষ্টা করেও নিমাইকে ভোলাতে পারলেন না। বাবা বাজার থেকে নৈবদ্যের যাবতীয় উপকরণ কিনে এনে দিতে চাইলেন। কিন্তু তাতে হবে না। তাঁর ঐ নৈবদ্য চাই। নিমাই বাড়িতে একটা হুলুস্থুল বাঁধিয়ে দিলেন।

অবশেষে কথাটা সেই ব্রাহ্মণদের কানে গেল। তাঁরা মজা দেখার জন্য জগন্নাথের বাড়িতে এলেন। আর আশ্চর্য, বালক বিশ্বম্ভরের দিকে দৃষ্টি পড়তেই

তাঁদের মনে হল নিমাই নয়, হরি—স্বয়ং বালগোপাল তাঁদের সামনে দাঁড়িয়ে। তাঁরা মুগ্ধ দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন সেখানে। তারপরে ছুটে গেলেন বাড়িতে। সমস্ত নৈবেদ্য নিয়ে এসে নিমাইয়ের সামনে রেখে সস্নেহে বললেন—তুমি গোপাল, তুমি খাও! তুমি খেলেই আমাদের গোপালের খাওয়া হবে।

মা কিন্তু অন্য কথা ভাবেন। তিনি ভাবলেন, তাঁর ছেলেটা কি সত্যই খেপা? তিনি কয়েকজন প্রতিবেশী গৃহিণীকে বাড়িতে ডেকে আনলেন। তাঁদের কাছে সবকথা খুলে বলে তাঁদের পরামর্শ চাইলেন! তাঁরা ভাবলেন বালককে একটু বোঝানো যাক। একজন নিমাইকে জিজ্ঞেস করলেন—তুমি বামুনের ছেলে, পণ্ডিতের ছেলে অথচ শুনছি তুমি নাকি ভগবান মানো না?

—আমি আবার কোন্ ভগবানকে মানব? আমিই তো ভগবান। সবাই আমাকে মানবে। সঙ্গে সঙ্গে বালক উত্তর দিলেন।

আর কেউ তাঁকে কোনো প্রশ্ন করতে সাহস পেলেন না। অনেক আলোচনার পরে তাঁরা সাব্যস্ত করলেন—এ নিশ্চয়ই কোনো অপদেবতার কাজ। সুতরাং শান্তি স্বস্ত্যয়ন করা দরকার।

শচী তাঁদের পরামর্শ মেনে নিলেন। তবে সমস্ত ব্যবস্থাটি তাঁকে গোপনে করতে হল। কারণ নিমাই টের পেলে আর রক্ষে রাখবেন না।

কিন্তু শচীর সব আয়োজন বিফলে গেল। শান্তি স্বস্ত্যয়নের পরেও বিশ্বম্ভরের দুষ্টুমি কমা তো দূরের কথা, বরং আরও বেড়ে গেল।"

থামলেন প্রভুপাদ।

সঙ্গে সঙ্গে মানসী বলে ওঠে, "হয়ে গেল?"

"না।" প্রভুপাদ মৃদু হাসেন। বলেন, "তবে আর একটা ঘটনা বলে এখনকার মতো শেষ করব। কারণ দ্বিতীয় গাড়ি নৌকোয় তোলা হয়েছে। আমাদেরও ভাগে ভাগে নৌকোয় উঠতে হবে, নইলে গাড়ি পার করা যাবে না। ওপারে গিয়ে তোমরা স্নান ও জলখাবার খাবে!"

"বেশ তো খাওয়া যাবে।" মানসী যেন ধৈর্যহীনা। সে বলে, "আপনি এখন ঘটনাটা বলুন।"

প্রভুপাদ আবার হাসেন। আমারও হাসি পায়। সেই একই কথা মনে পড়ে—মানালীতে মানসীর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের পরে কত বছর কেটে গেল, কিন্তু তার সেই গল্প শোনার আগ্রহ আজও কিছুমাত্র কমল না। কেবল সেদিন সে হিমাচলের কথা শুনতে চেয়েছে আর আজ গৌরকথা শুনতে চাইছে।

প্রভুপাদ প্রশ্ন করেন, "তোমরা মুরারি গুপ্তের নাম শুনেছো ?"

আমরা মাথা নাড়ি। মানসী বলে, "তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের প্রথম জীবনীকার।"

"হ্যাঁ।" প্রভুপাদ বলতে থাকেন, "মুরারি মহাপ্রভুর চেয়ে প্রায় পনেরো বছরের বড় ছিলেন। তাঁরও বাড়ি শ্রীহট্টে এবং তিনিও নবদ্বীপে জগন্নাথ মিশ্রের সঙ্গে একই পাড়ায় বাস করতেন। জগন্নাথের সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট সৌহার্দ ছিল।

তখন তাঁর বয়স বছর বিশেক। তিনি গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে পড়াশুনা করেন। মুরারি নির্মল চরিত্রের মানুষ, তাঁর সর্বজীবে অশেষ দয়া। কিন্তু যোগবশিষ্ঠ পড়ে পড়ে তিনি নিজেকে প্রায় ভগবান ভাবতে শুরু করেছেন। ফলে তাঁর ভগবদ্ভক্তি ছিল না।

একদিন মুরারি তাঁর কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে যোগবশিষ্ঠ চর্চা করতে করতে পথ চলেছেন। তিনি হাত ও মুখ নেড়ে একমনে বন্ধুদের যোগবশিষ্ঠ বোঝাচ্ছেন। হঠাৎ একটা সমবেত হাসির শব্দ তাঁর কানে এলো। তিনি বিরক্ত হয়ে পেছন ফিরলেন। সবিস্ময়ে দেখলেন, তাঁর চলা হাতনাড়া ও মুখভঙ্গি নকল করে বালক নিমাই পথ চলছেন আর তাই দেখে তাঁর সঙ্গীরা হেসে খুন হচ্ছেন।

মুরারির খুবই রাগ হল। তবু তিনি গম্ভীর প্রকৃতির যুবক। বালক নিমাইকে কিছু না বলে তিনি আবার পথ চলতে শুরু করলেন। চলতে চলতে আবার বন্ধুদের বোঝাতে থাকলেন।

নিমাইও আবার তাঁর অঙ্গভঙ্গি অনুকরণ করতে আরম্ভ করলেন। তাঁর সঙ্গীরা আবার তেমনি অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন।

এবারে মুরারি আর সহ্য করতে পারলেন না। তিনি মন্তব্য করলেন—"জগন্নাথ মিশ্রের একটা অকাল কুষ্মাণ্ড ছেলে জন্মেছে। এটাকে আবার অনেকে ভাল বলেন, আশ্চর্য !"

থামলেন প্রভুপাদ। আমরা তাঁর মুখের দিকে তাকাই। তিনি আবার বলতে শুরু করেন, "ভাল কিন্তু তিনিও বলেছেন। এবং যাঁরা তখন নিমাইকে ভাল বলতেন, তিনি তাঁদের চেয়ে অনেক বেশি ভাল বলেছেন। সেদিন তিনি যাকে অকাল কুষ্মাণ্ড বলেছিলেন, সেই নিমাইয়ের প্রথম জীবনীকার মুরারি গুপ্ত। পরবর্তীকালে তিনি মহাপ্রভুর একজন শ্রেষ্ঠ ভক্ত। কিন্তু ভক্ত-মুরারির কথা পরে হবে। এখন শুধু সেদিনের ঘটনা প্রসঙ্গে আমি তোমাদের কবি বলরাম দাসের কয়েকটি পঙক্তি উপহার দিচ্ছি। বলরাম দাস লিখেছেন—

'শিশুগণ হাসিতেছে দেখে ক্রোধ হ'ল।
"হারে জগন্নাথ-স্থত কুষ্মাণ্ড অকাল॥"
জগন্নাথ ঘরে দুরাচার এ জন্মেছে।
বাপের আদরে ক্রমে দ্বিগুণ বাড়িছে॥"
ভ্রুকুটি করিয়া নিমাই বলে "যাও চ'লে!
তোমা ভাল শিক্ষা দিব ভোজনের কালে॥"...

তারপরে আবৃত্তি থামিয়ে প্রভুপাদ বলেন, "সত্যি সত্যি একদিন নিমাই খাবার সময় মুরারির বাড়িতে এসে হাজির হলেন এবং তাঁর পাতে প্রস্রাব করে দিলেন। মুরারির খুবই রাগ হল। কিন্তু তিনি তাকিয়ে দেখেন, বালক হলেও নিমাইয়ের চোখ থেকে যেন আগুন বের হচ্ছে। তিনি ভয় পেয়ে গেলেন। বালক নিমাই বৃদ্ধের ভঙ্গিতে তাঁকে বলেন—

"হাত নাড়া মাথা নাড়া ছাড় হে মুরারি।
জ্ঞান ও বক্তৃতা ছাড়ি ভজহে শ্রীহরি॥
জীব আর ভগবানে ভিন্ন যে না করে।
প্রস্রাব করি আমি তার থালের উপরে॥"
বলিয়া চকিতের মত কোথা চ'লে গেল।
ক্ষণেকের মত মোর অঙ্গ স্তব্ধ হ'ল॥
পুলকে পুরিল অঙ্গ সে কথা শুনিয়া।
আনন্দে পুরিল অঙ্গ রাগ না হইয়া॥
পাছে ধাই গেনু জগন্নাথ-মিশ্র ঘরে।
প্রণমিনু শচী-স্থতে লোটাইয়া শিরে॥
আমাকে দেখিয়া তখন ধূর্ত শিরোমণি।
জননী-অঞ্চলে লুকাইল মুখখানি॥
জগন্নাথ বলে "তুমি কি কাজ করিলে।
অকল্যাণ হবে মোর স্থতে প্রণমিলে?"
তখন কহিনু "মিশ্র কিছু দিন পরে।
জানিবে কে জন্মিয়াছে তোমার মন্দিরে॥"

॥ আট ॥

শেষ গাড়ির সঙ্গে আমি ও মানসী এপারে এলাম। বলা বাহুল্য আমরা প্রভুপাদের সঙ্গেই নদী পার হলাম। জলঙ্গীর এই ঘাটের নাম গুমাঘর ঘাট। কিন্তু ঘাট মানে যে শুধুই নদী পারাপারের জন্য নির্দিষ্ট একফালি বেলাভূমি, তা আগেই বলেছি। তবে এপার ওপারের মতো অতো খাড়া নয়। নৌকো থেকে গাড়ি তুলে আনার জন্য মাটি কাটার প্রয়োজন হয় নি।

এপার আরও সুন্দর। নদীর বেলাভূমি ছাড়িয়েই আখক্ষেত। এক নাগাড়ে অনেকটা জুড়ে নয়, এখানে-ওখানে ছিটিয়ে-ছড়িয়ে। দুটি আখক্ষেতের মাঝে বেশ খানিকটা করে ফাঁকা জায়গা। এখানে ধান ও পাটক্ষেত দেখছি না। তবে নদীয়া জেলায় ধান এবং পাট হয়। আউশ ও আমন দু-রকমেরই ধান। গুড় এবং তাঁত শিল্প নবদ্বীপ অঞ্চলের প্রধান জীবিকা। এখানেও একটু দূরে শিমুল গাছ দেখছি। আর দেখছি বাঁশবন।

যাক্ গে, যেকথা বলছিলাম। এপারের তীরভূমি সত্যই মনোরম। যাঁরা আগে এসেছেন, তাঁরা আখক্ষেতের পাশে পাশে সুবিধে মতো জায়গা বেছে নিয়ে শুয়ে বসে ছিলেন। প্রভুপাদকে নৌকো থেকে নামতে দেখে সবাই উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে এলেন। গৌরদা প্রভুপাদের জন্য আগের থেকেই জায়গা ঠিক করে রেখেছিলেন। তিনি আসন গ্রহণ করার পরে সহযাত্রীরা নিজেদের জায়গায় ফিরে গেলেন।

প্রভুপাদ বললেন, "তোমরা এবারে স্নান করে নাও, তারপরে চিঁড়ে মহোৎসব হবে।"

আমি ও মানসী কয়েক পা হেঁটে আখক্ষেতের ছায়ায় জিনিসপত্র নামাই। মানসী জিজ্ঞেস করে, "তুমি স্নান করবে?"

প্রশ্নকর্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারছি না, অনুমতি মিলবে কিনা? তবু সবিনয়ে নিবেদন করি, "গতকাল স্নান হয় নি, আজ একটা ডুব দিয়ে নিতে পারলে ভাল হয়। তাছাড়া এমন টলটলে জল!"

"কিন্তু তোমার আবার ঠাণ্ডা লেগে না যায়।" সে যেন চট করে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না।

আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠি, "না না, ঠাণ্ডা লাগবে কেন? একে তো এমন

চড়া রোদ, তার ওপরে নদীর জল। যে জলে স্রোত বয়, সে জলে কখনও ঠাণ্ডা লাগে না।"

মানসী নীরব রয়েছে। কি যেন ভাবছে মনে মনে। আমিও তার সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় নীরব থাকি। একটু বাদে সে আপন মনে বলে, "সারাদিন রোদে ঘুরতে হচ্ছে, কাল স্নান করো নি। আজও স্নান না করলে শরীর কষে যেতে পারে।"

একবার থামে সে। আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। সে আমার দিকে তাকায়। দুজনে চোখাচোখি হয়। একটু হাসে মানসী। বলে, "বেশ, ঝোলা থেকে তেল গামছা বের করে নাও। ভাল করে তেল মেখে সাবধানে নদীতে নেমে ডুব দিয়ে এসো। বেশিক্ষণ জলে থাকবে না। চলো, আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি।"

সবই ঠিক ছিল। কিন্তু শেষের কথাটি কানে আসতেই আমার স্নানের উৎসাহ উবে যায়। আমি নদীতে নেমে স্নান করব আর উনি তীরে দাঁড়িয়ে আমাকে পাহাড়া দেবেন! দৃশ্যটা সেযুগের যমুনাপুলিনের উপযোগী হলেও এযুগে জলঙ্গীর তীরে নেহাৎই বেমানান। এমনিতেই আমাদের সম্পর্কে সহযাত্রীদের কৌতূহলের অন্ত নেই, তার ওপরে মানসীর প্রস্তাবিত অবগাহন অপমানের বোঝা ভারী করবে। কিন্তু সোজাসুজি সেকথা বললে আমার বিপদ বাড়বে। তাই শান্তস্বরে বলি, "তোমাকেও তো স্নান করে নিতে হবে! তুমি অযথা আমার জন্য সময় নষ্ট করবে কেন? তার চাইতে কৃষ্ণা কিংবা মতির সঙ্গে তুমি স্নান করতে চলে যাও। আমিও তেল মেখে দুটো ডুব দিয়ে আসছি। কথা দিচ্ছি, বেশিক্ষণ জলে দাঁড়িয়ে ঠাণ্ডা লাগাবো না।"

তবু সে নিশ্চিন্ত হতে পারে না। তাই বলে, "বেশ, আমি এখানেই বসছি। তুমি ফিরে এলে, আমি যাবো।"

অর্থাৎ এখানে বসেই সে আমাকে পাহাড়া দেবে। কিন্তু আমি আর কথা না বাড়িয়ে তেল-গামছা নিয়ে নদীর দিকে এগিয়ে চলি।

মানসী স্নান করে আসার পরে আমরা ভিজে কাপড় রোদে মেলে দিয়ে প্রভুপাদের কাছে আসি। তিনি চিঁড়ে বিতরণ শুরু করেছেন। সহযাত্রীদের অনেকের সঙ্গেই কোনো পাত্র নেই। তাঁরা ধুতি কিংবা শাড়ীর আঁচলেই চিঁড়ে নিয়ে ঝোলাগুড় দিয়ে মেখে মহানন্দে মুখে দিচ্ছেন। বেলা দশটার সময় এই ব্রেকফাস্ট পেয়েই সবাই আনন্দে আত্মহারা। তাঁরা যে প্রভুপাদের হাত থেকে চিঁড়ে নিচ্ছেন। ভক্তি আর ভালোবাসার পরশ পেলে শাকান্ন

মিষ্টান্নে পরিণত হয়, সংসার স্বর্গে রূপান্তরিত হয়।

আমাদের দুজনের ঝোলায় দুটি মগ ছিল। মানসী নদীতে নেমে সে দুটি ধুয়ে নিয়ে এলো। তারই মধ্যে চিঁড়ে ধুয়ে গুড় মেখে খেতে শুরু করি। আমরা সত্যই ভাগ্যবান। গৌড়মণ্ডল পরিক্রমাকালে শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুর জনৈক বংশধরের হাত থেকে চিঁড়ে প্রসাদ পেয়েছি। এ সত্যই চিঁড়ে-মহোৎসব। তাই জলঙ্গীর তীরে দাঁড়িয়ে চিঁড়ে খেতে খেতে পানিহাটির সেই অবিস্মরণীয় চিঁড়ে-মহোৎসবের কথা মনে পড়ছে আমার। মনে মনে সেই শুভ-উৎসবের কথাই ভেবে চলি—

চিঁড়ে-মহোৎসবের অপর নাম দণ্ড-মহোৎসব। মহাপ্রভুর অন্যতম শ্রেষ্ঠ পার্ষদ শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীকে শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভু দণ্ডদান করেছিলেন, চিঁড়ে দই খাওয়াতে বলেছিলেন।

রঘুনাথ ছিলেন বড়লোকের ছেলে। তাঁর বাবা শ্রীগোবর্ধন দাস সপ্তগ্রামের জমিদার। একমাত্র পুত্র রঘুনাথ তাঁর দু'চোখের মণি।

কিন্তু রঘুনাথ বালক বয়সেই হরিদাস ঠাকুরের কৃপা লাভ করেন ও মহাপ্রভুকে দর্শন করেন। সেই থেকেই তাঁর বৈরাগ্যের উদয় হয়। যত বয়স বাড়ে, তিনি তত বেশি উদাসী হতে থাকেন।

একমাত্র বংশধরের বৈরাগ্যে বাপ-জেঠা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তাঁদের মনে হল—বিয়ে দিলে এ রোগ সারবে। পরমা সুন্দরী এক কিশোরীর সঙ্গে রঘুনাথের বিয়ে দেওয়া হল।

কিন্তু ঐশ্বর্য ও স্ত্রী তাঁকে বৈরাগ্য মুক্ত করতে পারল না। পাছে বংশের একমাত্র পুত্র পালিয়ে যায়, তাই তাঁকে ঘরে বন্দী করে রাখা হল। রঘুনাথ তবু পালালেন, কিন্তু ধরা পড়লেন। আবার পালালেন, আবার ধরা পড়লেন।

রঘুনাথের মনে দ্বন্দ্ব দেখা দিল। তিনি ভাবলেন—আমি বারে বারে পালিয়ে প্রভুর কাছে যেতে চাই, কিন্তু পারি না, ধরা পড়ে যাই। তাহলে কি নিজের চেষ্টায় আমি শ্রীমন্মহাপ্রভুর কাছে পৌঁছতে পারব না? হয়তো তাই। কারণ নিত্যানন্দরূপ আনন্দ-ভেলা না পেলে সংসার সমুদ্র পার হয়ে চৈতন্যদ্বীপে পৌঁছন সম্ভব নয়।

তিনি বাবার কাছে নিত্যানন্দকে দর্শন করার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। পিতা আপত্তি করেন না। কারণ মহাপ্রভুর নির্দেশে নিত্যানন্দ তখন খড়দহে সংসার পেতেছেন।

গঙ্গা পার হয়ে রঘুনাথ পানিহাটিতে গেলেন। তাঁর আর খড়দহে যাবার

প্রয়োজন হল না। সেখানেই তিনি নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ লাভ করলেন। গঙ্গাতীরে একটা গাছের ছায়ায় শিষ্যপরিবৃত হয়ে নিত্যানন্দ গৌরকথা আলোচনা করছিলেন।

রঘুনাথ ছুটে এসে তাঁকে দণ্ডবৎ করলেন। নিত্যানন্দ আনন্দে চিৎকার করে বলে উঠলেন—হ্যারে চোর, এতদিন পরে এসে ধরা দিলি!

—চোর! রঘুনাথ সবিস্ময়ে বলে উঠলেন—আমি চোর!

—হ্যাঁ, তুই চোর। আমার সম্পত্তি হয়ে তুই নিজেকে শ্রীচৈতন্যর চরণে উৎসর্গ করতে চাইছিস? তুই চোর বৈকি, এক শ' বার চোর।

পরম পুলকে রঘুনাথ তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়লেন। নিতাই তাড়াতাড়ি তাঁর মাথাটি নিজের পায়ের ওপর চেপে রাখলেন কিছুক্ষণ। তারপরে বললেন—নে, এবার উঠে বোস, আমার কথা শোন!

মাথা তুলে রঘুনাথ বললেন—আদেশ করুন প্রভু!

—আদেশ নয়, দণ্ড! তুই চোর। আর ধরতে যখন পেরেছি, তখন তোকে আমি দণ্ডদান করবই।

—কি দণ্ড প্রভু? আমি মাথা পেতে সে দণ্ড গ্রহণ করব।

—বেশ, তুই আমাদের চিঁড়ে-দই খাওয়া।

—এই দণ্ড। রঘুনাথের দুচোখ বেয়ে আনন্দাশ্রু নেমে এলো। তিনি নিত্যানন্দকে আরেকবার দণ্ডবৎ করে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর অনুমতি নিয়ে টাকা আনার জন্য বাড়িতে লোক পাঠালেন। তারপরে উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীকে করজোড়ে অনুরোধ করলেন—আপনারা চারিদিকে প্রচার করে দিন, পানিহাটিতে চিঁড়ে মহোৎসবের মেলা বসবে। স্বয়ং শ্রীনিত্যানন্দ সবাইকে প্রেম দান করবেন। যে যা পারে, চিঁড়ে দই কলা ক্ষীর ও সন্দেশ নিয়ে চলে আসুক, আমি ন্যায্য মূল্যে কিনে নেব সব। আর যে যেখানে আছেন, চলে আসুন এখানে। শ্রীনিত্যানন্দের আনন্দমেলায় সবার নিমন্ত্রণ। প্রত্যেকে পেটভরা প্রসাদ পাবে। কারও কোনো ভয় নেই, লজ্জা নেই, সবাই সানন্দে উপস্থিত হোক্ এই আনন্দমেলায়।

শাক্ত-বৈষ্ণ হিন্দু-মুসলমান ধনী-দরিদ্র পণ্ডিত-মূর্খ, সবাই এলেন। চারিপাশের গ্রাম উজার করে কয়েক হাজার নারী-পুরুষ বালক-বালিকা উপস্থিত হলেন শ্রীরাঘব পণ্ডিতের বাড়িতে। এলেন রামদাস, সুন্দরানন্দ, গঙ্গাধর, মুরারি, কমলাকর, সদাশিব কবিরাজ, পুরন্দর পণ্ডিত, ধনঞ্জয়, জগদীশ, পরমেশ্বর দাস, গৌরীদাস, কৃষ্ণদাস, মহেশ, উদ্ধারণ দত্ত এবং আরো অনেকে।

দই কলা ক্ষীর ও সন্দেশ দিয়ে বেশ কয়েক মণ চিঁড়ে মাখা হল। নিতাই নিজের হাতে পরিবেশন আরম্ভ করলেন। রাঘবকে বললেন—আমি আজ গোপদের নিয়ে পুলিন ভোজন করছি, তুমিও খাও।

নিতাইয়ের অন্তরে সেদিন বলরামের ভাব, সেই সখাদের সঙ্গে কৃষ্ণ-বলরামের যমুনাপুলিনে ভোজন।

সবাই প্রসাদ পেলেন কিন্তু রঘুনাথকে বসতে দিলেন না নিত্যানন্দ। বললেন—তোর দণ্ড এখনও পূর্ণ হয় নি। আমি খাচ্ছি। খাবার পরে যদি আমার পাতে কিছু থাকে, তাই তোর ভাগ্যে জুটবে।

রঘুনাথের চোখে আবার আনন্দাশ্রুর ধারা নেমে এলো, আর উপস্থিত ভক্তমণ্ডলী সেদিন রঘুনাথের সেই সৌভাগ্য দর্শন করে ধন্য হলেন।

নিত্যানন্দ ও রঘুনাথ অপ্রকট হয়েছেন। পানিহাটিরও প্রচুর পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু চিঁড়ে মহোৎসব আজও রয়েছে। পানিহাটির রাঘবমন্দিরে প্রতিবছর সেই পুণ্যতিথিতে চিঁড়ে-মহোৎসবের আনন্দমেলা বসে। শ্রীনিত্যানন্দের উত্তরপুরুষ শ্রীমদনগোপালের হাত থেকে চিঁড়ে প্রসাদ পেয়ে আমার সেই চিঁড়ে মহোৎসবের কথাই মনে পড়ে গেল।

ইতিমধ্যে গাড়িগুলো রওনা হয়ে গিয়েছে। প্রভুপাদ নিজেও চারটে চিঁড়ে মুখে দিয়ে নিলেন। তারপরে গৌরদাকে জিজ্ঞেস করলেন, "এখন রওনা হবে কি?"

"তা হওয়া যেতে পারে।" গৌরদা উত্তর দেন।

কাশীনাথ বলে, "কিন্তু এখন রওনা হলে তো ওখানে পৌঁছে প্রসাদের জন্য বসে থাকতে হবে।"

"এখানে বসে থেকেই বা কি করবি?" প্রভুপাদ হাসতে হাসতে বলেন।

জবা মাথা নেড়ে বলে, "আমরা গৌরকথা শুনব বাবা!"

জবা আমাদের দলের সবচেয়ে ছোট মেয়ে। সবে শাড়ী ধরেছে। সুতরাং তার এই গৌরপ্রীতি প্রীতিপ্রদ। তবু প্রভুপাদ তার প্রস্তাব অনুমোদন করেন না। বলেন, "এখন আর গৌরকথা নয়, আবার সন্ধ্যের সময় গৌরকথা হবে। এখন চল, রওনা হওয়া যাক।"

প্রভুপাদ উঠে পড়েন। আমরাও তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নিই সব। কাঁসরে বাড়ি পড়ে, খোল-করতাল বেজে ওঠে। মেয়েরা উলুধ্বনি দেন।

আজ বুঝতে পারলাম আমার অনুমান মিথ্যে নয়। মানসী সত্যিই সকলের সঙ্গে উলুধ্বনি দিল। অথচ খুকুর বিয়ের সময়ও দেখেছি সে এ কাজটি পারে

না। কেনই বা পারবে? বিলেত ফেরৎ ডাক্তারের মেয়ে। ছোটবেলায় মাকে হারিয়ে সাহেবী পরিবেশে মানুষ হয়েছে। এমনকি মানালীতে যেদিন তার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা, সেদিনও সে স্ল্যাক্স পরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তার পক্ষে উলু না দিতে পারাই স্বাভাবিক। সুতরাং এ বিদ্যেটি সে সদ্য রপ্ত করেছে। কিন্তু কবে? এবারে নবদ্বীপে আসার পরে কি?

রপ্ত যখুনি করুক, তার উলুধ্বনি কিন্তু নিখুঁত। বোঝা যাচ্ছে না যে বুড়ো বয়সে বিদ্যেটি আয়ত্ত করেছে। আর এই এ্যাডজাস্টমেণ্ট্ বা নিজেকে উপযোগী করে নেওয়াই বোধকরি ওর সবচেয়ে বিস্ময়কর গুণ।

কিন্তু মানসীর কথা আর নয়। ওর কথা ভাবতে আরম্ভ করলে যে আমি আর শেষ করতে পারব না। তার চেয়ে পরিক্রমার কথায় ফিরে আসি।

প্রভুপাদ উঠে দাঁড়াতেই সংকীর্তন শোভাযাত্রার আয়োজন শুরু হয়ে যায়। জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে সবাই সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে যান। পরিক্রমার ক্রম ঠিক করে নিতে আরও কিছুক্ষণ কেটে যায়। তারপরে শুরু হয় সংকীর্তন। শোভাযাত্রা এগিয়ে চলে। এখন বেলা পৌনে এগারোটা।

আখক্ষেতের পাশ দিয়ে মাটির পথ। আমরা এখন সেই পথ দিয়ে দক্ষিণে চলেছি। রাজাপুর থেকে সুবর্ণবিহার ছয় মাইল। আমরা আরও আধ মাইল এগিয়ে গৌরাঙ্গ নগরে গিয়ে রাতের আস্তানা গাড়ব। তার মধ্যে মাত্র মাইল দেড়েক এসেছি। অথচ ইতিমধ্যে প্রায় চারঘণ্টা সময় পেরিয়ে গেছে। এখনও মাইল পাঁচেক পথ পেরোতে হবে।

সকালে ওপারে পথ চলার সময় নামকীর্তন হয়েছে, বিকেলে কিন্তু ভক্তিরত্নাকর থেকে কীর্তন চলেছে। কীর্তনীয়ারা গাইছেন—

'কহিতে কহিতে প্রভুভক্তে চরিত।
গাদিগাছা গ্রামেতে হইলা উপনীত॥
ঈশান কহয়ে—এই গাদিগাছা গ্রাম।
বিজ্ঞে কহে পূর্বে এর গোদ্রুমদ্বীপ নাম॥'

আমরা সীমন্তদ্বীপ থেকে গোদ্রুমদ্বীপে এসেছি। কীর্তনীয়ারা তাই ভক্তিরত্নাকর থেকে গোদ্রুমদ্বীপের কথা কীর্তন করছেন। তাঁরা গাইছেন—

'কহিতে কি জানি চেষ্টা, ওহে শ্রীনিবাস।
এইখানে হৈল মহাপ্রেমের প্রকাশ॥
এথা ছিল অশ্বত্থবৃক্ষ উচ্চতর।
অতি বিস্তারিত বৃক্ষ শোভা মনোহর॥

শ্রীসুরভি গাভী দ্রুমতলে বিলসয়।
এ হেতু গোদ্রুমদ্বীপ পূর্ববিজ্ঞ কয়॥'

ঈশান শ্রীনিবাসকে বললেন—এখানে একটি উঁচু অশ্বত্থগাছ ছিল তার তলায় দেবরাজ ইন্দ্রের কামধেনু সুরভি বিচরণ করত, তাই অঞ্চলের নাম গোদ্রুমদ্বীপ। আমরাও এখন সংকীর্তন সহযোগে সেই গোদ্রুমদ্বীপে পদপরিক্রমা করছি। কিন্তু অশ্বত্থগাছ কিংবা সুরভি গাভী নয়, কীর্তন শুনতে শুনতে আমার বার বার মনে পড়ছে শ্রীনিবাসাচার্য শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীল রামচন্দ্র কবিরাজের কথা। তাঁরাই প্রথম শচীমাতার সেবক ঈশানের সঙ্গে গৌড়মণ্ডল পরিক্রমা করেছেন। শুধু সেই পরিক্রমা নয়, নানা কারণেই তাঁদের, বিশেষ করে শ্রীনিবাসাচার্যের নাম গৌড়ীয়বৈষ্ণব ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে আছে। আমি মনে মনে তাঁর কথাই ভেবে চলি—

শ্রীনিবাসের পিতার নাম গঙ্গাধর, মাতা লক্ষ্মীপ্রিয়া। গঙ্গাধর কাটোয়ার কাছে চাকন্দি গ্রামে বাস করতেন। তিনি ছিলেন মহাপ্রভুর পরমভক্ত। তাঁরই আশীর্বাদে অপুত্রক গঙ্গাধর পুত্রলাভ করেন। বৈশাখী পূর্ণিমায় শ্রীনিবাসের জন্ম হয়।

যথাসময়ে শ্রীনিবাস ধনঞ্জয় বাচস্পতির টোলে ভর্তি হলেন। শৈশব থেকেই তিনি মহাপ্রভুর ভক্ত। কৈশোরে তাঁর পিতৃবিয়োগ হল।

গঙ্গাধরের অকালমৃত্যুর পরে অসহায় লক্ষ্মীপ্রিয়া পুত্রকে নিয়ে যাজিগ্রামে পিত্রালয়ে চলে এলেন। সেখানেই শ্রীনিবাস একদিন প্রখ্যাত পণ্ডিত ও সিদ্ধপুরুষ নরহরি সরকার ঠাকুরের কাছে হরিনাম গ্রহণ করলেন। আর তারপরেই কিশোর শ্রীনিবাস মহাপ্রভুর চরণ দর্শনের জন্য অস্থির হয়ে উঠলেন। বাধ্য হয়ে মা তাঁকে নীলাচলে যাবার অনুমতি দিলেন। শ্রীনিবাস পুরীর পথে রওনা হলেন।

পথে একদিন শুনতে পেলেন মহাপ্রভু অপ্রকট হয়েছেন। শ্রীনিবাস খুবই ভেঙে পড়লেন। ভাবলেন—আর নীলাচলে গিয়ে কি হবে? কিন্তু রাতে স্বপ্ন দেখলেন—শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁকে নীলাচলেই যেতে আদেশ করছেন।

শ্রীনিবাস পুরীতে পৌঁছলেন। প্রণাম করতে পারলেন শ্রীগদাধর, রায় রামানন্দ, শ্রীসার্বভৌম ও গোপীনাথ আচার্য প্রভৃতি প্রভুর পার্ষদগণকে। তবে দেখা হল না শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামীর সঙ্গে। মহাপ্রভুর বিরহে বিবাগী হয়ে তিনি তখন বৃন্দাবনের পথে।

শ্রীনিবাস গদাধরের কাছে ভাগবত পড়তে চাইলেন। গদাধর বললেন—

তোমার মতো মেধাবী বালককে পড়াতে পারলে আমি খুশিই হব। কিন্তু আমার পুথিখানি বড়ই জীর্ণ হয়ে গিয়েছে। তুমি বরং দেশে গিয়ে সরকার ঠাকুরের কাছ থেকে আরেকখানি ভাগবত নিয়ে এসো।

শ্রীনিবাস পুরী থেকে যাজিগ্রামে ফিরে এলেন! নরহরি সরকার ঠাকুরের কাছ থেকে একখানি ভাগবত নিয়ে মাকে প্রণাম করে আবার পুরী রওনা হলেন। কিন্তু কয়েকদিন পথচলার পরে একদিন খবর পেলেন, শ্রীগদাধর মহাপ্রয়াণ লাভ করেছেন।

বালক শ্রীনিবাস খুবই ভেঙে পড়লেন। কি করবেন, কোথায় যাবেন? এমন সময় একদিন প্রেমাবতার শ্রী:চৈতন্য তাঁকে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে সান্ত্বনা দান করলেন। বললেন—তুমি নবদ্বীপ দর্শন করে বৃন্দাবনে চলে যাও।

শ্রীনিবাস শ্রীধাম নবদ্বীপে ছুটে এলেন। কিন্তু এসেই খবর পেলেন শচীমাতা নেই আর বিষ্ণুপ্রিয়া পতিবিরহে আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছেন।

তিনি শ্রীনিবাসকে আশীর্বাদ করলেন। শ্রীনিবাস শান্তিপুর ও খড়দহে গিয়ে অদ্বৈতাচার্যের পত্নী শান্তিদেবী ও শ্রীনিত্যানন্দের স্ত্রী জাহ্নবামাতাকে প্রণাম করলেন। তারপরে খানাকুলে গিয়ে অভিরাম ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করলেন। তিনি তাঁর জয়মঙ্গল চাবুক দিয়ে তিনবার আঘাত করে শ্রীনিবাসের মধ্যে প্রেমশক্তি জাগ্রত করে দিলেন।

খানাকুল থেকে শ্রীনিবাস আবার বাড়ি ফিরে গেলেন। দুঃখিনী মা কেঁদেকেটে সারা হলেন। কিন্তু চৈতন্যপ্রেমে পাগল ছেলের মন ভিজল না। মাকে প্রণাম করে শ্রীনিবাস আবার ঘর ছাড়লেন। গয়া কাশী অযোধ্যা প্রয়াগ ও মথুরা দর্শন করে বৃন্দাবনে পৌঁছলেন। কিন্তু সেখানেও তাঁর জন্য দুঃসংবাদ অপেক্ষা করছিল। শুনতে পেলেন শ্রীরূপ-সনাতন ও রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী মর্ত্যলীলা সংবরণ করেছেন। পথশ্রমে ক্লান্ত তরুণ তাপস খুবই মর্মাহত হয়ে পড়লেন।

কিন্তু রাতে স্বপ্ন দেখলেন শ্রীরূপ-সনাতন সান্ত্বনা দান করছেন। বলছেন—তুমি গোপাল ভট্ট গোস্বামীর কাছে দীক্ষা নিয়ে গৌড়মণ্ডলে শ্রী:চৈতন্যের ধর্ম ও আমাদের গ্রন্থ প্রচার করো।

পরদিন সকালেই তিনি ছুটে গেলেন শ্রীজীব গোস্বামীর কাছে। তিনি সস্নেহে তাঁকে 'বন্ধু' বলে বুকে টেনে নিলেন। তারপরে একদিন তাঁরই সামনে রাধারমণ-প্রাণ শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী শ্রীনিবাসকে মন্ত্রদীক্ষিত করলেন।

শুরু হল শ্রীনিবাসের শাস্ত্রসাধনা। শ্রীজীব ও অন্যান্য শাস্ত্রজ্ঞদের সাহায্যে মেধাবী শ্রীনিবাস কিছুকালের মধ্যেই সুপণ্ডিত হয়ে উঠলেন। শ্রীজীব সভা ডেকে তাঁকে 'আচার্য' উপাধি দান করলেন।

তারপরে বন্ধুত্ব হল শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের সঙ্গে। দুজনে ব্রজ পরিক্রমা করলেন। কবি নরহরি চক্রবর্তী ভক্তিরত্নাকরের পঞ্চম তরঙ্গে এই পরিক্রমার কথা বর্ণনা করেছেন।

তারপরে শ্রীনিবাসের বন্ধুত্ব হল শ্রীশ্যামানন্দের সঙ্গে। স্থির হল তাঁরা তিনজন গোস্বামীদের রচিত গ্রন্থরত্ন বৃন্দাবন থেকে নবদ্বীপে নিয়ে আসবেন।

দুটি বড় কাঠের সিন্দুকে গ্রন্থগুলি ভরে নিয়ে দুখানি গরুর গাড়ি রওনা হল নবদ্বীপের পথে। দশজন রক্ষীর সঙ্গে তাঁরা তিনজন পেছন পেছন পথ চলেন। বনবিষ্ণুপুরে পৌঁছবার পরে সিন্দুকদুটি লুঠ হল। হবারই কথা কারণ দস্যুরা শুনতে পেয়েছিল ঐ সিন্দুকে গ্রন্থরত্ন রয়েছে। গ্রন্থরত্ন নামে কোনো রত্নের নাম তারা তার আগে শোনে নি, তবে গ্রন্থরত্ন যে মূল্যবান রত্ন এ সম্পর্কে তাদের কোনো সন্দেহ ছিল না। তারা ভাবল তাদের দস্যুরাজা বীর হাম্বীর এই রত্ন পেয়ে খুবই খুশি হবেন।

লুঠ হবার পরে নরোত্তম ও শ্যামানন্দকে অন্যত্র পাঠিয়ে দিয়ে শ্রীনিবাস বিষ্ণুপুরেই রয়ে গেলেন। তিনি গ্রন্থরত্নের খোঁজ করতে থাকলেন। কিছুদিন পরে তিনি খবর পেলেন, রাজার দলের দস্যুরাই গ্রন্থের সিন্দুক লুঠ করেছে।

সেদিনই শ্রীনিবাস রাজসভায় এলেন। দেখলেন রাজপণ্ডিত ভাগবত পাঠ করছেন। বুঝতে পারলেন দস্যু হলেও রাজা বৈষ্ণব। শ্রীনিবাস রাজপণ্ডিতের সঙ্গে ভাগবত পাঠ নিয়ে তর্ক জুড়ে দিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁকে সম্পূর্ণ পরাজিত করলেন। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে বীর হাম্বীরের হৃদয় পূর্ণ হয়ে উঠল। তিনি শ্রীনিবাসের চরণে আত্মসমর্পণ করলেন। গ্রন্থরত্ন উদ্ধার হল।

শ্রীনিবাস বিষ্ণুপুর থেকে নবদ্বীপ রওনা হলেন। পথে মায়ের সঙ্গে দেখা করলেন। তাঁর কাছেই শুনতে পেলেন—মা-বিষ্ণুপ্রিয়া দেহরক্ষা করেছেন।

শ্রীনিবাস আবার শোকাহত হলেন। তবু কর্তব্য সম্পাদনের জন্য তাঁকে গ্রহরত্ন নিয়ে নবদ্বীপে আসতে হল। তারপরে আবার ফিরে গেলেন মায়ের কাছে। পরিব্রাজক পণ্ডিত শেষ পর্যন্ত ঘরের মায়ায় পড়ে গেলেন। মায়ের আদেশে যাজিগ্রামের গোপাল চক্রবর্তীর মেয়ে দ্রৌপদীকে বিয়ে করলেন। বিয়ের পরে শ্রীনিবাস আদর করে স্ত্রীর নাম রাখলেন ঈশ্বরী।

সংসারী শ্রীনিবাস সুখেই ছিলেন। কারণ কিছুদিনের মধ্যে তাঁর

পাণ্ডিত্যের খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যাঁর হৃদয়ে চেতনার সঞ্চার করেছেন, তাঁর পক্ষে কি ঘরে বসে থাকা সম্ভব? তিনি আবার বৃন্দাবন রওনা হলেন।

কিছুকাল ব্রজে বাস করে আবার কিছু গ্রন্থ নিয়ে নবদ্বীপ রওনা হলেন। পথে কয়েকদিন বিষ্ণুপুরে কাটালেন। তারপরে নরোত্তম ঠাকুর ও রামচন্দ্র কবিরাজের সঙ্গে নবদ্বীপ এলেন। শচী-বিষ্ণুপ্রিয়ার সেবক বৃদ্ধ ঈশান তখনও বেঁচে ছিলেন। শ্রীনিবাস তাঁর কাছে গৌড়মণ্ডল পরিক্রমা করার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন। বৃদ্ধ ঈশান সানন্দে তাঁদের সঙ্গী হলেন। কবি নরহরি ভক্তিরত্নাকরের দ্বাদশ তরঙ্গে সেই পরিক্রমার কথাই বর্ণনা করেছেন। এটি ইতিহাসের প্রথম গৌড় পরিক্রমা। চার শ' বছর ধরে সংখ্যাতীত ভক্তদল সেই পরিক্রমাকে স্মরণ করে গৌড়মণ্ডল পরিক্রমা করে চলেছেন। আমরাও তাই করছি।

তারপরে শ্রীনিবাস বাংলাসহ সমগ্র পূর্বভারতে শ্রীচৈতন্যের ধর্ম ও আদর্শ প্রচারে ব্রতী হলেন। এবং প্রধানতঃ তাঁরই প্রচেষ্টায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম পূর্বভারতে জনপ্রিয় হয়ে উঠল। এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর 'গৌরাঙ্গ পরিজন' গ্রন্থে বলেছেন, 'মহাপ্রভুর প্রেমশক্তি শ্রীনিবাসে অবতীর্ণ, তাঁরই প্রভাবে বৈষ্ণবধর্ম নবজীবনে প্রাণান্বিত হয়ে সমস্ত বাংলাকে পরিপ্লাবিত করল।'

অবশেষে শ্রান্তিহীন প্রচারকের দেহ ও মনে একদিন ক্লান্তি দেখা দিল। তখন তাঁর বয়স সাতের ঘরে। পরিব্রাজক পণ্ডিত বুঝতে পারলেন তাঁর বিশ্রামের সময় সমাগত। তাই তিনি তাড়াতাড়ি রামচন্দ্রকে নিয়ে শেষবারের মতো বৃন্দাবনে চলে গেলেন। সেখানেই এক কার্তিকী শুক্লাষ্টমীতে শ্রীনিবাস মর্ত্যলীলা সংবরণ করলেন।

"চরশম্ভুনগর।"

জনৈক সহযাত্রী সহসা বলে ওঠেন। আমার ভাবনা থেমে যায়। ভক্তি-রত্নাকর শুনতে শুনতে আমি শ্রীনিবাসাচার্যের কথা ভাবতে শুরু করেছিলাম। সহযাত্রীর কথায় বাস্তবে ফিরে আসি। শতাধিক সহযাত্রীর সঙ্গে আমি আর মানসীও গৌড়মণ্ডল পরিক্রমা করছি। আজ আমাদের পরিক্রমার তৃতীয় দিন। আমরা এখন গোদ্রুমদ্বীপে এসেছি। চরশম্ভুনগর গ্রামের ভেতর দিয়ে পথ চলেছি। তাই সহযাত্রী অমন করে চেঁচিয়ে উঠলেন।

বেশ বড় গ্রাম। বহু বাড়ি-ঘর। এটা কৃষ্ণনগর থানা। গ্রামের নারী-

পুরুষ ও বালক-বালিকারা কীর্তনের শব্দ শুনে ছুটে এসেছে। কেউ পথের পাশে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে আছে, আবার কেউ বা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে প্রণাম করছে। অনেকেই ঠাকুরের থালায় পয়সা দিচ্ছে।

প্রভুপাদ বলেন, "এঁরা কিন্তু অনেকেই বৈষ্ণব নন, এমনকি বাঙালী পর্যন্ত নন।"

"তাহলে!" মনেসী জিজ্ঞেস করে।

"উত্তরপ্রদেশের লোক। কয়েক পুরুষ আগে এখানে এসেছে, আর দেশে ফিরে যায় নি।"

"হ্যাঁ। তবে আখের চাষ। সেই সঙ্গে গুড় তৈরি। গুড়ের ব্যবসাই এদের জীবিকা।"

আমরা কেউ আর কোনো প্রশ্ন করি না। গ্রাম আর গ্রামের মানুষ দেখতে দেখতে এগিয়ে চলি। সেই মাটির ধূলিময় পথ। কিছুক্ষণ আগে আমাদের গরুর গাড়ি গিয়েছে। তাদের চাকার দাগ এতক্ষণ অক্ষত ছিল। পথের ধুলোয় একজোড়া গর্তের রেখা। এখন আমাদের পায়ে পায়ে মুছে যাচ্ছে।

গ্রামের বাড়ি-ঘরের অবস্থা কিন্তু পথের মতো রিক্ত নয়। অধিকাংশ বাড়িতে টিনের চাল। বেশ কয়েকটি পাকা ঘরও দেখতে পাচ্ছি।

কানু বলে, "গুড়ের হাটে চরশভুনগরের বেশ নাম আছে। অবস্থাপন্ন গ্রাম। অধিবাসীদের প্রায় এক-তৃতীয়াংশই উত্তরপ্রদেশের মানুষ। তবে এখন তাঁরা বাঙালী হয়ে গিয়েছেন। নিজেরাও বাংলাতে কথাবার্তা বলেন।"

কানু আমাদের পরিক্রমার একজন প্রধান স্বেচ্ছাসেবক। সুদর্শন যুবক। নবদ্বীপের ছেলে বয়স বছর পঁচিশ। চাকরি করে, বিয়ে করেছে। ছুটি নিয়ে বউকে বাড়ি রেখে আমাদের সঙ্গী হয়েছে। শুধু তাই নয়, এই পরিক্রমার আয়োজন করার জন্য বেশ কিছুদিন থেকেই সে ক্রমাগত ছুটোছুটি করেছে। তাকে আমাদের পরিক্রমার 'লিয়েজন্' (Liaison) অফিসার। প্রভুপাদের চিঠি নিয়ে সাইকেলে চড়ে বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে মোড়লদের সঙ্গে দেখা করে সে আমাদের থাকা-খাওয়ার জায়গা ঠিক করেছে। সুতরাং এসব গ্রাম সম্পর্কে কানুর ধারণা খুবই সুস্পষ্ট।

"বাকি দুই-তৃতীয়াংশ কি বাঙালী?" কৃষ্ণা প্রশ্ন করে।

কানু উত্তর দেয়, "হ্যাঁ। সব মিলিয়ে প্রায় সাড়ে সাত শ' ঘর বাসিন্দা। জনসংখ্যা প্রায় হাজার পাঁচেকের মতো। এঁদের এক-তৃতীয়াংশ উত্তরপ্রদেশের মানুষ এবং তাঁরাই অবস্থাপন্ন।"

গ্রামের বাড়ি-ঘর কমে এলো। এখন ক্ষেতই বেশি, আখের ক্ষেত। আমরা দেখতে দেখতে পথ চলেছি। সহসা মানসী প্রশ্ন করে, "আচ্ছা, এ গ্রামে বেশ কয়েকটা কামারশালা দেখতে পেলাম, কিন্তু অন্য কোনো দোকান দেখলাম না তো?"

"চাষীদের গ্রাম তাই চাষের যন্ত্রপাতি মেরামতের জন্য কামারশালা দরকার।" কানু উত্তর দেয়। বলে, "দোকান নেই কারণ সামনে বড় বাজার আছে।"

"বড় বাজার!" মানসী উল্লসিতা।

"আজ্ঞে হ্যাঁ। সুবর্ণবিহারে।"

"সেখানে চায়ের দোকান পাওয়া যাবে?"

"নিশ্চয়ই। আজ সকালে চা পান নি তো!" কানুর কণ্ঠে সহানুভূতি।

"আমি চা খাই না।" মানসী উত্তর দেয়।

"তাহলে?"

"এমনি জিজ্ঞেস করলাম। আমাদের দলে অনেকেই তো চা না পেয়ে কষ্ট পাচ্ছেন, তাই।"

কানু মানসীর কথা বিশ্বাস করল কিনা বুঝতে পারছি না। তবে সে এ প্রসঙ্গে আর কোনো প্রশ্ন করে না। আমিও নীরব থাকি। চলতে চলতে ভাবি—আচ্ছা, মানসী কেন এই পরিক্রমায় এসেছে? গৌরসুন্দরের লীলাভূমি দর্শন করতে কি, আমার সুখ-সুবিধার দিকে নজর দিতে?

চরশম্ভুনগর পড়ে রয়েছে পেছনে, আমরা এগিয়ে এসেছি সামনে। এখন পথের পাশে শুধুই ক্ষেত, নেই কোন বাড়ি-ঘর, নেই বড় গাছ। মাথার ওপরে সূর্য, প্রখর রোদ। শীতকাল হলেও গরম লাগছে। তার ওপরে মাটির পথ। কীর্তনীয়ারা নাচতে নাচতে পথ চলেছেন। ধুলো উড়ছে। চোখে-মুখে ঢুকছে। পিপাসা পেয়েছে। হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু কেউ সে-কথা বলছেন না। সবাই সানন্দে সংকীর্তন সহযোগে পথ চলেছেন, গৌড়মণ্ডলের আনন্দময় পথ।

পথ চলেছেন আগরতলার সেই অন্ধ বৃদ্ধ, পথ চলছেন কলকাতার আশ্রম-মাতা, চলছেন মালদহের তর্কতীর্থ মশায়। তাঁরা পেছিয়ে পড়লেও সঙ্গীদের সঙ্গে সমানে পথ চলছেন।

মনে মনে তর্কতীর্থ মশায়ের কথা ভেবে চলি। ক্ষীণ দেহ, মধ্যবিত্ত মানুষ। ভারী শান্ত ও বিনয়ী। মালদহে থাকেন, পেশায় কবিরাজ। পুরো নাম অমরেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ। তবে মালদহে তিনি কালু কবিরাজ নামেই পরিচিত।

বলা বাহুল্য গায়ের রংটি কালো। বয়স বছর পঁয়ষট্টি। অপরের স্বাস্থ্যরক্ষা তাঁর পেশা হলেও নিজের স্বাস্থ্যটি ভাল নয়। তাই প্রভুপাদ তাঁকে পরিক্রমায় আসতে নিষেধ করেছিলেন।

শুনে তিনি কেঁদে ফেলেছেন। প্রভুর পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলেছেন, "বাবা, আপনি আমার গুরুদেব। আমি আপনার সঙ্গে পরিক্রমা করব, আমার কি কোনো অমঙ্গল হতে পারে? আপনি আমাকে কৃপা করলে আমি নির্বিঘ্নে পরিক্রমা পূর্ণ করতে পারব।"

'সুবর্ণবিহার ওই দেখ শ্রীনিবাস।
কহি পশ্চাৎ এই গ্রামে যে বিলাস॥…'

কীর্তনীয়াদের কথায় আমার ভাবনা থেমে যায়। তাকিয়ে দেখি, আমরা আবার একটা গ্রামের প্রান্তে উপনীত হয়েছি। পথের পাশে বাড়ি-ঘর আর গাছপালা। আবার ছায়াশীতল পথ। হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।

কীর্তনীয়ারা ভক্তিরত্নাকর থেকে কীর্তন করে চলেছেন। দূর থেকে যে গ্রাম দেখিয়ে ঈশান শ্রীনিবাস এই কথা বলেছিলেন, আমরা এখন সেই সুবর্ণ-বিহার গ্রামে উপনীত হয়েছি। এখানে এসে ঈশান শ্রীনিবাসকে একটা কাহিনী বলেন। কাহিনীটি এই রকম—নারদমুনির জনৈক শিষ্য এখানে এসে স্থানীয় রাজাকে জানালেন, নবদ্বীপে শ্রীগৌরসুন্দর আবির্ভূত হবেন। কথাটা শোনার পরেই রাজা আনমনা হয়ে পড়লেন। তিনি কেবলি গৌরসুন্দরের কথা ভাবতে থাকলেন। রাতে স্বপ্ন দেখলেন, শ্যামসুন্দর তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন। তারপরে শ্যামসুন্দরের কালো রঙ ক্রমে সুবর্ণ বর্ণ ধারণ করল। শ্রদ্ধায় ও পুলকে রাজা অভিভূত হয়ে পড়লেন।

কবি নরহরি বলেছেন, এই পুণ্যস্থান শ্যামসুন্দরের সুবর্ণ বিগ্রহের বিলাসভূমি বলে, এর নাম সুবর্ণবিহার। আমরা এখন সেই পুণ্যভূমিতে পদচারণা করছি।

দুখানি সাইকেলে চড়ে তিনটি তরুণ এদিকেই আসছিল। তারা সাইকেল থেকে নেমে পথের পাশে দাঁড়ায়। একটু বাদে একটি ছেলে আমার কাছে এগিয়ে আসে। বলে, "একটা কথা জিজ্ঞেস করব?"

"নিশ্চয়ই।" আমি তাকে ভরসা দিই।

সে বলে, "আচ্ছা, আপনারা কোন্ বইয়ের শুটিং করছেন?"

"শুটিং!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, সিনেমা শুটিং।"

"আমরা সিনেমার শুটিং করছি!" কানু হাসতে হাসতে বলে।

ছেলেটিও একটু হাসে। তারপরে গম্ভীর স্বরে বলে, "দেখুন, আপনারা যতই গোপন রাখার চেষ্টা করুন, খবরটা কিন্তু রটে গেছে।"

রটে যখন গেছে, তখন আমাদের আর কি করার থাকতে পারে? কথায় বলে, যা রটে তার কিছু বটে। কিন্তু এখানে যে সবটাই গুজব। কি জানি, আজকাল বোধহয় নির্ভেজাল গুজব বেশি রটে।

অতএব আর কোনো কথা না বলে একটু মুচকি হেসে এগিয়ে চলি। ছেলেটিও বীরদর্পে বন্ধুদের কাছে ফিরে যায়। আমাদের শুনিয়ে শুনিয়ে তাদের বলে, "দেখলি তো কি রকম 'কট্' করলাম। আরে বাব্বা, আমরা স্বর্ণবিহারের ছেলে, আমাদের কাছে থাপ খুলতে হবে না।"

সুতরাং থাপ বন্ধ রেখেই স্বর্ণবিহারের পথে এগিয়ে চলি। পথের অবস্থা যা-ই হোক, মাঝে মাঝেই পাকাবাড়ি। বিদ্যুতও এসে গেছে। বেশ বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। প্রায় চোদ্দ শ' পরিবারের বাস, জনসংখ্যা সাত হাজারের মতো। তবে একটা মজার ব্যাপার, এই গ্রামে পুরুষের চেয়ে নারীর সংখ্যা বেশি। পথের পাশে প্রতীক্ষারত জনতার সারিতেও মেয়েদের সংখ্যাই বেশি। এরাও তেমনি হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে আছে অথবা মাটিতে লুটিয়ে প্রণাম করছে। এবং এদের আচরণ দেখে মোটেই মনে হচ্ছে না যে সিনেমা শুটিংয়ের গুজবটা খুব একটা বেশি রটেছে।

বেলা সওয়া বারোটা নাগাদ আমরা বড় রাস্তায় পৌঁছলাম। সামনেই বাজার, বহু দোকানপাট। এবং বলা বাহুল্য গুটিকয়েক চায়ের দোকান রয়েছে। আমার কয়েকজন সহযাত্রী আর নিজেদের সংযত রাখতে পারেন না। প্রভুপাদের অনুমতি নিয়ে তাঁরা শোভাযাত্রা থেকে কেটে পড়েন।

মানসী এগিয়ে আসে আমার কাছে। বলে, "চলো, তুমিও চা খেয়ে আসবে।"

"কিন্তু আমার কোনো অসুবিধে হচ্ছে না। চা না খেলেও চলত।"

"না, না, নির্ঘাৎ মাথা ধরবে। বাবাকে বলে চলো আমার সঙ্গে।"

"তুমি তো চা খাবে না, তুমি শোভাযাত্রার সঙ্গে এগিয়ে যাও।"

"না, আমি তোমার সঙ্গে পেছিয়ে থাকব। তুমি বাবাকে বলে এসো!"

আর কথা না বাড়িয়ে প্রভুপাদের কাছে আসি। তিনি অনুমতি দান করে বলেন, "আমরা আজ গৌরাঙ্গনগরে রাত্রিবাস করব। জায়গাটা এই স্বর্ণবিহার এলাকায় একটা বাস্তুত্যাগী কলোণী। বড় রাস্তা ধরে বাঁদিকে খানিকটা এগিয়ে ডানদিকে গৌরাঙ্গনগরের পথ। এখান থেকে আধ মাইলের

মতো। তোমরা চা খেয়ে সেখানে চলে এসো।"

প্রভুপাদকে প্রণাম করে আমি ও মানসী বেরিয়ে আসি শোভাযাত্রা থেকে। আমরা একটা চায়ের দোকানে এসে ঢুকি। মানসী জিজ্ঞেস করে, "চায়ের সঙ্গে কি খাবে?"

"আর কিছু নয়, শুধু চা। এই তো চিঁড়ে খেয়ে এলাম।"

"এই তো কি বলছ? সে তো সেই কখন!"

হাসি পায় আমার। হাসতে হাসতে বলি, "তাতো বটেই, প্রায় দু-ঘণ্টা হতে চলল। কিন্তু এতো খিদে পেলে যে গৌড়পরিক্রমা শিকেয় উঠবে।"

"ওমা তা কেন? এখানে দোকান আছে বলেই খেতে বলছি। দেখছ না কতরকমের মিষ্টি রয়েছে।"

"তুমি খাবে?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"না, না, এখন আমি কি খাবো? তুমি একটু মিষ্টি খেয়ে নাও।"

এবারে তার কণ্ঠস্বর শুনে আর কথা বাড়াতে সাহস পাই না। সুবোধ বালকের মতো মিষ্টি ও চা খেয়ে বেরিয়ে আসি দোকান থেকে।

বড় রাস্তায় আসি—পিচ্‌ঢালা পথ। নবদ্বীপ-কৃষ্ণনগর রোড। এখান থেকে কৃষ্ণনগর মাত্র মাইল তিনেক। নিয়মিত বাস চলাচল করে। আর চলে রেলগাড়ি—'ন্যারো গেজ' রেল। বাস পথের পাশে পাশে রেলপথ। শান্তিপুর থেকে কৃষ্ণনগর হয়ে নবদ্বীপধাম।

আমরা এখন সেই পথে এগিয়ে চলেছি। চলতে চলতে মানসী বলে, "এবারে আমরা হাওড়া হয়ে কলকাতায় ফিরব না।"

"তাহলে?"

"কৃষ্ণনগর হয়ে ফিরব।"

"কেন বল তো?"

"এই রেলে চড়ে কৃষ্ণনগর যাবো, অনেকদিন ছোট রেলে চড়ি না।" "ছোট মেয়ের মতই আবদার তার গলায়। কে বলবে কিছুক্ষণ আগেই ওর কণ্ঠস্বর শুনে আমি মিষ্টি গিলে ওর মন রক্ষা করেছি। তবে এবারেও আমি ওর মন রক্ষা করি। বলি, "বেশ তো তাই যাওয়া যাবে।"

আগেই বলেছি পিচ্‌পথে পদযাত্রা অচল। পায়ে পাথরকুচি ফোটে। সুতরাং সহজে পথ চলা যাচ্ছে না।

তবে বেশিক্ষণ এপথে পদচারণা করতে হল না। কয়েক মিনিট বাদেই ডানদিকে গৌরাঙ্গনগরের পথ পাওয়া গেল। মাটির ধূলিময় পথ। ধুলো

উড়লেও খালিপায়ে চলতে ভালই লাগছে। এখন শীতকাল, তাই এমন মনে হচ্ছে। বর্ষাকালে এপথ অগম্য হয়ে ওঠে। আশ্চর্য, এতগুলো পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষ হল, পথের উন্নয়নের জন্য এতো বিদেশী সাহায্য পাওয়া গেল, অথচ জেলাসদর থেকে মাত্র তিনমাইল দূরেও এমন পথ রয়ে গেল!

কিন্তু আমার এসব ভাবনায় প্রয়োজন কি? আমি তো এখানে বারো মাস থাকতে আসি নি। আমি এখানে একটি রাত কাটাতে এসেছি এবং এখন শীতকাল। সুতরাং গৌরাঙ্গনগরবাসীদের ভাবনাকে শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীচরণে সমর্পণ করে আমি মানসীর সঙ্গে গৌরাঙ্গনগরে এসে পৌঁছই। আর সেই সঙ্গে শেষ হয় আজকের পথ-পরিক্রমা।

॥ নয় ॥

মাইকম্যান চন্দ্রা তার কাজ গুছিয়ে নিতে সময় বেশি লাগায় নি। যথারীতি সে কোনো ঘরের চালে লাউড-স্পীকার বসিয়ে টেপ-রেকর্ডারে প্রভুপাদের গান বাজানো শুরু করে দিয়েছে। ফলে দূর থেকেই শিবিরের অবস্থান বুঝতে পেরেছি।

বড়রাস্তা ছেড়ে মাটির ধুলিময় পথ পেরিয়ে আমরা গৌরাঙ্গনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে এসে উপস্থিত হলাম। আমরা মানে কেবল আমি আর মানসী নই, চায়ের নেশা মেটাতে যারা পেছিয়ে পড়েছিলাম তারা সবাই।

বিদ্যালয় ভবনটি টিনের একখানি বড় চৌচালা ঘর। দুদিকে খোলা বারান্দা। ইটের দেওয়াল, বাঁধানো মেঝে। আজ বিদ্যালয় খোলা থাকার কথা। কিন্তু আমরা আসব বলে ছুটি দেওয়া হয়েছে।

বলা বাহুল্য আমার সহযাত্রীরা ঘরখানির দখল নিয়ে নিয়েছেন। বারান্দার একাংশ রান্নাঘরে রূপান্তরিত। অপরাংশ ডাইনিং হলের কাজ করবে। রাতে কিছু লোক বিছানাও পাততে পারবেন। তবে ঘর এবং বারান্দায় বোধ করি অর্ধেক যাত্রীরও ঠাঁই হবে না। বাকি যাত্রীদের বাড়ি-বাড়ি আশ্রয় ভিক্ষে করতে হবে। অনেকে বোধহয় বেরিয়েই পড়েছেন। মতি কৃষ্ণা রতন দত্তবাবু কাশীনাথ কাউকেই এখানে দেখছি না। কেবল গৌরদা ও কানু রয়েছে। তারা মন্দির ও রান্নার তদারকি করছে।

এখানেও মন্দির হয়েছে। মন্দিরকেই মন্দির করা হয়েছে। বিদ্যালয়ের সামনে একফালি মাঠ। মাঠের পরে পথ। পথের পাশে বারোয়ারীতলার মন্দির। আকারে নেহাৎ ছোট নয়। টিনের চাল, মাটির মেঝে—পথ থেকে অনেকটা উঁচু। তিনদিকে ইটের দেওয়াল, সামনের দিকটা খোলা। মন্দিরের মাঝখানে লালরঙের বাঁধানো বেদি। তারই ওপরে ঠাকুরের সিংহাসন স্থাপিত করা হয়েছে। প্রভুপাদ এখানেই বসে আছেন।

আমরা তাঁর কাছে এসে দাঁড়াই। একটু হেসে তিনি মানসীকে জিজ্ঞেস করেন, "কি মা, খুব কষ্ট হচ্ছে কি?"

"না বাবা! কষ্ট হবে কেন? আপনার আশীর্বাদে বড় আনন্দে আছি।" মানসী উত্তর দেয়।

প্রভুপাদ বলেন, "তাই থেকো মা! আনন্দে থেকো। আমি জানি তোমরা শহরের মানুষ, তোমাদের কষ্ট হবেই। কিন্তু যদি আনন্দে থাকতে পারো, তাহলে আর কষ্টকে কষ্ট মনে হবে না।"

একবার থামেন তিনি। তারপরে আবার বলেন, "এই মন্দিরের পেছনের বাড়িতেই টিউব্‌ওয়েল আছে। সেখান থেকে হাত-পা ধুয়ে এসে এখানে একটু বিশ্রাম করে নাও। তোমাদের আর আশ্রয় ভিক্ষে করতে যেতে হবে না। ওরা তোমাদের জায়গা ঠিক করে আসবে। প্রসাদও প্রায় হয়ে এলো।"

"এটা কি একটা রেফিউজি কলোনী?" প্রভুপাদ থামতেই মানসী জিজ্ঞেস করে।

তিনি ঘাড় নেড়ে বলেন, "তুমি ঠিকই অনুমান করেছো মা! এই গৌরাঙ্গ-নগর পূর্ববঙ্গের বাস্তত্যাগীদের উপনিবেশ। এরা সবাই সর্বস্বান্ত হয়ে পালিয়ে এসেছিলেন। বহু কষ্ট করে এখানে বাড়ি-ঘর করেছেন। এঁরা আমাকে খুবই ভালোবাসেন। তাই আমি স্বর্গবিহারে না থেকে এখানে চলে এসেছি।"

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রভুপাদের কথার সত্যতা বুঝতে পারি। কয়েকজন ভদ্রমহিলা থালায় থালায় চাল-ডাল তরিতরকারী ফল ও মিষ্টি এনে প্রভুপাদের সামনে রাখেন। তাঁকে প্রণাম করে বলেন, "আমরা আপনাদের জন্য সামান্য সিধে এনেছি বাবা, কাউকে তুলে রাখতে বলুন।"

সামান্য দান কিন্তু অসামান্য প্রীতির উপচার। প্রভুর মতো আমরাও আনন্দিত হয়ে উঠি।

কিন্তু আজ আমাদের জন্য আরও আনন্দ জমা ছিল। ভদ্রমহিলারা চলে যেতেই কয়েকটি তরুণ এসে উপস্থিত হয়। তারা বলে, "বাবা, আপনাকে কিন্তু আমাদের ক্লাবে একবার পায়ের ধুলো দিতে হবে।"

"ক্লাব!" প্রভুপাদ বুঝতে পারেন না তাদের কথা। জিজ্ঞেস করেন, "কোন্ ক্লাব?"

"ঐ যে নেতাজী ক্লাব বাবা।" একটি ছেলে ইসারা করে। আমরা দেখতে পাই। স্কুল মাঠের আরেকপাশে ছোট একখানি ঘর—টালি আর বেড়ার ঘর। তারই সামনে সাইনবোর্ড—'নেতাজী ক্লাব। সমাজসেবী সংঘ, গৌরাঙ্গনগর।'

"বেশ যাবো।" প্রভুপাদ তাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। বলেন, "যখন নিয়ে যাবি, তখুনি যাবো।"

"আরেকটা কথা বাবা!"

প্রভুপাদ অনুমতি দেন, "বেশ বল্।"

ছেলেটি বলে, "আমাদের ক্লাবঘরে একখানা বেশ বড় তক্তপোশ রয়েছে। আছে চেয়ার টেবল আর বইয়ের আলমারী। তিন-চারজন মানুষ অনায়াসে তক্তপোশে শুতে পারবেন। আমরা বলছিলাম, আপনি যদি দাদাদের নিয়ে ওখানে শুতেন, বড় ভাল হ'ত। এখানে আপনার কষ্ট হবে বাবা!"

"বেশ, তোদের আশ্রয়ে এসেছি, তোরা ভালোবেসে যেখানে থাকতে বলবি, সেখানেই থাকব। এখন আমাদের প্রসাদের ব্যবস্থাটা করে দে তো! সবার খিদে পেয়ে গেছে।"

"আমরা যাচ্ছি বাবা! দেখছি কি করা যায়।"

ছেলেরা তাড়াতাড়ি রান্নার জায়গার দিকে চলে যায়। আমরাও হাত-পা ধুতে চলি।

টিউব্‌ওয়েলে বেশ ভিড়। বলা বাহুল্য সবাই আমার সহযাত্রী। বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে হাত-মুখ ধোবার সুযোগ পেলাম।

ফিরে আসতেই দত্তবাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। তিনি কাছে এসে বলেন, "ঘোষদা, গত দুরাত খুবই শোবার কষ্ট করেছেন। আজ বাবার দয়ায় আপনাদের জন্য একটা ভাল আশ্রয় যোগাড় করতে পেরেছি। ভদ্রলোক খাট-বিছানা সহ ঘরখানি ছেড়ে দিয়েছেন, আপনারা সেখানেই থাকবেন।"

"আমরা মানে?" আমি ঠিক বুঝতে পারি না।

দত্তবাবু বুঝিয়ে দেন, "মানে আপনারা দুজন, আপনি ও বৌদি।"

চমকে উঠি। তাড়াতাড়ি মানসীর দিকে তাকাই। ওর চোখে চোখ পড়ে আমার। আমি অসহায়ের মতো চুপ করে থাকি। মানসী চোখ নামিয়ে নেয়। একটু হেসে বলে, "সেটা কি খুব স্বার্থপরতা হবে না দত্তদা?"

"স্বার্থপরতা হবে কেন বৌদি?"

"আপনারা কে কোথায় থাকবেন, তার ঠিক নেই আর আমরা দুজনে একটা ঘর দখল করব!"

দত্তবাবু প্রতিবাদ করেন, "আমরা সবাই আশ্রয় পেয়েছি। আজ রাতে কারও কষ্ট হবে না! আপনি আমাদের জন্য চিন্তা করবেন না বৌদি!'

মানসী আবার একটু হাসে। হাসলে এখনো ওর গালে টোল পড়ে, তেমনি সুন্দর দেখায়। হাসতে হাসতে বলে, "বৌদি বলে যখন ডাকছেন ভাই, তখন তো চিন্তা-না করে পারি না। কিন্তু সে-সব চিন্তা পরে করা যাবে, এখন চলুন, প্রসাদ পেয়ে আসি। সবাই বসে পড়েছেন।"

বেলা তিনটের আগেই প্রসাদ পাওয়া গেল। তুলনায় তাড়াতাড়ি হল আজ। রান্নাও ভাল হয়েছে। সবই সম্ভব হল স্থানীয় মানুষদের সহায়তায়। স্কুলের হেডমাস্টারমশাই থেকে নেতাজী ক্লাবের সদস্যরা পর্যন্ত সবাই সাধ্যমত সাহায্য করছে।

যাঁরা এখানে পৌঁছেই ছুটে এসে স্কুলঘর দখল করেছেন, শেষ পর্যন্ত তাঁরাই কিন্তু ঠকে গেলেন। তাঁদের কাছে প্রতিযোগিতায় পরাজিত হয়ে যাঁরা কলোনীর বাড়িতে বাড়িতে আশ্রয় ভিক্ষে করতে বেরিয়েছিলেন, তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই বেশ ভাল জায়গা পেয়েছেন। এখানে অধিকাংশই পাকা বাড়ি। বাসিন্দারাও অতিথিবৎসল।

প্রসাদের পরে মানসী বলে, "জিনিসপত্র সব স্কুলের সামনে পড়ে আছে। আমাদের জিনিসগুলো নিয়ে রাখা দরকার।"

"কোথায় রাখবে?"

"দত্তদা আমাদের জন্য যে ঘর ঠিক করেছেন।" সে নির্বিকার কণ্ঠে উত্তর দিয়ে আমার দিকে তাকায়।

আমি বলি, "কিন্তু সে ঘরে আমাদের দুজনের একলা থাকাটা ভাল দেখাবে কি?"

"খারাপই বা কি দেখাবে?" সে আমার দিকে তাকিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করে।

আমি চট করে কোনো জবাব দিতে পারি না।

সে একটু হাসে। তারপরে আবার বলে, "তোমার কাঁধে কি সেই যোগীন্দর নগরের ভূতটা আবার চেপে বসল নাকি?"

"না, না। সে ভূতটা বহুদিন হল চিরকালের মতো কাঁধ থেকে নেমে গিয়েছে।" তাড়াতাড়ি উত্তর দিই। বলি, "নইলে আমি বৃন্দাবনে গিয়ে তোমার বাসায় উঠি কেমন করে, আর তুমিই বা কলকাতায় এসে কেমন করে আমার কাছে থাকো?"

"তাহলে আবার খারাপ দেখাবার প্রশ্ন উঠছে কেন?"

"আমি এসব ভেবে কথাটা বলি নি মানসী! আম বলছি, যেখানে জায়গার এমনি টানাটানি, সেখানে আমাদের দুজনের একটা ঘর দখল করা একটু কেমন দেখাবে না কি?"

"সে ভাবনা আমাদের নয়। তুমি দত্তদাকে বলো, আমাদের ঘরটা একটু দেখিয়ে দিন। মালপত্রগুলো সেখানে রেখে নিশ্চিন্ত হওয়া যাক।"

তাই করতে হল। দত্তবাবু ও তাঁর ভাই আমাদের সঙ্গে চললেন।

বারোয়ারীতলার মন্দির থেকে কলোনীর পথ ধরে প্রায় শ'খানেক মিটার এগিয়ে বাঁদিকে একটা বাড়ি। পাকা বাড়ি। সামনে একফালি ফুলের বাগান, তারপরে খোলা বারান্দা। বারান্দার পরে বসার ঘর, তার পেছনে পাশাপাশি দুখানি শোবার ঘর। তারই একখানি ঘর আমাদের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে। শুধু ঘর নয়, সেই সঙ্গে খাট ও বিছানা। এখানে এমন আশ্রয় মিলতে পারে, তা সত্যই কল্পনাতীত। সবই ঠাকুরের কৃপা।

গৃহস্বামীর সঙ্গে আলাপ হল। বৃদ্ধ ভদ্রলোক, নাম চিন্তাহরণ দাস। স্ত্রী গত হয়েছেন। দুটি ছেলে নিয়ে সংসার। দুজনেই চাকরি করে। বড়ছেলে বিয়ে করেছে। বৃদ্ধ তাঁর নিজের ঘর ও বিছানা আমাদের ছেড়ে দিয়ে ছোটছেলের সঙ্গে বসার ঘরে শোবার ব্যবস্থা করেছেন। আমি সবিনয়ে বলি, "আমরাই তো এঘরে থাকতে পারতাম।"

"না, না।" তিনি হাতজোড় করেন। বলেন, "আপনারা পুণ্যবান, গৌড়পরিক্রমা করছেন। আপনাদের আশ্রয় দিলে আমার পুণ্য হবে। দয়া করে আমাকে এ সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করবেন না।"

এর পরে আর কোনো কথা চলে না। সুতরাং বৃদ্ধের দাবী মেনে নিতে হয়।

টেব্‌ল চেয়ার আয়না আলনা জলের কুঁজো সবাই এঘরে রয়েছে। পাশেই বাঁধানো উঠানে বাথরুম ও টিউব্‌ওয়েল। দত্তবাবুরা চলে যাবার পরে মানসী, আবার হাতমুখ ধুতে চলে গেল। আমি মালপত্রগুলো গুছিয়ে নিলাম।

ফিরে এসে মানসী বলে, "ভদ্রলোকের পুত্রবধূটিও ভারী ভাল মেয়ে। আমাকে চা খাওয়াতে চাইল।" একবার থামে সে। তারপরে আবার বলে, "তুমিও পা ধুয়ে চপ্পলটা পরে নাও, বেশ ঠাণ্ডা পড়ে গেছে।"

আমি তার নির্দেশ পালন করি। ঘরে ফিরে দেখি মানসী আধশোয়া হয়ে বিশ্রাম করছে। আমি আসতেই সে উঠে বসে। বলে, "এখুনি কি মন্দিরে যেতে হবে?"

"না। কেন বলো তো?"

"তাহলে একটু শুয়ে নিতাম। বুঝতেই পারছ, এমন চমৎকার খাট-বিছানা পেয়েছি।" এ যেন মানালীর সেই ছেলেমানুষ মানসী।

হেসে বলি, "বেশ তো, তুমি একটু বিশ্রাম করে নাও, আমি পাঠের আগে এসে তোমাকে ডেকে নিয়ে যাবো।

"না, না। তার দরকার নেই। এখান থেকে মাইকের শব্দ বেশ শোনা

যাচ্ছে। তাছাড়া বউটিও পাঠ শুনতে যাবে। আমি ওর সঙ্গে চলে আসব। তোমাকে আর আসতে হবে না।” একবার থামে সে, তারপরে জিজ্ঞেস করে, “তুমি একটু বিশ্রাম করবে না?”

“আমি বরং একবার ওখানে যাই।”

আমার কথা শুনে মানসী মৃদু হাসে। বলে, “মুখে যতই বলো, তোমার কাঁধ থেকে যোগীন্দর নগরের ভূতটা সত্যি সত্যি নেমে যায় নি। যাক গে, তুমি বরং ওখানেই যাও। আমি একটু বিশ্রাম করে নিই। পাঠের সময় ঠিক চলে আসব।”

“যাবো?”

“হ্যাঁ, এসো!” একবার থামে সে। তারপরে আমার একখানি হাত নিজের দুহাতের মধ্যে নিয়ে একটু হেসে বলে, “তুমি ভুল বুঝো না। আমি সত্যি রাগ করি নি।”

আমি ওর দিকে তাকাই। দুজনের চোখে দুজনের চোখ পড়ে। কয়েকটা নীরব মুহূর্ত। তারপরে আস্তে আস্তে আমার হাতখানি ছাড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে আসি ঘর থেকে। মানসী অপলক নয়নে তাকিয়ে থাকে আমার দিকে।

রাস্তায় নেমে আসি। চলতে চলতে ভাবি সত্যই কি যোগীন্দর নগরের সেই মানসিকতা আজও আমার মধ্যে বেঁচে আছে? না, না, তা কেন? ইতিমধ্যে আমরা দুজনে যে জীবনপথের দীর্ঘ দূরত্ব পাশাপাশি অতিক্রম করেছি। আর একথা মানসীও স্বীকার করবে। তাহলেও কেন যেন সেদিনের কথা বার বার মনে পড়ছে আমার। যোগীন্দর নগরের সেই স্বপ্ন-সুন্দর রাতটির কথা। আমি ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চলি।

আমরা মানালী থেকে কুলু হয়ে যোগীন্দর নগরে এলাম। ডাকবাংলোয় জায়গা পেলাম না। একটা হোটেলে উঠতে হল। পাছে দুখানা সিঙ্গল বেডরুম নিলে ছোট শহরে আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠি, তাই শেষ পর্যন্ত একখানি ডাব্‌ল-বেড রুমই নিতে হল। রাতে শোবার আগে আমার খাটখানি মানসীর খাট থেকে খানিকটা সরিয়ে নিতেই মানসী প্রশ্ন করল—ব্যবধানটা কি মনে আঁকা ভাল নয়, সখা?

আমি কোনো উত্তর দিতে পারি নি। কিছুক্ষণ নীরবে কেটে গেছে। তারপর মানসী আমাকে বলেছে—তুমি পুরুষ, আমি নারী। একঘরে রাত্রিবাস করছি। দেহের আকাঙ্খা দুর্বার হলে খরস্রোতা নদীর ব্যবধানও দুস্তর নয়, সামান্য এই এক ফুটে কি হবে?

তারপরে সে খাট থেকে নেমে এগিয়ে গেছে দরজার কাছে। সশব্দে দরজটা বন্ধ করে দিয়ে ফিরে এসেছে বিছানায়। আমার পাশে শুয়ে পড়ে আবার বলেছে—ছাইভস্ম না ভেবে, আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ো এবারে।

ভেবেছি মেয়ে হয়ে মানসী যখন এত সহজ, এতো স্বাভাবিক হতে পারছে, তখন তো আমার এমন করা সাজে না! আমি উঠে বাতিটা নিবিয়ে দিয়েছি। মুহূর্তের মাঝে জমাট বাধা কালো আঁধার ছেয়ে ফেলেছে আমাকে। কেবল আমাকে নয়, মানসীকেও। তবে সে তার মনের আলো রেখেছিল জ্বালিয়ে। আর সেই আলোয় আমার মনের আঁধার দিয়েছিল দূর করে।

আমি অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে খাটের কাছে ফিরে এলাম। বিছানায় আশ্রয় নিলাম। মানসী কথা বলল—শুয়ে পড়লে?

আমি শুধু বললাম—হ্যাঁ।

—তোমার বড্ড ভয় করছে, না?

—ভয়! কিসের ভয়? আমি বুঝতে পারি নি ওর কথা।

সে উত্তর দিয়েছে—লোক ভয়, দুর্নামের ভয়। অনাত্মীয়া মেয়েকে নিয়ে একঘরে রাত্রিবাসের ভয়।

আমি ঠিক অস্বীকার করতে পারি নি। আর তাই আমাকে নির্ভয় করতে মানসী বলেছে—তুমি তো আমার কেবল সখা নও, তুমি আমার প্রিয় লেখক। লেখা পড়ে যাকে একদিন মনে মনে ভক্তির অর্ঘ্য নিবেদন করেছিলাম, ভালোবেসেছিলাম, তাকে আজ আমি এতো কাছে পেয়েছি, এ আমার পরম সৌভাগ্য।

আমি তেমনি নীরব রয়েছি। মানসী বলে চলেছে—পাওয়া আর না-পাওয়া নিয়েই জীবন। পাওয়ার চেয়ে না-পাওয়ার দিকটা সব সময়েই বড়। কিন্তু চরম প্রতিকূলতার মাঝে সামঞ্জস্য বিধানই তো জীবনধারণ।

—অনেক দিন পরে, অনেক দিনের ঈপ্সিতকে পেয়েছি তোমার মাঝে, এ পাওয়া যে কতো বড়, তা আমি তোমাকে বোঝাতে পারব না সখা। কিন্তু আমার মানস-লোকের অধীশ্বরের কাছে আমি কোনো অমানবিক আচরণ আশা করি না। তাই আমি পরম নিশ্চিন্তে, এই আঁধার ঘরে তোমার সঙ্গে এক বিছানায় রাত কাটাতে পারছি।

তারপরে একসময় মানসী আমাকে বলেছে—আমার সম্পর্কে তোমার মনে যদি কোনো সহানুভূতি সৃষ্টি হয়ে থাকে, তাকে ভাবাবেগের আতিশয্যে কিম্বা উচ্ছলতার বহিঃপ্রকাশে নষ্ট করে ফেলো না। ওগুলো বড়ই তুচ্ছ। গভীর

ভালোবাসা জীবনকে আলোকিত করে তোলে, মানুষকে অন্ধকারে নিক্ষেপ করে না। তুমিই তো সেদিন সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের সেই উক্তিটির কথা বলেছিলে, 'Love is not sex. Love has its peaks which only one in a million is able to climb through mature and responsible love.' আমি আমার পরিণত প্রেমের দায়িত্ববোধ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। ভালোবাসার এই গভীরতা আমি অনুভব করেছি। একে আমি সযত্নে রেখে দিলাম আমার মনের মণিকোঠায়। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো সখা, আমার এ ভালোবাসা তোমাকে ওঠাতে না পারলেও, কখনই নামিয়ে নিয়ে যাবে না।

মানসীর সেকথা সত্য হয়েছে। এবং আজ এর চেয়ে বড় সত্য আমার জীবনে আর কিছু নেই।

সন্ধ্যারতির পর পাঠের আসর বসেছে। বারোয়ারীতলার মণ্ডপকেই পাঠমঞ্চ করা হয়েছে। সামনে সামিয়ানার নিচে শ্রোতারা আসন নিয়েছেন। কলোনীর বাসিন্দারাই অধিকাংশ জায়গা দখল করেছেন। আমার সহযাত্রীরা অনেকেই দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। জায়গা না পাওয়ায় তাঁরা কেউ দুঃখিত নন। স্থানীয়রাই আমাদের সান্ধ্যকালীন পাঠ-কীর্তনের আসরে প্রধান অতিথি। তাছাড়া এখানে আমরা তাঁদের কাছ থেকে যে সহযোগিতা ও সাহায্য পাচ্ছি, তার তুলনায় এটুকু কষ্ট কিছুই নয়। আমাকে অবশ্য সে কষ্ট করতে হচ্ছে না। গৌরদা, দত্তবাবু, মানসী, মতি ও কৃষ্ণা সহ আমাদের কয়েকজনকে প্রভুপাদ ডেকে নিয়ে তাঁর দুপাশে বসিয়েছেন। আমরা তাঁর পাশে বসে দিব্যি পাঠ শুনছি।

কিন্তু না, আর অন্য ভাবনা নয়। প্রভুপাদ হারমনিয়াম বাজিয়ে মঙ্গলাচরণ আরম্ভ করেছেন। তিনি গাইছেন—

'শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশোবানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥'

থামলেন প্রভুপাদ। হারমনিয়ামটাকে দূরে সরিয়ে রেখে বলতে শুরু করলেন, "ভক্তবৃন্দ, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রণেতা শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী

তাঁর অমর গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে এই অমৃতময় বাণী পরিবেশন করেছেন। এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবতারের কারণ বলা হয়েছে। কবি বলেছেন—শ্রীকৃষ্ণ ভাবলেন, শ্রীরাধার প্রেম-মাহাত্ম্য কেমন, আর তার প্রেম দিয়ে রাধা আমার যে অদ্ভুত-মাধুর্য আস্বাদন করে সেই মাধুর্যই বা কেমন? আবার সেই মাধুর্য আস্বাদন করে রাধা যে সুখ আহরণ করে, সেই সুখই বা কেমন? তিনি এই তিন রকমের লোভে লুব্ধ হলেন। আর তাই তিনি শ্রীরাধিকার ভাবাঢ্য হয়ে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রূপে শচীগর্ভসিন্ধুতে আবির্ভূত হলেন।"

আবার থামলেন প্রভুপাদ। কিন্তু তারপরেই সুর করে পাঠ শুরু করেন—

'শ্রীচৈতন্য-প্রসাদেন তদ্রূপস্য বিনির্ণয়ম্।
বালোঽপি কুরুতে শাস্ত্রং দৃষ্ট্বা ব্রজবিলাসিনঃ॥'

"ভক্তবৃন্দ, মহাকবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ আমাদের আশ্বস্ত করে বলছেন, শ্রীচৈতন্যের প্রসাদে বালকও শাস্ত্র আলোচনা করে ব্রজবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপের তত্ত্ব নির্ণয় করতে সমর্থ হয়। আসুন, আমরাও শ্রীমন্মহাপ্রভুর কাছে সেই প্রসাদ কামনা করে গৌরকথা আলোচনা আরম্ভ করি।"

'হরিবোল', 'হরি হরিবোল' ছেলেরা জয়ধ্বনি করে ওঠেন, মেয়েরা উলুধ্বনি দেন।

সভা শান্ত হবার পরে প্রভুপাদ শুরু করেন, "আজ আমরা বিশ্বরূপের গৃহত্যাগ ও বিশ্বম্ভরের বিদ্যাশিক্ষা নিয়ে আলোচনা করব।

দাদা বিশ্বরূপ ভাই বিশ্বম্ভরকে খুবই ভালোবাসতেন। তবু ভাই শুধু তাঁকেই খানিকটা ভয় করেন। কিন্তু বিশ্বরূপ জন্ম থেকেই সংসারে অনাসক্ত। তিনি কেবল তাঁর লেখা-পড়া নিয়েই থাকেন। কিশোর বয়সেই তিনি সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী হয়ে উঠলেন। অধ্যাপকদের সঙ্গে শাস্ত্র আলোচনা করে সারাদিন টোলে কাটান। ফলে ভাইয়ের দিকে নজর দিতে পারেন না। এদিকে বড় ছেলে উদাসী বলে সংসার প্রতিপালনের জন্য জগন্নাথকেও সারাদিন বাড়ির বাইরে কাটাতে হয়। একা শচীদেবী দুষ্টু নিমাইয়ের সঙ্গে পেরে ওঠেন না।

শুধু দুষ্টুমি নয়। ছোটবেলা থেকেই মাঝে মাঝে নিমাইয়ের মধ্যে একটা অস্বাভাবিক অবস্থা দেখা যেত। তখন তাঁর কোনো বাহ্যজ্ঞান থাকত না কিন্তু সারা শরীর কেমন যেন জ্যোতির্ময় হয়ে উঠত। ঐ অবস্থায় আবার বালক নিমাইয়ের মুখ থেকে নানা তত্ত্বকথা বেরিয়ে আসত। উপস্থিত সকলেই বিস্মিত হতেন। তাঁরা কেউ বলতেন—মূর্ছা, বায়ুরোগ, চিকিৎসা করাও! কেউ বলতেন—অপদেবতার দৃষ্টি পড়েছে, রোজা ডাকো! কেউবা বলতেন—

কোনো দুষ্ট দেবতার আবেশ, মানসিক ক'রো!

জগন্নাথ অবশ্য এ ব্যাপারে খুব চিন্তিত হলেন না। কিন্তু শচীমা পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কা করে অনেক পুজো ও মানসিক করলেন। এবং যে কারণেই হোক, কিছুদিনের মধ্যেই নিমাইয়ের এই অবস্থাটা কেটে গেল। শচীমাতা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

এই সময় শান্তিপুরে কমলাক্ষ ভট্টাচার্য নামে একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বাস করতেন। তিনিও শ্রীহট্টের মানুষ। সেকালে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় তাঁর মতো পণ্ডিত আর কেউ ছিলেন না। তিনি আচার্য শঙ্করের মতাবলম্বী অদ্বৈতবাদী ছিলেন। শঙ্করাচার্য প্রতিষ্ঠিত দশনামী সম্প্রদায়ের আচার্য শ্রীমৎ স্বামী মাধবেন্দ্র পুরী মহারাজের কাছে তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। তাই সবাই তাঁকে অদ্বৈতাচার্য বলতেন। তাঁর স্ত্রী সীতাদেবীও অতিশয় ধর্মপ্রাণা ছিলেন।

তখন বঙ্গদেশে বৈষ্ণবদের সংখ্যা বড়ই কম। সমাজে তাঁদের কোনো সম্মান ছিল না। সুযোগ পেলেই অবৈষ্ণবরা তাঁদের অপদস্থ করতেন। ব্যথিত বৈষ্ণবদের সান্ত্বনা দিয়ে অদ্বৈতাচার্য বলতেন—তোমরা স্থির হও! আমার প্রভু শ্রীনন্দনন্দন আসছেন।

তিনি প্রতিদিন কৃষ্ণ-ভজন করতেন আর গঙ্গাজল ও তুলসী দিয়ে রাধা-গোবিন্দের পূজা করে প্রার্থনা জানাতেন—প্রভু! আর দেরি ক'রো না, তাড়াতাড়ি এসো। মানুষ অধঃপতনের শেষ সীমায় পৌঁচেছে, তুমি ছাড়া যে তাদের উদ্ধারের আর আশা নেই।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধরে অদ্বৈতাচার্য এই প্রার্থনা জানিয়ে যাচ্ছিলেন।

অদ্বৈতাচার্যের বাড়ি শান্তিপুর হলেও, তিনি নবদ্বীপে একখানি ছোট বাড়ি করেছিলেন। মাঝে মাঝে তিনি সীতাদেবীকে নিয়ে নবদ্বীপে এসে থাকতেন। জগন্নাথ মিশ্রের সঙ্গে তাঁর খুব বন্ধুত্ব ছিল। সীতাদেবীও শচীমাতার বান্ধবী ছিলেন। অদ্বৈতাচার্য ও সীতাদেবী বিশ্বরূপকে বড়ই স্নেহ করতেন।

মামাতো ভাই লোকনাথের সঙ্গে বিশ্বরূপের ভারী বন্ধুত্ব ছিল। পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান বিশ্বরূপকে লোকনাথ গুরুর মতো ভক্তি করতেন।

টোলে পাঠ শেষ হবার পরে বিশ্বরূপ অদ্বৈতসভায় প্রবেশ করলেন। সারাদিন সেখানে থেকে শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। মাঝে মাঝে রাতেও বাড়ি আসেন না। তখন বিশ্বম্ভরের বয়স পাঁচ-ছ বছর। বিশ্বরূপ রাতে বাড়ি না ফিরলে, পরদিন সকালে তাঁকে ডেকে আনার জন্য শচী নিমাইকে অদ্বৈতসভায়

পাঠাতেন। অদ্বৈতাচার্য দূর থেকে দেখতে পেয়েই অপলক নয়নে বালক বিশ্বম্ভরের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। মনে মনে নিজের কাছে প্রশ্ন করতেন—এ শিশুটি কেন এমন করে আমার হৃদয় হরণ করে?

নিমাই কাছে এলে তিনি তাঁকে পাশে বসিয়ে আদর করতেন। তারপরে সীতাদেবীকে ডাকতেন। সীতাদেবী নিমাইকে বাড়ির ভেতর নিয়ে গিয়ে নানা জিনিস খেতে দিতেন।

তখন বিশ্বরূপের বয়স বছর ষোলো। একদিন রাজপথে জগন্নাথ দূর থেকে বিশ্বরূপকে দেখলেন। তাঁর ছেলে বড় হয়েছে, সে যে এখন একজন শিক্ষিত ও সুদর্শন তরুণ, একথা তিনি প্রথম উপলব্ধি করলেন। তাঁর মনে হল, এবারে ছেলের বিয়ে দেওয়া দরকার। বাড়ি ফিরে এসে তিনি কথাটা শচীদেবীকে বললেন। মা আনন্দে উচ্ছ্বসিতা হয়ে উঠলেন। সুপাত্রীর সন্ধান শুরু হয়ে গেল।

কিছুদিনের মধ্যেই কথাটা বিশ্বরূপের কানে এলো। তিনি সঙ্গে সঙ্গে অস্থির হয়ে উঠলেন। কারণ ইতিমধ্যেই তাঁর হৃদয়ে বৈরাগ্যের উদয় হয়েছে। তিনি স্থির করেছেন, বিয়ে করে সংসারী হবেন না। কিন্তু পিতামাতা একবার আদেশ করলে যে তাঁকে তা পালন করতেই হবে। অতএব গৃহত্যাগ করা ছাড়া তাঁর আর কোনো পথ খোলা নেই।

বৃদ্ধ পিতা, স্নেহময়ী জননী, দেবশিশুর মতো ছোটভাই, সবাইকে ছেড়ে চলে যেতে হবে। বাপ-মা অসহায় হবেন, ভাই কান্নাকাটি করবে, তবু যে তিনি নিরুপায়। তাছাড়া শাস্ত্রে আছে, যে বংশে একজন সন্ন্যাসী হন, সে বংশ উদ্ধার হয়ে যায়।

তবু তাঁর ভাইয়ের কথা মনে পড়ে। তিনি গৃহত্যাগ করলে নিমাইয়ের কি উপায় হবে? কে তাঁকে লেখা-পড়া শেখাবে, শাসন করবে, আদর করবে? সে যে অন্য কারও কথা শোনে না। কিন্তু তাঁর তো আর কোনো উপায় নেই। হয় সন্ন্যাসী, না হয় বিয়ে করে সংসারী। না, না, কিছুতেই নয়। সংসারের মায়ায় তিনি কোনমতেই বাঁধা পড়বেন না।

বিশ্বরূপ একখানি পুঁথি নিয়ে মায়ের কাছে এলেন। মাকে বললেন—মা, নিমাই যখন বড় হবে, তখন তাকে আমার কথা বলে এই পুঁথিখানি পড়তে দিও।

—সে কি! মা অবাক হন। বলেন—ভাইকে যখন দেবার, তখন তুই নিজেই তাকে দিবি। আমি আবার এ পুঁথি রাখতে যাবো কেন?

—না, মা! তুমি রেখে দাও। আমি তখন কাছে থাকলে, তোমার থেকে চেয়ে নিয়ে দেবো। মানুষের থাকা না-থাকা কিছুই বলা যায় না।

শচী ছেলের কথায় খুবই কষ্ট পেলেন, তবু তাঁর কথামত পুঁথিখানি রেখে দিলেন।

সন্ন্যাস নেবার কথাটা বিশ্বরূপ প্রথম লোকনাথকে বললেন। দু-জন প্রায় সমবয়সী ভাই হলেও বিদ্যাবুদ্ধির জন্য লোকনাথ বিশ্বরূপকে গুরুর মতো ভক্তি করতেন। তিনি বললেন—আমিও তোমার সঙ্গে যাবো।

পরামর্শ করে দু-ভাই সেদিন রাতে জগন্নাথের বাড়িতে একসঙ্গে শুলেন। শেষরাতে দু-জনে শয্যাত্যাগ করলেন। লোকনাথ বাড়ি থেকে কিছুই সঙ্গে আনেন নি। বিশ্বরূপ শুধু একখানি পুঁথি সঙ্গে নিলেন। তারপরে দুজনে ঘর থেকে আঙ্গিনায় বেরিয়ে এলেন। বিশ্বরূপ নিদ্রিত পিতা-মাতার উদ্দেশে প্রণাম জানালেন। অবশেষে তিনি নিমাইকে শ্রীকৃষ্ণের চরণে সমর্পণ করে গঙ্গার দিকে ছুটে চললেন।

কিন্তু ঐ সময় কে তাঁদের গঙ্গা পার করে দেবে? তাই পুঁথিখানি একহাতে জলের ওপরে তুলে রেখে বিশ্বরূপ লোকনাথের সঙ্গে সাঁতার কেটে গঙ্গা পার হলেন। ভেজা কাপড়ে প্রচণ্ড শীতের মধ্যে কাঁপতে কাঁপতে পশ্চিমদিকে হাঁটতে শুরু করলেন।

কয়েকদিন পথচলার পরে পুরী সম্প্রদায়ের জনৈক সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা হল তাঁদের। বিশ্বরূপ তাঁর কাছে সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন। তাঁর নাম হল শঙ্করারণ্যপুরী। লোকনাথ বিশ্বরূপের কাছে মন্ত্র নিয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। দণ্ডকমণ্ডলুধারী হয়ে দুই ভাই অনন্তপথের পথিক হলেন।"

একবার থামলেন প্রভুপাদ। তারপরে আবার বলেন, "ভক্তবৃন্দ, এইখানে বলে নেওয়া ভাল, শ্রীমন্মহাপ্রভুও শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। মনে হয় দাদার সন্ন্যাস গ্রহনের স্মৃতি তাঁর পরবর্তী জীবনকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেছে। এই প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, 'ঈশ্বরপুরীই প্রথম তাঁহার (শ্রীগৌরাঙ্গদেবের) ধর্ম-প্রতিভা জাগ্রত করিয়া দেন। বোধহয় পুরীসম্প্রদায় বঙ্গদেশের আধ্যাত্মিকতা জাগাইতে বিধাতা কর্তৃক নির্দিষ্ট। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তোতাপুরীর নিকট সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করেন।'*

* মাদ্রাজবাসীগণের অভিনন্দনের উত্তরে আমেরিকা থেকে প্রেরিত বার্তা—১৮৯৪।

কিন্তু সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কথা এখন থাক, এখন বালক নিমাইয়ের কথা বলে নিই।…"

থামলেন প্রভুপাদ। একটু থেমে আবার আরম্ভ করলেন, "নিমাইয়ের বয়স তখন ছ' বছর। তিনি বাইরে খেলা করছিলেন। হঠাৎ মায়ের কান্না শুনে ছুটে এলেন বাড়িতে। শুনতে পেলেন, তাঁর দাদা সন্ন্যাসী হয়ে চলে গেছেন। কখনও তিনি বাড়ি ফিরে আসবেন না। দাদাকে নিমাই আর কোনদিন দেখতে পাবেন না। নিমাই মূর্ছিত হয়ে পড়লেন।

পিতা-মাতা নিজেদের শোক ভুলে গিয়ে ছেলের শুশ্রূষা শুরু করে দিলেন। কিছুক্ষণ বাদে তাঁর জ্ঞান ফিরে এলো। বিশ্বরূপের বিরহ বিস্মৃত হয়ে জগন্নাথ ও শচী নিমাইকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিতে থাকলেন। সেদিন থেকে নিমাইয়ের দুরন্তপনা কমে গেল। তিনি শান্ত হয়ে গেলেন।

নিমাই পড়াশুনায় মন দিলেন। পাছে তিনি কাছে না থাকলে বাপ-মায়ের বিশ্বরূপের কথা মনে পড়ে, তাই তিনি বাড়ির বাইরে যাওয়া বন্ধ করে দিলেন। তিনি বাড়িতেই বাবার কাছে লেখা-পড়া করতে থাকলেন। শচী ও জগন্নাথ বিশ্বরূপকে হারিয়ে নিমাইকে কাছে পেলেন, তাঁকে কাছে পেয়ে তাঁরা বিশ্বরূপের শোক ভুলে গেলেন।

তাহলেও একটা অঘটন ঘটল। একদিন নিমাই হঠাৎ ঠাকুরপুজোর একটা পান খেয়ে নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি অজ্ঞান হয়ে গেলেন। শচী ও জগন্নাথ বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টা করার পরে তাঁর জ্ঞান ফিরে এলো। চোখ মেলে বাপ-মায়ের দিকে তাকিয়ে দুর্বল কণ্ঠে তিনি বললেন—দাদা এসেছিলেন। ভালই আছেন। তবে জানো মা! তিনি আমাকেও সন্ন্যাসী হতে বললেন। আমি রাজী হই নি। আমি তাঁকে বললাম—আমি তো ছোট। আমি সন্ন্যাসের কি বুঝি? তার চেয়ে আমি বরং বাবা-মায়ের সেবা করি। তখন দাদা বললেন—বেশ, তুমি তাই করো। বাবা-মাকে আমার প্রণাম দিও।

শচী ও জগন্নাথ দৈবযোগে বিশ্বরূপের কুশল সংবাদ পেয়ে খুশি হলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিশ্বরূপ কি নিমাইকেও নিয়ে যাবে?

কথাটা কয়েকদিনের মধ্যে শচী ভুলে গেলেও ভুললেন না জগন্নাথ। তিনি ভাবলেন, বড় ছেলে লেখা-পড়া বেশি শেখার জন্যই বাপ-মাকে ছেড়ে চলে গেল। বেশি লেখা-পড়া শেখালে ছোটছেলেটাও হয়তো তাই করবে। তার চেয়ে ওকে লেখা-পড়া না শেখানোই ভালো। মূর্খ হলেও তো ঘরে থাকবে। দুটি অন্ন নিশ্চয়ই ভগবান ওকে দেবেন। তাই জগন্নাথ পরদিন সকালে

নিমাইকে ডেকে বললেন—বিশ্বম্ভর, আজ থেকে তোমার লেখা-পড়া বন্ধ। আমার দিব্যি রইল, তুমি আর বই নিয়ে বসবে না।

নিমাই পিতার আদেশ অমান্য করলেন না। তিনি পুঁথিপত্র রেখে দিলেন কিন্তু আর ঘরে থাকলেন না। আবার পথে বের হলেন। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল খেলা আর দুরন্তপনা। এখন নিমাই দিনের অধিকাংশ সময় গঙ্গাতীরে কাটান। তাঁর জলকেলির প্রতাপে স্নানার্থীরা উত্যক্ত হন। নিমাই কখনও ডুব দিয়ে তাঁদের পা ধরে টানাটানি করেন, কখনও তাঁদের গায়ে-মুখের জল ছিটিয়ে দেন, কখনও বা তাঁদের পূজার ফুল-বেলপাতা নিয়ে পুজোয় বসে যান। অবশেষে পুজোর নৈবদ্য খেয়ে ফেলেন।

মেয়েরাও তাঁর কাছে রেহাই পান না। কুমারী মেয়েরা গঙ্গাতীরে শিবপুজো করেন। নিমাই তাঁদের সামনে গিয়ে হাজির হন। তাঁদের বলেন—আমাকে যদি নৈবদ্য না খেতে দাও, তাহলে তোমাদের বুড়ো-বুড়ো বর হবে।

সবাই এসে শচীর কাছে নালিশ করেন। একদিন শচী বিরক্ত হয়ে বললেন—তুই সবার সঙ্গে এমন মূর্খের মতো ব্যবহার করিস কেন?

নিমাই সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন—তোমরা আমাকে পড়াবে না আর আমি সবার সঙ্গে পণ্ডিতের মতো ব্যবহার করব?

কথাটা শচীকে শেলের মতো বিঁধল। জগন্নাথ বাড়ি ফিরে আসার পরে তাঁকে সব খুলে বললেন। কিন্তু জগন্নাথ পুত্রকে পড়াতে রাজী হলেন না।

কয়েকদিন পরে নিমাই একদিন হঠাৎ এঁটো ফেলার জায়গায় গিয়ে বসে পড়লেন। ছেলের কাণ্ড দেখে মা মাথায় হাত দিলেন অথচ সেখানে গিয়ে তাঁকে ধরে আনতে পারলেন না। তিনি দূর থেকে তাঁকে উঠে আসার জন্য অনুনয় বিনয় করতে থাকলেন।

কিন্তু নিমাই বলে উঠলেন—আমি তোমার কথা শুনতে পারি, তবে তোমাকেও আমার একটা কথা শুনতে হবে।

—বেশ বল্, আমাকে কি করতে হবে?

—আমাকে তোমাদের লেখা-পড়া শেখাতে হবে, নইলে আমি এখানেই বসে থাকব।

নিমাইয়ের কাণ্ড দেখে সেখানে কয়েকজন প্রতিবেশী মহিলা উপস্থিত হয়েছেন। তাঁরা নিমাইয়ের হয়ে ওকালতি শুরু করলেন। বললেন—যে ছেলে নিজের থেকে পড়তে চাইছে, তাঁকে তোমরা টোলে যেতে দিচ্ছ না কেন?

শেষ পর্যন্ত শচী ও প্রতিবেশীদের অনুরোধে জগন্নাথ তাঁর দিব্যি ফিরিয়ে নিলেন। তিনি নিজে নিমাইকে সঙ্গে করে টোলে রেখে এলেন। আর সেদিন থেকেই নিমাইয়ের দুরন্তপনা আবার বন্ধ হয়ে গেল। বালক নিমাই মনযোগ দিয়ে লেখা-পড়া শিখতে লাগলেন। তাঁর স্মরণশক্তি এবং বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে প্রত্যেকে চমকিত হলেন। একবারে পড়লে এমনকি শুনলে, তাঁর মুখস্ত হয়ে যায়। সহপাঠীরা যখন খেলা করে, তখন নিমাই নির্জনে পুঁথি নিয়ে পড়েন। পড়াশুনা ছাড়া আর কিছুই তিনি জানেন না। গুরুমশাই থেকে প্রতিবেশী পর্যন্ত সবাই তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন।

॥ দশ ॥

আজ সকালেও ঘড়ির দিকে তাকিয়ে অবাক হতে হয়। সেই সওয়া সাতটা। এক মিনিট বেশি কিম্বা কম নয়। সেদিন রাতে নিদয়াতে প্রভুপাদ ঘোষণা করেছিলেন—প্রতিদিন সকালে সাতটার মধ্যে আমাদের পরিক্রমা শুরু করতে হবে। কিন্তু পরদিন সকালে নিদয়া থেকে সকাল সওয়া সাতটায় সংকীর্তন শোভাযাত্রা শুরু হয়েছিল। মজার ব্যাপার গতকাল রাজাপুর থেকে আর আজ গৌরাঙ্গনগর থেকে পথে নেমে আসতেও ঠিক সেই সওয়া সাতটা হয়ে গেল। জানি এটা নিতান্তই কাকতালীয়। তবু মনে হয় সকাল সওয়া সাতটার সঙ্গে সংকীর্তন শোভাযাত্রার একটা বিচিত্র ঐকতান সৃষ্টি হয়েছে।

যাক্ গে যেকথা বলছিলাম। আজ সকালেও সওয়া সাতটার সময় গৌরাঙ্গনগর থেকে পথে বেরিয়ে পড়া গেল। নগরবাসীরা পথের পাশে দাঁড়িয়ে আমাদের বিদায় জানালেন। অনেকেই অনুরোধ করলেন—আবার আসবেন ?

আমাদের আশ্রয়দাতা চিন্তাহরণবাবুও একই কথা বলেছেন। কাল রাতে ভদ্রলোক নিজের শোবার ঘরখানি আমাদের ছেড়ে দিয়েছেন। আজ সকালে প্রাতঃকৃত্য সেরে আমি ও মানসী তাঁর কাছে বিদায় নিতে গেলাম। তিনি সবিনয়ে বললেন—বড় আনন্দ পেলাম। আপনারা দুজনে আমার ঘরে রাত্রিবাস করে গেলেন, এ আমার পরম সৌভাগ্য। এদিকে যদি কখনো আবার আসেন, নিজের বাড়ি মনে করে চলে আসবেন।

ভদ্রলোকের পুত্রবধূটি মানসীকে জিজ্ঞেস করল—দিদি, পরিক্রমার পরে আপনি তো ছোট রেলে চড়ার জন্য এপথেই নবদ্বীপ থেকে কলকাতায় ফিরছেন !

মানসী মৃদু হেসে মাথা নেড়েছে।

মেয়েটি বলে উঠেছে—তাহলে আর কি ? দুজনে একটা দিন কাটিয়ে যাবেন আমাদের বাড়িতে। এবারে তো কিছুই মুখে দিলেন না।

মানসী মৃদু হেসে আবার মাথা নেড়েছে। মেয়েটির মনে হয়েছে সে তার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে রাজী হল। সে খুশি মনে আমাদের বিদায় দিয়েছে। কি জানি হয়তো বা সরল গ্রাম্যবধূটি আমাদের পথ চেয়ে দিন গুনবে। কিন্তু

আমরা কি ফেরার পথে এখানে নামার সময় পাবো ? না পেলে গৌর-নিতাই আমাদের সে অপরাধ মার্জনা করবেন তো ?

কিন্তু থাক্ গে ওদের কথা। কিম্বা কাল রাতে ওদের ঘরে আমার ও মানসীর এক শয্যায় রাত্রিবাসের কথা। এবারে আজকের পরিক্রমার কথায় আসা যাক।

আজও যথারীতি সবার আগে খাবারের গাড়ি রওনা হয়ে গিয়েছে। তারপরে আমরা পথে নেমেছি। আমাদের পরে মালপত্রের গাড়ি রওনা হবে। ওদের এখনও বাঁধাছাদা শেষ হয় নি।

পরিক্রমার ক্রম অপরিবর্তিত। সবার আগে হরিভক্তি প্রচারিণী সভার ফেস্টুন। তারপরে সাইকেল ভ্যানে ঠাকুরের সিংহাসন ও মাইক! ভ্যানের পেছনে কীর্তনীয়াগণ আর তাঁদের পেছনে আমরা। কীর্ত্তনীয়ারা আজও ভক্তিরত্নাকর থেকে কীর্তন ধরেছেন—

"এত কহি' ঈশান ঠাকুর হর্ষ হৈয়া।
দেখে শোভা মাজিতাগ্রামের প্রান্তে গিয়া॥
শ্রীনিবাস-প্রতি কহে এ মাজিতাগ্রাম।
কহয়ে প্রাচীন পূর্বে মধ্যদ্বীপ নাম॥
প্রভুর পরমাদ্ভুত লীলা মধ্যদ্বীপে।
মধ্যদ্বীপ নাম যৈছে কহিয়ে সংক্ষেপে॥"…

আমরা এখন গৌরাঙ্গনগর থেকে মাজদিয়ার গাজনতলায় যাচ্ছি অর্থাৎ গোদ্রুমদ্বীপ থেকে মধ্যদ্বীপে চলেছি। তাই ওঁরা মধ্যদ্বীপের মাহাত্ম্য কীর্তন করছেন। মনে মনে ভক্তিরত্নাকরে বর্ণিত সেই লীলার কথা স্মরণ করে পথ চলতে থাকি—

প্রভুর গুণে মুগ্ধ হয়ে একদিন সপ্ত ঋষি এখানে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁরা অনিমেষ নয়নে বার বার প্রভুর আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম নবদ্বীপকে দেখতে থাকলেন। তাঁদের সবার দুচোখের কোল বেয়ে আনন্দাশ্রু নেমে এলো। তাঁরা মাটিতে লুটিয়ে প্রভুর উদ্দেশে প্রণাম করে তাঁর স্তুতি করতে লাগলেন। প্রার্থনা জানালেন—প্রভু, তোমার কৃপায় আমরা যেন সর্বদা নবদ্বীপের ধ্যান করতে পারি আর নিরন্তর তোমার ভক্তদের গুণগান করি।

তাঁদের আকুল প্রার্থনায় ব্যাকুল হয়ে ভক্তবৎসল প্রভু তাঁদের দর্শন দান করে আশীর্বাদ করলেন—

'...হইবেক পূর্ণ সবে যে করিলা মনে ॥
নবদ্বীপ-লীলা মোর অতি গোপ্য হয়।
রাখিবে গোপনে ইথে মোর সুখোদয় ॥"

প্রভুর কথা শুনে ঋষিগণ সবিনয়ে বললেন—আমরা গোপন রাখলেও যে একথা গোপন থাকবে না প্রভু! করতল দিয়ে কি কথনো সূর্যকে ঢাকা যায়?

গৌর তাদের কথা শুনে মৃদু হাসলেন। কিন্তু আর কিছু বললেন না। তিনি সহসা অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

প্রভুর অদর্শনে ঋষিগণ আবার ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। ততক্ষণে মধ্যাহ্ন হয়ে গিয়েছে। তাই তাঁরা সেখান থেকে কুমারহট্টে গিয়ে গঙ্গাতীরে অবস্থান করলেন। আজও সবাই সেই ঘাটকে সপ্তর্ষিঘাট বলে।

কাহিনীটি শেষ করে ঈশান শ্রীনিবাসকে যেকথা বলেছিলেন, আমাদের কীর্তনীয়ারা এখন তাই কীর্তন করছেন। বলছেন—

'ওহে শ্রীনিবাস মধ্যদ্বীপের প্রসঙ্গ।
অল্পে জানাইলু এথা হইল মহারঙ্গ ॥
মধ্যাহ্নের সূর্যসম মধ্যাহ্ন সময়।
দেখা দিল প্রভু তেঞি মধ্যদ্বীপ কয় ॥'

কিন্তু আমি যে ভক্তিহীন অবৈষ্ণব। আমার এত ভক্তিরত্নাকরের ভাবনায় কি কাজ? ভক্তিপথ পরিক্রমা করলেও আমি ভক্ত নই, আমি পথিক—শুধুই পথিক! পথকে অবহেলা করার সাধ্য আমার কোথায়? অতএব পথের দিকে নজর দেওয়া যাক!

গৌরাঙ্গনগর থেকে মাটির পথ পেরিয়ে পৌঁচেছি পিচবাঁধানো পথে—নবদ্বীপ কৃষ্ণনগর রোডে। সেই পথ ধরে এখন হেঁটে চলেছি কৃষ্ণনগরের দিকে।

পথের পাশে বড় বড় গাছ। ছায়াশীতল পথ। পথের ধারে রেল লাইন, নবদ্বীপ-শান্তিপুর রেলপথ—ছোট রেল। মানসী এই রেলে চড়ে কলকাতা ফিরতে চায়। কিন্তু থাক ফেরার কথা এখন নয়, এখন পরিক্রমার কথা হোক।

—ঐ যে রেল আসছে। জনৈক সহযাত্রী সহসা চিৎকার করে ওঠেন।

ব্যস, আমার পরিক্রমার ভাবনায় ছেদ পড়ে। শুধু তাই নয়, পরিক্রমার ক্রম পর্যন্ত নষ্ট হয়ে যায়। থেমে যায় কীর্তন, শোভাযাত্রার গতি যায় হরিয়ে। যে যেখানে ছিল, সে সেখানে দাঁড়িয়েই তাকিয়ে রইল রেলগাড়ির দিকে।

শব্দ করতে করতে ট্রেনটা আসছে। শব্দ হয়তো খুব বেশি নয়, কিন্তু এই শব্দহীন প্রান্তরে শব্দটাকে বিরাট বলে মনে হচ্ছে। প্রচণ্ড শব্দে চারিদিক কাঁপিয়ে একটা যন্ত্রদানব আসছে। আমরা তারই দিকে তাকিয়ে রয়েছি। যেন এর আগে আর কখনো রেলগাড়ি দেখি নি।

অবশেষে সে এলো। আমরা প্রাণভরে তাকে দেখলাম। তার যাত্রীদের উদ্দেশে হাত নাড়লাম। যাত্রীরাও অনেকে হাত নাড়ছেন।

সে আমাদের ছাড়িয়ে চলে গেল। তারপরে একসময় একেবারে অদৃশ্য হল, শব্দটাও গেল হারিয়ে।

আবার শুরু হল কীর্তন, শোভাযাত্রা নড়ে উঠল, আমরা এগিয়ে চললাম।

সহসা মানসী পেছিয়ে এলো, পথের পাশে এসে দাঁড়ালো। আমি ওর কাছে এলাম। ও বলল, "দেখলে কেমন সুন্দর গাড়ি ?"

আমি মাথা নাড়ি। সে বলে, "আমি কিন্তু এই গাড়িতে করেই ফিরব।"

"পথে গৌরাঙ্গনগরে নামবে ?"

"সে তখন দেখা যাবে। কিন্তু বলে রাখলাম, আমি এ গাড়িতে চড়বই।"

"বেশ তো চড়বে।"

"মনে থাকে যেন ?"

"থাকবে।"

সে আর কোনো কথা না বলে এগিয়ে যায় সামনে। মেয়েদের দলে মিশে আবার কীর্তন শুরু করে দেয়। এখন ওকে দেখলে কে বলবে, একটু আগে ও এমন ছেলেমানুষের মতো আবদার করে গেল ?

সংকীর্তন শোভাযাত্রা চলেছে এগিয়ে। আগেই বলেছি আমরা নবদ্বীপ-কৃষ্ণনগর রোড ধরে কৃষ্ণনগরের দিকে এগিয়ে চলেছি। চামটা বাস্তুহারা শিবির পেরিয়ে এলাম।

পথের বাঁদিকে বিরাট একটা বটগাছ দেখিয়ে প্রভুপাদ বলেন, "ওটা ডাকাতে কালীর স্থান। ওখানে থামতে হবে, একবার। আমরা গৌরাঙ্গনগর থেকে পৌনে দু' মাইলের মতো এসেছি।"

শোভাযাত্রা থেমে গেল। আমরা দর্শন করি ডাকাতে কালীর স্থান। এ জায়গাটির নাম পঞ্চাননতলা। পথের সমতলে একফালি জায়গা। পেছনে খানিকটা নিচে ক্ষেত। অনেকখানি জায়গা নিয়ে কালীতলা। বটগাছটি বেশ প্রাচীন। অসংখ্য ঝুরি নেমেছে চারিদিকে। গাছটির গোড়া বাঁধানো। দুদিকে কিছু ঝোপঝাড়। তাহলেও কালীতলাটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

অর্থাৎ এযুগে কালীভক্ত ডাকাত না থাকলেও, ডাকাতে কালীর ভক্ত রয়েছেন। তাঁরা কেউ ডাকাত নন। সুতরাং সেকালের মতো একালে আর নরবলি হয় না, তবে পাঁঠাবলির প্রমাণ রয়েছে ছড়িয়ে। বেশ বোঝা যাচ্ছে দেবী আজও রক্তপান করে চলেছেন। কেনই বা করবেন না। জায়গাটি গুপ্তবৃন্দাবন নবদ্বীপের অনতিদূরে অবস্থিত হলেও এখানে রঘুপতিরা রয়েছেন। অথচ কোনো গোবিন্দমাণিক্য এসে বলছেন না—

'...জানিয়াছি, দেবতার নামে,
মনুষ্যত্ব হারায় মানুষ।...
...জীব জননীর পূজা
জীবরক্ত দিয়ে নহে, ভালাবাসা দিয়ে।'*

পঞ্চাননতলা থেকে খানিকটা এগিয়েই বড় রাস্তার কাছ থেকে বিদায় নিতে হল। রেল লাইন পার হয়ে আমরা গাঁয়ের পথ ধরলাম। বাঁশবনের পাশ দিয়ে সংকীর্ণ মেটোপথ। এখন শীতকাল, কাদা নেই শুধুই ধুলো। ধুলো উড়ছে, চোখ জ্বালা করছে। অথচ আমরা প্রায় জেলাসদর কৃষ্ণনগরের উপকণ্ঠে পৌঁছে গিয়েছি। গ্রামপ্রধান ভারতে গ্রামের মানুষদের জন্য পথ তৈরি করতে আর কয়টি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রয়োজন হবে ?

অবশ্য কর্তৃপক্ষ যদি গৌড়মণ্ডল পরিক্রমার কথা মনে রেখে মহাপ্রভুর আমলের পথটিকে অপরিবর্তিত রেখে থাকেন, তাহলে বলার কিছু নেই। কারণ আমরা খালি পায়ে পরিক্রমা করছি, চোখ জ্বালা করলেও ধুলো মাড়াতে ভালই লাগছে, পায়ে আরাম বোধ করছি।

কিছুদূর এগিয়ে একটা গ্রামে আসা গেল। নাম হরিশপুর। কীর্তনের শব্দ শুনে গাঁয়ের মানুষ পথের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁরা হাতজোড় করে আমাদের স্বাগত জানাচ্ছেন। জনৈক গ্রামবাসী জানালেন সত্তর-আশি ঘর মানুষ গিয়ে গ্রাম। তাঁরা অধিকাংশই দুগ্ধজীবী ঘোষ কিম্বা মিঠাইজীবী মোদক। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে এঁদের প্রভাব রীতিমত উল্লেখযোগ্য। এঁরা অধিকাংশই শ্রীচৈতন্যের ভক্ত।

আমিও মনে মনে তাঁর কথা ভেবে চলি—শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, বালক

* 'বিসর্জন'—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গৌরহরির কথা। এই গৌরহরি নামকরণেরও একটা ইতিহাস আছে। সেই কথাই ভাবতে ভাবতে পথ চলতে থাকি।

গতকাল রাতে গৌরাঙ্গনগরে গৌরকথায় প্রভুপাদ বালক বিশ্বম্ভরের টোলে ফিরে যাবার কথা বলেছেন। তারপরে বছর তিনেক আর তাঁর পড়াশুনার কোনো ব্যাঘাত ঘটে নি। বিষ্ণু পণ্ডিতের টোলে তিনি মনযোগ দিয়ে পড়াশুনা করেছেন।

এইভাবে নিমাই নয় বছরে পদার্পণ করলেন। জগন্নাথ তখন ছেলের পৈতে দেওয়া স্থির করলেন। গুরু অধ্যাপক পুরোহিত প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজন আমন্ত্রিত হলেন। নিমাইকে স্নান ও মস্তক-মুণ্ডন করানো হল। জগন্নাথ পুত্রের কানে গায়ত্রীমন্ত্র প্রদান করলেন।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নিমাই এক বিচিত্র হুঙ্কার দিয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। সকলের সমবেত চেষ্টায় কিছুক্ষণের মধ্যে তাঁর জ্ঞান ফিরে এলো। কিন্তু তারপরে তিনি এমন গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন যে কেউ আর এ সম্পর্কে তাঁকে কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহসী হলেন না। অবশেষে পিতা তাঁকে হাত ধরে দণ্ডী-ঘরে রেখে এলেন।

বালকের আচরণে আমন্ত্রিতরা সকলেই বিস্মিত হয়েছিল। কিন্তু তাঁর উপস্থিতির জন্য এতক্ষণ কেউ কোনো আলোচনা করতে পারেন নি। এবারে শুরু হল আলোচনা। এবং শেষ পর্যন্ত সাব্যস্ত হ'ল—বালক বিশ্বম্ভরের দেহে নিশ্চয়ই কৃষ্ণ বিরাজ করছেন। অতএব আজ থেকে তাঁর নূতন নাম গৌরহরি।

এর পরে বছর দুয়েক বড়ই সুখে শচীর দিন কেটেছে। নিমাই এখন আর দুষ্টুমি করেন না, সর্বদা পড়াশুনা নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। কিন্তু শচীর সে সুখ দীর্ঘস্থায়ী হল না। তখন নিমাইয়ের বয়স বছর এগারো আর আর শচীর পঞ্চান্ন। এই সময় একদিন সহসা জগন্নাথ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কবিরাজ তাঁকে পরীক্ষা করে বিচলিত হলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর সকল চেষ্টা বিফল হল। কয়েকদিনের মধ্যেই জগন্নাথের অন্তিম সময় উপস্থিত হল। মৃত্যু পথযাত্রী স্বামীর পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে শচী পাগলের মতো কাঁদতে থাকলেন।

নিমাই কিন্তু শব্দহীন। তিনি শুধু পিতার মুখের দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে বসে রইলেন। তাঁর দু-চোখের কোল বেয়ে অবিরল অশ্রু ঝরে পড়তে থাকল।

তারপরে একসময় চোখ মুছে উঠে দাঁড়ালেন। গম্ভীর স্বরে মাকে বললেন —এখন শোকের সময় নয় মা, পিতার প্রতি আমাকে শেষ কর্তব্য পালন করতে

হবে। চলো, এখন আমরা তাঁকে গঙ্গাতীরে নিয়ে যাই।

আত্মীয়-স্বজন অনেকেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু নিমাই তাঁদের কাউকে পিতার দেহ স্পর্শ করতে দিলেন না। শচীর সাহায্যে তিনি জগন্নাথকে গঙ্গাতীরে নিয়ে এলেন। তাঁকে ঘাটের ওপর শুইয়ে দিয়ে তাঁর মুখে গঙ্গাজল দিলেন।

আর তারপরেই বালক নিমাইয়ের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। তিনি পিতার পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে কেঁদে উঠলেন—বাবা, তুমি আমাকে কার কাছে রেখে যাচ্ছ?

অনন্তলোকের পথিক জগন্নাথ অস্ফুট স্বরে কোনমতে বলে উঠলেন—শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণে।

তারপরে কয়েকবার কৃষ্ণনাম করে তিনি মর্ত্যলীলা সংবরণ করলেন। নিমাই আর শচী আবার তাঁর পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়লেন।

"এটা বেশ পুরনো গ্রাম, নাম চুর্নীপোতা।..."

প্রভুপাদের কথায় আমার গৌরকথা হারিয়ে যায়। আমি বাস্তবে ফিরে আসি। আমরা গৌরাঙ্গনগর থেকে মাজদিয়ার গাজনতলায় চলেছি। চলতে চলতে মহাপ্রভুর মহাজীবনের কথা ভাবছিলাম। প্রভুপাদের কথায় আমার ভাবনায় ছেদ পড়েছে। আমি চারিদিকে তাকাই। বেশ বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। মাঝে মাঝে দুয়েকটা পাকা বাড়িও দেখতে পাচ্ছি। ইট বাঁধানো পথ। পথের পাশে বাড়ি ঘর আর গাছপালা, কোথাও বা ক্ষেত—শর্ষে আর কলাইয়ের ক্ষেত।

প্রভুপাদ যোগ করেন, "পুরনো গ্রাম হলেও পাকা বাড়িগুলো সবই নতুন, অধিকাংশই পূর্ববঙ্গের বাস্তুত্যাগীরা এসে তৈরি করেছেন।"

আমি দেখতে দেখতে এগিয়ে চলি।

এখন সকাল সওয়া আটটা। অর্থাৎ গৌরাঙ্গনগর থেকে আমরা মাত্র ঘণ্টাখানেক হেঁটেছি।

চুর্ণীপোতা পেরিয়ে এসেছি। পৌঁছলাম একটা বড় দিঘির পারে—বেশ উঁচু পার। তারই ধার দিয়ে পথ—মাটির পথ। দিঘিটার বোধ করি বহুদিন কোনো সংস্কার হয় নি। চারিপাশে তলার মাটি জেগে উঠেছে। সেখানে কোথাও ধানক্ষেত আর কোথাও বা বাঁশবন। তবে দিঘির মাঝখানে অনেকটা জুড়েই জল—বেশ বড় জলাশয়।

দিঘি ছাড়িয়েই আরেকটা গ্রাম! প্রভুপাদ বলেন, "ঠাকুরতলা। প্রাচীন নাম দেবপল্লী, বর্তমান নাম দেপাড়া বা নৃসিংহপুর। এখানেই সেই নৃসিংহদেবের

মন্দির। আমরা সেখানেই চলেছি। আমরা বড় রাস্তা থেকে দেড় মাইল এলাম। এখান থেকে কৃষ্ণনগর মাত্র মাইল দেড়েক।"

পথের ডানদিকে মন্দির। বাঁদিকে কয়েকটি দোকান—চা মিষ্টি ও মনোহারী। দোকানগুলো মন্দিরের জনপ্রিয়তা প্রচার করছে।

রাস্তা থেকে খানিকটা উঁচুতে মন্দির। আমরা কীর্তন করতে করতে সারি বেঁধে মন্দিরে উঠে এলাম।

প্রথমে নাটমন্দির তারপরে গর্ভমন্দির। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঝকঝকে মন্দির। নাটমন্দিরের তিনদিক খোলা একদিকে গর্ভমন্দির। তিনদিকে অনেকখানি করে জায়গা, বহু ফুল ও ফলের গাছ। আর নাটমন্দিরের ঠিক মাঝখানে একটি তুলসীমঞ্চ। ভারী সুন্দর করে সাজানো।

নাটমন্দির থেকে কয়েকধাপ সিঁড়ি ভেঙে গর্ভমন্দিরে উঠে আসি। তিনদিকেই বারান্দা, তারপরে দরজা। সামনের দরজার চৌকাঠে লেখা—

'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ
শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌড়ভক্তবৃন্দ।'

দরজার বাঁদিকে দেওয়ালের ওপরে লেখা—

'শ্রীনৃসিংহ জয় নৃসিংহ জয় জয় নৃসিংহ।
প্রহ্লাদেশ জয় পদ্মামুখপদ্মভৃঙ্গ॥'

ডানদিকের দেওয়ালে লেখা—

'নমস্তে নরসিংহায় প্রহ্লাদাহ্লাদ-দায়িনে।
হিরণ্যকশিপোবক্ষঃ-শিলাটঙ্ক-নখালয়ে॥'

দেওয়ালের এই লিখন কেবল নৃসিংহদেবের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্যই নয়, মহাপ্রভুর প্রতি ভক্তি প্রকাশের জন্যও বটে। কারণ মহাপ্রভু প্রতিদিন পুরীতে জগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ করার সময় এই মন্ত্রদুটি স্তব করতেন।

আমরা সংখ্যায় অনেক তবু নৃসিংহদেবকে দর্শন করতে কোনো অসুবিধে হয় না। কারণ আগেই বলেছি, গর্ভমন্দিরের তিনদিকে তিনটি দরজা। আমরা দর্শন করি।

নৃসিংহ মূর্তিটি সুবিশাল। তিনি হিরণ্যকশিপুর বক্ষ বিদীর্ণ করছেন, প্রহ্লাদ তাঁর পায়ের তলায় পড়ে আছেন।

মূর্তিটি খুবই পুরনো। কিছু ক্ষয়ে গেছে, কোনো কোনো অংশ ভেঙে গিয়েছে। তবু বেশ বোঝা যাচ্ছে।

আমি প্রণাম করি। বিষ্ণুর চতুর্থ অবতার সত্য ন্যায় ও প্রেমের পরম

প্রতীক নৃসিংহদেবকে প্রণাম করি। বাৎসল্য রসসিক্ত বিঘ্নবিনাশন নৃসিংহদেবকে প্রণাম করি। কায়মনোবাক্যে কামনা করি—হে ভক্তের ভগবান, তুমি আবার আবির্ভূত হও, অত্যাচার আর উৎপীড়নের হাত থেকে প্রহ্লাদদের রক্ষা করো, পৃথিবী হিরণ্যকশিপুদের কবল মুক্ত হোক!

তারপরে স্মরণ করি ভগবানের সেই অপূর্ব লীলার কথা। স্মরণ করি বিভিন্ন পুরাণ ও ভাগবতে বর্ণিত সেই অপরূপ কাহিনী—

সত্যযুগে দৈত্যদের আদিপুরুষ ছিলেন হিরণ্যকশিপু। তিনি নিজেকে অজেয় এবং অমর করে তুলতে চাইলেন। তাই সুকঠিন তপস্যা করে ব্রহ্মাকে তুষ্ট করলেন। সন্তুষ্ট পিতামহ তাঁকে বর প্রার্থনা করার অনুমতি দান করলেন। হিরণ্যকশিপু বললেন—আপনি এমন বর দান করুন যে দেবতা অসুর গন্ধর্ব উরগ রাক্ষস পশু ও মানুষ কেউ যেন আমাকে বধ না করতে পারে।

পিতামহ ব্রহ্মা বলে বসলেন—তথাস্তু!

আর যায় কোথায়? হিরণ্যকশিপু স্বর্গ জয় করে ফেললেন। তিনি নানা ভাবে দেবতাদের জীবনকে বিড়ম্বিত করে তুললেন। তাঁর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে দেবতারা ছুটে এলেন বিষ্ণুর কাছে। সব শুনে বিষ্ণু দেবতাদের বললেন —আপনারা নিশ্চিন্তে ফিরে যান, আমি এর বিহিত করছি।

হিরণ্যকশিপুর চার ছেলে। এক ছেলের নাম প্রহ্লাদ। তিনি ছিলেন বিষ্ণুভক্ত ও পরম ধার্মিক। অসুরদের গুরুদেব শুক্রাচার্যের পুত্র নীতিকুশল সুপণ্ডিত ষণ্ড ও অমার্ক রাজপুত্রদের বিদ্যাশিক্ষা দিতেন। প্রহ্লাদও তাঁদের কাছেই শিক্ষিত হচ্ছিলেন।

হিরণ্যকশিপু ছিলেন ভয়ানক বিষ্ণুবিদ্বেষী। একদিন তিনি বিদ্যাপরীক্ষার জন্য ছেলেদের রাজসভায় ডেকে পাঠালেন। কথায় কথায় বিষ্ণুর প্রসঙ্গ উঠল। প্রহ্লাদ বিষ্ণুর গুণকীর্তন করে ফেললেন।

আর যায় কোথায়? হিরণ্যকশিপু ভীষণ রেগে গেলেন। তিনি প্রহ্লাদকে গালাগালি করলেন। বললেন—এই মুহূর্ত থেকে তোর বিষ্ণুভক্তি ছাড়তে হবে, নইলে তোকে এমন কঠিন শাস্তি দেব যে তোর বিষ্ণু এসেও বাঁচাতে পারবে না।

প্রহ্লাদ কিন্তু পিতার আদেশ পালন করতে পারলেন না। কারণ ভক্তি হৃদয়ের সম্পদ। রাজার আদেশ সেখানে অচল। বরং এই অন্যায় আদেশের জন্য প্রহ্লাদের বিষ্ণুভক্তি বেড়ে গেল। তিনি আরও বেশি বিষ্ণুর গুণগান করতে থাকলেন। এবং তাঁর কিছু ভক্তও জুটে গেল।

কথাটা হিরণ্যকশিপুর কানে এলো। তিনি রাগে একেবারে ফেটে পড়লেন। কিন্তু প্রহ্লাদ তাঁর আদর্শে অবিচলিত রইলেন। নিষ্ঠুর হিরণ্যকশিপু বাৎসল্য বিস্মৃত হয়ে পুত্রের ওপরে নানা অত্যাচার আরম্ভ করলেন।

প্রহ্লাদ হাসিমুখে সব অত্যাচার সয়ে যেতে থাকলেন। তাঁর ভক্ত-সংখ্যা বাড়তে থাকল। একদিন ক্রুদ্ধ হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে প্রশ্ন করলেন—মূঢ়, আমি রেগে গেলে ত্রিভুবন কেঁপে ওঠে আর তুই এমন নির্ভয়ে আমার বিরুদ্ধাচরণ করে চলেছিস! কোথা থেকে তোর এই শক্তি আসছে?

প্রহ্লাদ সবিনয়ে উত্তর দিলেন—মহারাজ, যিনি জগতের সকল শক্তির উৎস, সেই সর্বশক্তিমান বিষ্ণুভগবানই আমাকে শক্তি দান করছেন। তিনি কেবল আমার শক্তিব উৎস নন, তিনি আমার তোমার এমনকি ব্রহ্মাদি দেবগণের অর্থাৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকলের সকল শক্তির উৎস। তিনিই ঈশ্বর।

—ঈশ্বর। পিতা চিৎকার করে উঠলেন। তারপরে আবার জিজ্ঞেস করলেন—বেশ বল্, তোর ঈশ্বর কোথায় থাকে?

—ঈশ্বর সর্বদা সর্বত্র বিরাজমান। শান্ত স্বরে পুত্র উত্তর দিলেন।

ক্রুদ্ধ পিতা সভাগৃহের একটি স্ফটিকস্তম্ভ দেখিয়ে বললেন—তোর ঈশ্বর এখানে আছে?

—আছেন বৈকি! নিশ্চয়ই আছেন। প্রহ্লাদ হাতজোড় করে পরমশ্রদ্ধায় সেই স্ফটিকস্তম্ভের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

আর হিরণ্যকশিপু হাতে খড়্গ নিয়ে গর্জন করতে করতে কিছুক্ষণ সেই স্তম্ভের দিকে তাকিয়ে থেকে সহসা শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে স্তম্ভটিকে আঘাত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক শব্দ করে স্তম্ভটি ভেঙ্গে গেল এবং ভেতর থেকে এক বিচিত্র মূর্তি বেরিয়ে এলেন। তাঁর অর্ধেক নর এবং অর্ধেক সিংহ।

হিরণ্যকশিপু ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি অচল ও অনড় হয়ে অপলক নয়নে তাকিয়ে রইলেন নরসিংহ মূর্তির দিকে। ভাবলেন, এ কোন্ বিচিত্র প্রাণী। একি মানুষ অথবা পশু? সিংহ বলেই ভেবে নিলেন শেষ পর্যন্ত।

হিরণ্যকশিপু আবার নৃসিংহদেবের দিকে তাকালেন। তাঁর ভয় কাটল না। কারণ তিনি দেখতে পেলেন সেই নররূপী সিংহের চোখ দুটি লাল, মুখখানি জ্বলন্ত আগুনের মতো উজ্জ্বল। তাঁর মাথা ও গলায় বড় বড় লোম। কাঁধটি অত্যন্ত চওড়া, বুকখানি বিশাল, নখগুলি অস্ত্রের মতো ধারালো আর শরীরটা আকাশছোঁয়া।

কিন্তু তিনি খুব বেশিক্ষণ ধরে তাঁকে দেখার সময় পেলেন না। একটু বাদেই নৃসিংহদেব তাঁকে ধরে ফেললেন। তিনি হিরণ্যকশিপুকে নিজের উরুর ওপরে ফেলে নিয়ে নখ দিয়ে তাঁর বুক চিরে ফেললেন। ভগবান নরসিংহ অবতার রূপে ব্রহ্মার বর ব্যর্থ করে দিলেন।

তারপরে ভগবান গিয়ে হিরণ্যকশিপুর সিংহাসনে বসলেন। দেবতারা ছুটে এলেন সেখানে। কিন্তু তাঁরা দূর থেকেই তাঁর স্তব করলেন, কেউ কাছে আসতে সাহসী হলেন না। অবশেষে তাঁরা লক্ষ্মীদেবীকে ভগবানের সামনে যেতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু ভগবানের ভয়ঙ্কর-সুন্দর রূপ দেখে তিনিও সে অনুরোধ রক্ষা করতে পারলেন না! তখন ব্রহ্মা প্রহ্লাদকে ভগবানের স্তব করতে বললেন।

ভক্ত কিন্তু নির্ভয়ে এগিয়ে গেলেন ভগবানের সামনে। তিনি দুহাত জোড় করে চোখ বুঁজে ভগবানের স্তব করতে থাকলেন।

ভক্তের প্রার্থনায় ভগবানের ক্রোধ প্রশমিত হল। তিনি হাসিমুখে ভক্তকে বর দান করলেন। তারপরে বিষ্ণুলোকে ফিরে গেলেন।

প্রণাম শেষে নেমে আসি নাটমন্দিরে। সহযাত্রীরা দেখছি কীর্তনীয়াদের সঙ্গে গোল হয়ে বসেছেন। তার মানে এখুনি কীর্তন শুরু হবে। আমি নাটমন্দির থেকে বেরিয়ে আসি বাগানে। দুটি তেঁতুল আর একটি তমাল গাছ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তমাল গাছটির গোড়া বাঁধানো। আমি তারই তলায় এসে বসি।

নাটমন্দিরে কীর্তন শুরু হয়েছে—দশাবতারের মাহাত্ম্য কীর্তন। এখান থেকে পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। আমি সেই সংকীর্তন শুনতে থাকি।

সহসা কানে আসে, "বাবু, বুঝি পরিক্রমায় এসেছেন?"

তাকিয়ে দেখি আমার পাশে দাঁড়িয়ে জনৈক প্রৌঢ়। তাঁর পরনে আধ ময়লা ধুতি, গায়ে মলিন চাদর, পায়ে জুতো নেই। মুখে খোচা খোচা সাদা দাড়ি, মাথায় উস্কখুস্ক পাকা চুল। তিনিই প্রশ্নটা করেছেন।

উত্তর দিই "আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি?"

"আমি এ গাঁয়ের মানুষ। আপনাদের দেখতে এলাম। আপনারা এলে যে বড় আনন্দ পাই।"

লোকটি থামেন, কিন্তু আমি চুপ করে থাকি। মনে হচ্ছে তিনি আরও কিছু বলবেন।

আমার অনুমান মিথ্যে হয় না। তিনি আবার বলেন, "আজ এই মন্দির

এমন ঝকঝকে, তকতকে, এমন গমগম করছে কিন্তু শুনলে অবাক হবেন মাত্র বছর পঁচিশ আগেও এখানে জঙ্গল ছিল।"

"কিন্তু মন্দিরে যে লেখা দেখলাম ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে মন্দির সারানো হয়েছে।" আমি প্রতিবাদ করি।

"হ্যাঁ।" লোকটি বলেন, "পাথরের ওপরে ঐ লেখাটা নষ্ট করে ফেলা হয় নি, সযত্নে নতুন নাটমন্দিরে লাগিয়ে রাখা হয়েছে।"

"নূতন নাটমন্দির!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। নূতন বৈকি। বাংলা ১৩৭০ সালে মন্দির ও ১৩৮৮ সালে এই নাটমন্দির নূতন করে তৈরি করা হয়েছে।"

"তার মানে তো মাত্র গত বছর।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, নাটমন্দিরটি গতবছরই তৈরি হয়েছে। আগে তো তেমন লোকজন আসতেন না। এখন গৌড়মণ্ডল পরিক্রমা জনপ্রিয় হয়ে ওঠায় এ অঞ্চলের কিছু কিছু উন্নতি হচ্ছে।"

"কী কীর্তন না করে এখানে এসে যে বড় গল্প করা হচ্ছে?"

কৃষ্ণার কণ্ঠস্বর শুনে পেছনে তাকাই। না, সে একা আসে নি, তার সঙ্গে মানসী। একটু ভুল হয়ে গেল। নাটমন্দিরে না দেখতে পেয়ে মানসী কৃষ্ণাকে সঙ্গে করে আমাকে খুঁজতে বেরিয়েছে।

কিন্তু সেকথা প্রকাশ্যে বলা যাবে না। তাই কৃষ্ণাকেই বলি, "তোমরাই বা কীর্তন ছেড়ে পালিয়ে এলে কেন?"

"পলাতককে পাকড়াও করতে।" কৃষ্ণা হাসতে হাসতে উত্তর দেয়।

আমি গম্ভীর স্বরে বলি, "তার চেয়ে এক কাজ করো!"

"কী?"

"পলাতককে পাকড়াও করার ছল করে যখন পালিয়েই আসতে পেরেছো, তখন পলাতকের পাশেই বসে পড়ো। বসে বসে এই গ্রামের গল্প শোনো। ইনি একজন গ্রামবাসী, নাম…"

"কেষ্টচরণ মোদক।" লোকটি নিজেই বলে ওঠেন। "আপনাদের সঙ্গে আলাপ করতে এলাম মা!"

"বেশ করেছেন।" কথাটা বলে ফেলেই কৃষ্ণা মানসীর মুখের দিকে তাকায়। বোধকরি বুঝে উঠতে পারছে না যে আমার প্রস্তাবে তার সম্মত হওয়া উচিত হবে কিনা?

মানসী কিছু বলতে পারার আগেই আমি কৃষ্ণাকে বলি, "অনুমতি নেবার

দরকার নেই, তোমার মানসীদি গল্প শুনতে ভারী ভালোবাসে।"

আমার কথা শুনে মানসী হেসে ফেলে। হাসতে হাসতেই বলে, "তাই তো সারা জীবন ধরে তোমার পেছনে এমন ঘুরপাক খাচ্ছি।"

এবারে বৃদ্ধ সবিনয়ে মানসীকে বলেন, "বাবু, এমনি ওকথা বললেন মা! আমরা গাঁয়ের মুখ্যু মানুষ, আমরা কি আর গল্প বলতে পারি। আমি বাবুকে আমাদের গাঁয়ের কথা বলছিলাম।"

"বেশ তো, থামলেন কেন? বলুন। আমরা শুনব।" বৃদ্ধকে আশ্বস্ত করে মানসী আমার পাশে বসে পড়ে। কৃষ্ণাও তার পাশে বসে।

বৃদ্ধ বলতে শুরু করেন, "আমাদের গাঁয়ের পরিচয় এই নৃসিংহদেবের মন্দির। আপনারা জানেন এই মন্দিরের প্রসাদ দিয়ে শ্রীচৈতন্যদেবের অন্নপ্রাশন হয়েছিল। তখন নিশ্চয়ই আমাদের গাঁয়ে অনেক মানুষ বাস করতেন। কিন্তু পরে কোনো কারণে গ্রামটি জনশূন্য হয়ে পড়ে, মন্দিরটিকেও সবাই ভুলে যান। তারপরে এখানে একটা মজার ঘটনা ঘটে।"

"কী।" কেষ্টবাবু থামতেই মানসী প্রশ্ন করে বসে।

কেষ্টবাবু মৃদু হাসেন। মানসীর গল্প শোনার আগ্রহ দেখে তিনি নিশ্চয়ই মনে মনে খুশি হন। তাই আবার সানন্দে শুরু করেন, "সে অনেকদিন আগের কথা! মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র তখন নদীয়ার রাজা। সেকালে এ অঞ্চলে সবারই গোলাভরা ধান আর গোয়ালভরা গরু থাকত। তেমনি এক গ্রামবাসীর একদিন হঠাৎ খেয়াল হল তার কালো গাইটা ক'দিন ধরে একেবারেই দুধ দিচ্ছে না। প্রথমে সে ভাবল, বাছুরটা সব দুধ খেয়ে নিচ্ছে। কিন্তু বাছুরকে গোয়ালের বাইরে বেঁধে রেখেও কোনো ফল হল না। তাই সে তার পরদিন মাঠে গরু চড়াবার সময় কালো গাইটার দিকে বিশেষ নজর রাখল। একসময় দেখল গরুটা এদিক ওদিক তাকিয়ে মাঠ ছাড়িয়ে বনে গিয়ে ঢুকল। সেও পেছন পেছন পথ চলতে থাকল। কিছুক্ষণ চলার পরে সে অবাক হয়ে দেখল, গরুটা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে আর তার বাঁট থেকে দুধ ঝরে পড়ছে। গোয়ালা লুকিয়ে রইল।

এক সময় দুধ পড়া বন্ধ হল। গরুটা ধীরে ধীরে বন থেকে বেরিয়ে গেল। গোয়ালাও ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে সেই জায়গাটিতে এলো। দেখল একখানি পাথরের মূর্তি মাটিতে পোতা রয়েছে কেবল মাথাটি দেখা যাচ্ছে। গোয়ালা লুটিয়ে পড়ল সেখানে।

কথাটা রটে গেল চারিদিকে। দলে দলে মানুষ সেই মূর্তি দেখতে আসতে

আরম্ভ করলেন। ক্রমে কথাটি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কানে গেল।* তিনি নিজে এলেন এখানে। সব দেখে শুনে ঠিক করলেন মূর্তিটিকে কৃষ্ণনগর নিয়ে যাবেন। শুরু হল খোড়াখুড়ি। নৃসিংহদেবের গা থেকে মাটি সরানো হ'ল। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও তাঁকে মাটি থেকে তোলা গেল না। কেবল সাবল আর হাতুড়ির দাগ পড়ল তাঁর কপালে। সে দাগ আপনারা আজও দেখতে পাবেন।

মহারাজা মন খারাপ করে ফিরে গেলেন কৃষ্ণনগর। তারপরে একদিন রাতে স্বপ্ন দেখলেন, নৃসিংহদেব তাঁকে বলছেন—মাটি খুড়ে তুমি আমাকে কোথাও নিয়ে যাবার চেষ্টা করো না। আমার পা পাতালের সঙ্গে যুক্ত। আমি ওখানেই থাকব। তুমি আমার মন্দির করে দাও।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র সে স্বপ্নাদেশ পালন করেছিলেন।"

থামলেন কেষ্টবাবু। তিনি নমস্কার করে বিদায় নিলেন। আমরাও উঠে দাঁড়াই। কৃষ্ণা ও মানসীর সঙ্গে ফিরে আসি নাটমন্দিরে।

প্রভুপাদ আমাকে কাছে ডাকেন। মন্দিরের সেবাইত হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। কথায় কথায় হারাধনবাবু বলেন, "শ্রীনৃসিংহদেবের এই মূর্তি কোন্ যুগের, তা এখনও জানা যায় নি। তবে এ যুগে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রই প্রথম এর সেবা-পূজার ব্যবস্থা করেন। এখন অবশ্য সেসব দেবোত্তর সম্পত্তি আর নেই। ফলে খুবই কষ্ট করে আমাদের সেবা-পূজার সংস্থান করতে হয়।"

সেই একই সমস্যা। কামাখ্যা থেকে দ্বারকা পর্যন্ত প্রায় প্রত্যেকটি মন্দিরে যে সমস্যা, এখানেও তাই। কিন্তু ভারত যে এখন ধর্ম নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক দেশ। মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থা এখন ভারতে অচল! সুতরাং সরকার দেবোত্তর সম্পত্তির দখল নিয়েছেন। ফলে দেবতাকে উপবাসী থাকতে হচ্ছে। এর জন্য দুঃখ করা বৃথা। পারলে পকেট থেকে কিছু প্রণামী দাও। না পারলে সমাজতন্ত্রের বুলি আওরাও।

---

* নবদ্বীপপতি রঘুরামের পুত্র। ১৭১০ খ্রীঃ—১৭৮২ খ্রীঃ। জানা যায় গঙ্গাসাগর পর্যন্ত তাঁর রাজ্য বিস্তৃত ছিল। তিনি সাহিত্য প্রেমিক সুরসিক ও ধার্মিক রাজা ছিলেন। তাঁরই আদেশে কবি ভারতচন্দ্র 'অন্নদামঙ্গল' রচনা করেন। গোপাল ভাঁড় তাঁর সভাসদ ছিলেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় বেশ কয়েকখানি ধর্মগ্রন্থ প্রণীত হয়েছে।

"আমরা কি এখন রওনা হব বাবা?" গৌরদা জিজ্ঞেস করেন।

প্রভুপাদ মাথা নেড়ে বলেন, "না। আরকটু দেরি হবে। তোমরা এখানে একটু বিশ্রাম করে নাও, আমি আর ঘোষবাবা একটু ঘুরে আসছি।" তিনি আমাকে ইসারা করে উঠে দাঁড়ান।

"আমরা কি সঙ্গী হতে পারব না।" কৃষ্ণা জিজ্ঞেস করে।

"না।" প্রভুপাদ উত্তর দেন। আস্তে আস্তে বলেন, "তোরা যেতে চাইলে সবাই যেতে চাইবে। দেরি হয়ে যাবে। তোরা একটু জিরিয়ে নে, আজ আরও ছ-সাত মাইল হাঁটতে হবে। আমরা চট করে ঘুরে আসছি।"

আমি ও প্রভুপাদ মন্দির থেকে রাস্তায় নেমে আসি। একটি অপরিচিত তরুণ আমাদের সঙ্গে চলেছে। প্রভুপাদ তার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেন। ছেলেটির ডাক নাম রাম, ভাল নাম সত্যেন বিশ্বাস। এই গ্রামেরই ছেলে। বয়স বছর পঁচিশ। আই. টি. আই থেকে পাশ করে বসে আছে।

গত কয়েকদিন দেশের কথা ভাবার সময় পাই নি। পরিক্রমার আনন্দে মশগুল ছিলাম। আজ যেন সমাজের সব সমস্যার প্রতীক হয়ে রাম আমার সামনে এসে হাজির হয়েছে। কর্মঠ ও শিক্ষিত যুবক। হাতের কাজ শিখেছে। তবু তার বেকারত্ব ঘোচে নি।

গন্তব্যস্থল দূরবর্তী নয়, আমরা সেখানে পৌঁছে গেলাম। মেটোপথের পাশে একফালি জায়গা। নিতান্ত অনাদৃত ভাবে কয়েকটি পাথরের মূর্তি পড়ে রয়েছে। না, পুরাতত্ত্ব বিভাগের কোনো নোটিশ নেই এখানে। অর্থাৎ মূর্তিগুলো সরকার অধিগ্রহণ করেন নি। মূর্তিগুলি দেখি। অধিকাংশই ভগ্ন। কিন্তু প্রায় প্রত্যেকটি সুপ্রাচীন। একটি শিবলিঙ্গ ও একখানি হরপার্বতীর মূর্তি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দুটিই ভাঙা। কিন্তু শিবলিঙ্গটি যেমন মসৃণ, হর-পার্বতীর মূর্তিটি তেমনি বিচিত্র। শিব পার্বতীর স্তন মর্দন করছেন।

আমাদের পথ-প্রদর্শক রাম বলে, "বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে মাটি খুঁড়ে এগুলো পাওয়া গেছে। আমাদের ধারণা পুরাতত্ত্ববিদগণ এ সব মূর্তি নিয়ে গবেষণা করলে সেকালের সমাজ জীবন সম্পর্কে বহু মূল্যবান তথ্য জানা যাবে।"

আমিও তার বক্তব্য সমর্থন করি। কিন্তু তাতে আমার দেশ ও সমাজের কি মঙ্গল হবে? আমি শুধু আমার পাঠক-পাঠিকাদের আমন্ত্রণ জানিয়ে বলতে পারি—আপনারা সময় করে একবার দেপাড়ায় আসুন। নৃসিংহদেবকে দর্শন করে এই প্রাচীন মূর্তিগুলো দেখুন। জেনে যান যে বাংলার ইতিহাস ও শিল্পকলা কোনমতেই অবজ্ঞার বস্তু নয়।

॥ এগারো ॥

ঘণ্টা দুয়েক পরে আবার সংকীর্তন শোভাযাত্রা শুরু হল। সামনে সুদীর্ঘ পথ। সুতরাং প্রভুপাদ তাড়াতাড়ি পা চালাতে বললেন। কিন্তু তাঁর সে নির্দেশ কতটা কার্যকরী হবে, বলতে পারছি না। আমাদের দলে যে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের সংখ্যাই বেশি! তবে এখন কিন্তু সবাই গুরুবাক্য পালন করছেন। বেশ জোরে জোরে হাঁটছেন।

আবার বড় রাস্তায় এসে পড়া গেল। ধুলোর হাত থেকে মুক্তি পেয়ে কাঁকরের পাল্লায় পড়লাম। পায়ের মায়ায় সবাইকে পথের দিকে নজর দিতে হচ্ছে। চলার গতিবেগ গেল কমে। এবারে ধীরে ধীরে পথ চলতে চলতে গৌরকথা স্মরণ করা যাক।

পতি বিয়োগের পরে শচী খুবই অসহায় বোধ করতে থাকলেন। একে সংসারে কোনো আয় নেই, তার ওপরে নিমাইয়ের লেখাপড়া। এমনকি তিনি প্রাণ ভরে কাঁদতে পর্যন্ত পারলেন না, পাছে নিমাই কষ্ট পান। খাওয়া-পড়ার চাইতে ছেলের লেখাপড়ার ভাবনাটাই তাঁকে বেশি বিচলিত করে তুলল। অনেক ভাবনা-চিন্তার পরে তিনি নিমাইকে নিয়ে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের বাড়িতে গেলেন। নিমাই তখন বারো বছরের সুদর্শন ও স্বাস্থ্যবান কিশোর।

গঙ্গাদাস পণ্ডিত ব্যাকরণে অদ্বিতীয় ছিলেন। শচীর কাছে সব কথা শুনে তিনি বললেন—বহুভাগ্যে নিমাইয়ের মতো মেধাবী শিষ্য মেলে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি নিমাইকে সাধ্যমত পড়াবো।

নিমাই গুরুকে প্রণাম করলেন। গুরু আশীর্বাদ করলেন—তোমার বিদ্যা লাভ হোক।

গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে নিমাই নিয়মিত পড়াশুনা করতে থাকলেন। বছর দুয়েকের মধ্যে তিনি পণ্ডিত মশায়ের শ্রেষ্ঠ শিষ্যের আসনটি অধিকার করে নিলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র চোদ্দ বছর, অথচ টোলে ত্রিশ/বত্রিশ বছর বয়সের ছাত্রও ছিলেন। এবং তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন মেধাবী ছাত্র। যেমন পরবর্তীকালে অলঙ্কারে অদ্বিতীয় কমলাকান্ত, তন্ত্রসারকর্তা কৃষ্ণানন্দ ও মুরারি গুপ্ত এই টোলে পড়াশুনা করতেন। তাঁরা সকলেই সুপণ্ডিত। কিন্তু নিমাই আসার পরে তাঁদের সব পাণ্ডিত্য ম্লান হয়ে গেল।

প্রথমদিন নিমাইকে দেখেই মুরারির সেই ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। তিনি ভয় পেয়ে গেলেন। ভাবলেন, নিমাই নিশ্চয়ই আবার তাঁর পেছনে লাগবেন। কিন্তু এ যেন অন্য নিমাই।—সর্বদা পুঁথি নিয়ে থাকেন। কয়েকদিনের মধ্যেই মুরারির ভয় কেটে গেল। তিনি তখন অলক্ষ্যে কেবলি নিমাইয়ের চাঁদের মতো মুখখানির দিকে তাকিয়ে থাকতেন। কিন্তু তাঁর পটল চেরা চোখদুটিতে চোখ পড়লেই মুরারিকে চোখ নামিয়ে নিতে হত। তখন তিনি চোখ বুজে ভাবতেন—একি মানুষ, না দেবতা ?

পরবর্তীকালে মুরারি গুপ্ত তাঁর কড়চায় এ প্রশ্নের উত্তর দিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু সেকথা এখন থাক, এখন নিমাইয়ের ছাত্রজীবনের কথা ভাবা যাক।

সকালে নিমাই চতুষ্পাঠিতে পড়াশুনা করেন, দুপুরে খাবার পরে আবার বই নিয়ে বসেন, বিকেলে গঙ্গাতীরে যান। সেখানে বিভিন্ন বয়সের বহু পণ্ডিতের সঙ্গে দেখা হয়। কিশোর নিমাই তাঁদের সঙ্গে তর্ক যুদ্ধ শুরু করে দেন। এক ঘাটের পণ্ডিতদের পরাজিত করে, সাঁতার দিয়ে অন্যঘাটে যান। সেখানেও শাস্ত্রযুদ্ধ করেন। তারপরে আবার অন্য ঘাটে। কখনও বা গঙ্গা পার হয়ে ফুলিয়ায় চলে যান। এক কথায় কিশোর নিমাই শাস্ত্রজ্ঞ পেলেই শাস্ত্রযুদ্ধ আরম্ভ করে দিতেন।

বয়স যা-ই হোক, সেই বয়সেই নিমাই সুপণ্ডিত রূপে স্বীকৃতি পেয়ে গেলেন। তিনি ব্যাকরণের একখানি টিপ্পনী রচনা করলেন। নবদ্বীপ তখন পণ্ডিতদের পীঠভূমি। তবু নিমাইয়ের গ্রন্থখানি কিছুদিনের মধ্যেই জনপ্রিয় হয়ে উঠল।

ব্যাকরণ পাঠ শেষ হবার পরে নিমাই ন্যায়শাস্ত্র পড়তে চাইলেন। তিনি বাসুদেব সার্বভৌমের টোলে যোগদান করলেন। সেখানেই দীধিতির গ্রন্থকর্তা রঘুনাথের সঙ্গে পরিচয় ও বন্ধুত্ব হল। নিজের প্রতিভা সম্পর্কে রঘুনাথের বড়ই বিশ্বাস ছিল। কিন্তু নিমাইয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব হবার কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁর আত্মবিশ্বাসে আঘাত লাগল। তারপরে যখন শুনলেন নিমাইও ন্যায়ের ওপরে একখানি টিপ্পনী লিখতে আরম্ভ করেছেন, তখন রঘুনাথ বড়ই নিরাশ হয়ে পড়লেন। তবু তিনি সাহস করে একদিন নিমাইকে বললেন—ভাই, তোমার গ্রন্থখানি একবার আমাকে দেখাবে ?

—কেন দেখাবো না, নিশ্চয়ই দেখাবো। বেশ কালই নিয়ে আসব। নিমাই সানন্দে সম্মত হলেন।

পরদিন টোল থেকে ফেরার পথে দুজনে যখন নৌকোয় করে গঙ্গা পার হচ্ছেন, তখন নিমাই তাঁর পুঁথিখানি বের করে রঘুনাথকে শোনাতে থাকলেন।

কিছুক্ষণ শোনার পরে রঘুনাথ বললেন—ভাই নিমাই, আমি একটি সিদ্ধান্ত বোঝাতে শ্লোকের পর শ্লোক লিখতে বাধ্য হয়েছি, অথচ সেই সিদ্ধান্তগুলো তুমি দু-চারটি সহজ সরল কথায় কেমন সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছো। কাজেই তোমার এই ন্যায়গ্রন্থ পেলে কেউ কি আর আমার গ্রন্থ পড়বে? বৃথাই আমি এ গ্রন্থ রচনা করছি।

বলতে বলতে রঘুনাথের চোখে জল এসে গেল। তিনি আর কিছু বলতে পারলেন না।

রঘুনাথের কথা শুনে নিমাই পণ্ডিতের চোখদুটিও জলে ভিজে উঠল। তিনি সজল চোখে বন্ধুর দিকে তাকালেন। রঘুনাথের সংযমের বাঁধ ভেঙে গেল। তিনি কাঁদতে কাঁদতে বলে উঠলেন—আমি এখন পর্যন্ত জীবনে কিছুই করতে পারি নি। বড় আশা ছিল, এই ন্যায়গ্রন্থখানি রচনার পরে আমার কিছু খ্যাতি হবে। কিন্তু আমার সকল শ্রম বিফলে গেল। বুঝতে পারছি, তোমার গ্রন্থই জগতে অমর হয়ে থাকবে। এখন আমার গ্রন্থখানি আগুনে পুড়িয়ে ফেলাই ভাল, আমি তাই করব।

—না। নিমাই বলে উঠলেন। তারপরে স্নিগ্ধ হেসে বললেন—না না! তোমার গ্রন্থ পোড়াতে হবে না, এই দেখো আমার গ্রন্থ আমি গঙ্গায় বিসর্জন দিলাম।

বলতে বলতে নিমাই নিজের পুঁথিখানি জলে ফেলে দিলেন।

—এ তুমি কি করলে নিমাই? অপ্রস্তুত রঘুনাথ প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন।

গঙ্গার স্রোতে ভেসে যাওয়া পুঁথির পাতাগুলোর দিকে চোখ রেখে নিমাই রঘুনাথকে সান্ত্বনা দিলেন—এর জন্য তুমি কোনো দুঃখ ক'রো না ভাই! যা হবার, তাই হয়েছে। তুমি আমার ভারী উপকার করলে। আমাকে মনে করিয়ে দিলে, আমি ন্যায়শাস্ত্র শেখাতে জন্মগ্রহণ করি নি। আমাকে অন্য কিছু করতে হবে।

রঘুনাথ কি সেদিন সেকথার মর্ম উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন? বোধকরি না। তিনি কেমন করে বুঝতে পারবেন যে ন'দের নিমাই আর কেউ নন, স্বয়ং কলির ভগবান।

যাক্ গে, যেকথা ভাবছিলাম। সেদিন থেকেই নিমাইয়ের সঙ্গে ন্যায়-শাস্ত্রের সকল সম্পর্ক শেষ হয়ে গেল। সেই সঙ্গে তাঁর টোলে পড়াও শেষ হল। কিছুদিনের মধ্যে তিনি নিজেই একটি টোল খুললেন। নিজের বাড়িতে

জায়গা না হওয়ায় মুকুন্দ সঞ্জয় নামে জনৈক ধনীর চণ্ডীমণ্ডপে সেই টোল স্থাপিত হ'ল। তখন তাঁর বয়স মাত্র ষোলো বছর।

নবদ্বীপ তখন দেশের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের নিবাস। তাঁদের প্রায় প্রত্যেকেই টোল খুলেছেন। তার ওপর নিমাই নিতান্তই কিশোর। তবু দিন দিন তাঁর ছাত্রসংখ্যা বাড়তে থাকল। এবং কিছুদিনের মধ্যেই নিমাইপণ্ডিতের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তিনি নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজে পরিচিত হয়ে উঠলেন।

আর সেই পরিচিতি ও তাঁর রূপে মুগ্ধ হয়ে বল্লভাচার্য নামে জনৈক পণ্ডিত তাঁর পরমাসুন্দরী কন্যা লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহের প্রস্তাব পাঠালেন। বনমালী নামে একজন ব্রাহ্মণ ঘটক শচীদেবীর কাছে এই সম্বন্ধ নিয়ে এলেন। সব শুনে শচীদেবী মেয়ে দেখতে গেলেন। তাঁর মেয়ে পছন্দ হ'ল। নিমাইও আপত্তি করলেন না। সব শোক ভুলে শচী সানন্দে বিবাহের আয়োজন আরম্ভ করে দিলেন। বহুদিন বাদে তাঁর বাড়ি আবার আনন্দ-নিকেতন হয়ে উঠল। নিমাই বিয়ে করে লক্ষ্মীদেবীকে ঘরে নিয়ে এলেন।

একে পণ্ডিত তার ওপরে বিবাহিত। তবু চঞ্চল প্রকৃতির নিমাইয়ের চাঞ্চল্য কমে না। কেবল অধ্যাপনার সময় টোলে তিনি গম্ভীর হয়ে থাকেন। কিন্তু তারপরেই যখন তিনি ছাত্রদের নিয়ে পথে বের হন, তখুনি আবার সেই দুরন্ত নিমাই। সবচেয়ে বেশি ব্যতিব্যস্ত করেন তাঁর নিজের অঞ্চলের অর্থাৎ চট্টগ্রাম-শ্রীহট্টের মানুষদের আর বৈষ্ণবদের। তাঁদের মধ্যে আবার চট্টগ্রামের মুকুন্দ ও মাধবের ওপর যেন আক্রোশ কিছু বেশি ছিল। ফলে দূর থেকে তাঁরা তাঁকে দেখতে পেলেই শাস্ত্রযুদ্ধের ভয়ে পালাতে চান, কিন্তু নিমাইয়ের নজর এড়াতে পারেন না। নিমাই ছুটে এসে তাঁদের ধরে ফেলেন। বলেন—কোথায় পালাবি? এরপরে আমি তোদের এমনভাবে বাঁধব যে তোরা সারাজীবন আমার বন্দী হয়ে থাকবি।

শিষ্যদের লক্ষ্য করে বলেন—তোমরা দেখবে আমিও বৈষ্ণব হব। কিন্তু ওদের মতো বীর্যহীন বৈষ্ণব নয়। আমি এমন বৈষ্ণব হব যে স্বয়ং শিব এসে আমার দ্বারস্থ হবেন।

এই সময় একদিন শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য শ্রীঈশ্বরপুরী নবদ্বীপে এলেন। তিনি কুমারহট্টের (হালিসহর) মানুষ। তিনি নিমাই পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যের কথা শুনেছিলেন। কিন্তু নবদ্বীপে এসে তাঁর চপলতার কথা জেনে আর তাঁর সঙ্গে দেখা করেন নি। কিন্তু তিনি দেখা করতে না চাইলে কি হবে?

একদিন পথে দুজনের দেখা হয়ে গেল। আর নিমাইকে দেখামাত্র পুরীজী স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। বুঝতে পারলেন, এই তরুণ যোগসিদ্ধ পুরুষ। তিনি অপলক নয়নে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

মৃদু হেসে নিমাই বললেন—শ্রীপাদ, আজ আমার ঘরে ভিক্ষায় চলুন। তাহলে সারাদিন আমাকে প্রাণ ভরে দেখতে পাবেন।

আশ্চর্য, পুরীজী নিমাইয়ের কথায় অসন্তুষ্ট হলেন না। তিনি সানন্দে তাঁর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন।

ঈশ্বরপুরী সর্বদাই কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল হয়ে থাকতেন। তিনি 'শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত' নামে রাধাকৃষ্ণরসঘটিত একখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। সেই গ্রন্থখানি একদিন নিমাইয়ের হাতে দিয়ে বললেন—পণ্ডিত, এই গ্রন্থে কি দোষ আছে আমাকে সরল ভাবে বলে দাও, আমি সংশোধন করে নিই।

নিমাই বললেন—শ্রীকৃষ্ণের কথা, ভক্তের বর্ণন। তাতে দোষ ধরে এমন সাধ্য কার?

কিন্তু ঈশ্বরপুরী নিমাইকে এড়িয়ে যেতে দিলেন না, তিনি তাঁকে বিচার করতে বললেন। বাধ্য হয়ে নিমাইকে গ্রন্থখানি পাঠ করতে হল। অনেক দেখে শুনে তিনি একটি শ্লোকের ভুল ধরলেন।

ঈশ্বরপুরী তখন কোনো উত্তর দিতে পারলেন না। নিমাই চলে যাবার পরে তিনি গ্রন্থখানি খুলে ভাবতে বসে গেলেন। আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে সারারাত বসে ভাবলেন। পরদিন সকলেই গ্রন্থ হাতে নিয়ে ছুটে এলেন নিমাইয়ের কাছে। সেই শ্লোকটি বের করে নিমাইকে দেখিয়ে বললেন—তুমি পরস্মৈপদী করতে বলছ, আর আমি আত্মনেপদী করেছি। আমার ভুল কোথায়?

নিমাই আবার শ্লোকটি পাঠ করলেন। এবারে তাঁকে নীরব হতে হ'ল। নিমাই জীবনে প্রথম পরাজিত হলেন।

কয়েকদিন পরে ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপ ছেড়ে চলে গেলেন। কিন্তু তাঁর স্মৃতি নিমাইয়ের মনে অক্ষয় হয়ে রইল।

এই এক মজা হয়েছে। ভক্তদের সঙ্গে ভক্তিপথ পরিক্রমা করলেও আমি যে একজন নিতান্তই ভক্তিহীন-অবৈষ্ণব, একথাটি কেবলি ভুলে যাচ্ছি। নইলে আমার এমন অনধিকার চর্চা কেন? আমি পথের মানুষ। পথের দিকে নজর না দিয়ে মহাপ্রভুর মহাজীবন নিয়ে আমার এত ভাবনা কেন? কি জানি, হয়তো সঙ্গগুণে এমনটি হচ্ছে। সৎসঙ্গের প্রভাব পড়েছে আমার মনে। তাই

বার বার পথের দিকে নজর না দিয়ে মহাপ্রভুর কথা ভেবে চলেছি।

কিন্তু তাঁর কথা আর নয়, এবারে পথের দিকে নজর দেওয়া যাক। বড় রাস্তা ধরে মাইল চারেক এগিয়ে আমরা এইমাত্র কলাতলা বাসস্টপে পৌঁছলাম। এখন বেলা একটা। এখান থেকে বাঁদিকে একটি মাটির রাস্তা ধরতে হল। আমরা দক্ষিণে চলেছি।

গাঁয়ের পথ হলেও, বেশ চওড়া এবং সমতল। পথের পাশে গাছপালা ও ক্ষেত। মাঝে মাঝে দুয়েকখানি ঘর। কীর্তন শুনে ঘরের মানুষ পথে বেরিয়ে এসেছেন, কেউবা পথের ওপরে দণ্ডবৎ করছেন। গৌড়মণ্ডল আজও গৌরভূমি।

সুবর্ণবিহার ও গৌরাঙ্গনগর কৃষ্ণনগর থানায়। আমরা নবদ্বীপ থানা থেকে কৃষ্ণনগর থানায় চলে গিয়েছিলাম, আজ আবার নবদ্বীপ থানায় ফিরে এলাম। কলাতলা অর্থাৎ মাজদিয়া নবদ্বীপ থানায়। কিন্তু আমাদের নবদ্বীপ ফিরে যেতে এখনও অনেক দেরি। সুতরাং নবদ্বীপের কথা থাক। কেবল রসময়দার কথাটি বলে নিই। রসময়দা আজ নবদ্বীপ থেকে গঙ্গা পার হয়ে মাজদিয়ায় আমাদের সঙ্গে মিলিত হবেন।

হঠাৎ প্রভুপাদ পেছন ফিরে ইসারা করেন। তাড়াতাড়ি ভিড় ঠেলে তাঁর কাছে আসি। আমার কাঁধে একখানি হাত রেখে পথ চলতে চলতে বলেন, "গাজনতলায় তথা মাজদিয়ায় এলাম। একটু বাদেই আজকের মতো যাত্রা বিরতি। আজ তোমরা এগারো মাইল হাঁটলে, গোদ্রুমদ্বীপ থেকে মধ্যদ্বীপে এলে। মাজদিয়ার প্রাচীন নাম মধ্যদ্বীপ।"

"আমরা আজ কোথায় থাকব বাবা!" পাশের থেকে মানসী বলে ওঠে। আমাকে প্রভুপাদের কাছে আসতে দেখে, সেও যেন কখন তাঁর কাছে চলে এসেছে।

"স্কুলে।" প্রভুপাদ উত্তর দেন।

মানসী আবার জিজ্ঞেস করে, "আচ্ছা বাবা, আমাকে একজন বলেছে, এই গ্রামে নাকি প্রাচীনকাল থেকে একটা অলৌকিক লীলা চলেছে?"

প্রভুপাদ মাথা নাড়েন। মানসী পুলকিত হয়ে ওঠে। সে যে গল্পের গন্ধ পেয়েছে। বলে "তাহলে কৃষ্ণাকে ডাকি।"

"কেন বল তো?" প্রভুপাদ না বোঝার ভান করেন।

মানসী বলে "আপনি কাহিনীটা বলবেন।"

এবারে প্রভুপাদ হেসে ফেলেন। বলেন, "বেশ ডাকো।"

মানসীর ইসারায় কৃষ্ণা ছুটে আসে। প্রভুপাদ মানসীকে বলেন, "তুমি শুধু গল্প ভালোবাসো তা নয় মা, তুমি অন্তর্যামী।"

"এ কি বলছেন বাবা!" মানসী অপ্রস্তুত।

প্রভুপাদ উত্তর দেন, "আমি ঠিকই বলছি মা! সেই অলৌকিক লীলার কথা বলব বলেই আমি ঘোষবাবাকে কাছে ডেকেছিলাম।"

"এরকম পক্ষপাতীত্ব করা কি উচিত হচ্ছে বাবা?" মানসীর কণ্ঠস্বরে অভিমান।

"না না, তোমাদেরও ডাকতাম বৈকি!" প্রভুপাদ জবাবদিহি করেন।

মানসীর অভিমান দূর হয়, সে বলে, "তাহলে ঠিক আছে। এবারে শুরু করুন।" তার আর তর সইছে না।

প্রভুপাদও কথা না বাড়িয়ে শুরু করেন "এখানে একটি বেশ বড় পুকুর আছে। তার নাম হংসবাহন সরোবর। সেইখানেই অনন্তকাল ধরে গাজনের সময় সেই লীলা চলেছে। আর তাই মাজদিয়া গ্রামের এই অংশের নাম গাজনতলা।"

একবার থামেন প্রভুপাদ। কিন্তু আমরা কেউ কোনো প্রশ্ন করতে পারার আগেই আবার শুরু করেন, "প্রতিবছর গাজনের সময় সন্ন্যাসীরা এই সরোবরের তীরে আসেন। গ্রামের ঢাকীরাও তাঁদের সঙ্গে আসে। আসেন বহু ভক্ত। ঢাকীরা ঢাক বাজাতে আরম্ভ করে। আর সন্ন্যাসীরা একাগ্র চিত্তে হংসবাহন মহাদেবের আরাধনা শুরু করেন। তাঁরা তাঁকে আবির্ভূত হবার জন্য প্রার্থনা জানাতে থাকেন।

এইভাবে কিছুক্ষণ কেটে যাবার পরে সহসা সরোবরের জলে কোনো একটা জায়গায় বুদ্‌বুদ্‌ দেখা দেয়। সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসীদের প্রধান সেই জায়গায় লাফিয়ে পড়েন। তারপরে শুরু হয় সন্ন্যাসীর সঙ্গে মহাদেবের জলক্রীড়া, এক কথায় লুকোচুরি খেলা। বুদ্‌বুদ্‌ দেখে সন্ন্যাসী যেখানেই ছুটে যান, হংসবাহন সেখান থেকে পালিয়ে যান অন্য জায়গায়। সেখানে বুদ্‌বুদ্‌ ওঠে। সন্ন্যাসী আবার ছুটে যান। কিন্তু তাঁকে ধরতে পারেন না। কখনও বা সন্ন্যাসীর হাত ফসকে তিনি পালিয়ে যান। পাথরের মূর্তি তো নয়, এ যেন পানকৌড়ি জলকেলি করছে। বেশ কিছুক্ষণ এইভাবে জলক্রীড়া চলতে থাকে। সরোবরের তীরে দাঁড়িয়ে থাকা শত শত মানুষ হংসবাহন মহাদেবের এই অপরূপ লীলা দর্শন করেন।

অবশেষে একসময় হংসবাহন মহাদেব সরোবরের কোনো তীরের কাছে

এসে হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে যান। অর্থাৎ ভোলানাথ ভক্তের কাছে আত্মসমর্পণ করেন।

সন্ন্যাসী-প্রধান তাড়াতাড়ি সেখানে ছুটে গিয়ে মহাদেবের মূর্তিটিকে দুহাত দিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরেন। ঢাকের বাজনা চরমে ওঠে। মহাদেবের জয়ধ্বনিতে গাজনতলার আকাশ-বাতাস ব্যপ্ত হয়।

প্রধান তারপরে হংসবাহন মহাদেবের মূর্তিটিকে মাথায় তোলেন। শ্বেত-পাথরের ভারী সুন্দর বিগ্রহ।

শুরু হয় শোভাযাত্রা। সে শোভাযাত্রা কখনও থামে না। আর সর্বদা মহাদেবের মাথায় জল ঢালতে হয়। ঢাক বাজিয়ে ও জয়ধ্বনি করে শোভাযাত্রা এগিয়ে চলে। গাজনতলা থেকে যাত্রা করে গঙ্গাতীরে, গঙ্গা পার হয়ে নবদ্বীপ। মহাপ্রভুর মন্দির সহ সারা নবদ্বীপ পরিক্রমা করে। পথে কোথাও কোথাও মহাদেবের ভোগ হয়। কিন্তু শোভাযাত্রা থামে না। চলতে চলতে পূজা, চলতে চলতেই ভোগ। তেমনি বন্ধ হয় না মহাদেবের মাথায় জলঢালা—তিনি যে হংসবাহন, জলাধিপতি।

নবদ্বীপ পরিক্রমার পরে শোভাযাত্রা ফিরে আসে গাজনতলায়, হংসবাহন সরোবরের তীরে। সেখানে পৌঁছে সচল শিব কিছুক্ষণের জন্য অচল হন। শিবপূজা হয়। ভক্তরা ভোলানাথের কাছে নানা প্রার্থনা করেন।

তারপরে আবার তেমনি ঢাক বাজিয়ে, জয়ধ্বনি করে হংসবাহন মহাদেবকে হংসবাহন সরোবরের সলিলে মুক্ত করে দেওয়া হয়। বিদায় বেলায় সমবেত ভক্তবৃন্দ করজোড়ে মিনতি করেন—ঠাকুর তুমি আগামীবছর আবার আমাদের দর্শন দিও।"

থামলেন প্রভুপাদ। আমাদের চমক ভাঙ্গে। কিন্তু কেউ কোনো কথা বলতে পারি না। নীরবে পথ চলতে থাকি। কেটে যায় কিছুক্ষণ। তারপরে প্রভুপাদ আবার বলেন, "আমরা, গৌড়মণ্ডলের মানুষরা বিশ্বাস করি, যদি কখনও হংসবাহন মহাদেবের এই বাৎসরিক আবির্ভাব বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে দেশ ও জাতির মহাদুর্দিন আসবে ঘনিয়ে।"

একটা তেরাস্তার মোড়ে এসে শোভাযাত্রা থেমে গেল—হংসবাহন মহাদেবের শোভাযাত্রা নয়, আমাদের সংকীর্তন শোভাযাত্রা। আমাদের 'গাইড' গৌরবাবু ও 'লিয়েজন্' কানু দাঁড়িয়েছিল এখানে। তারাই হাত নেড়ে থামতে বলেছে। শুধু তারা দুজন নয়, তাদের সঙ্গে আরও কয়েকজন স্থানীয় ভদ্রলোক।

তাঁরা প্রভুপাদের কাছে আসেন। তাঁকে প্রণাম করেন। তারপরে জনৈক প্রৌঢ় করজোড়ে বলেন, "বাবা, আমাদের আবেদন আপনাকে মঞ্জুর করতেই হবে।"

"বেশ তো!" প্রভুপাদ সহাস্যে উত্তর দেন, "বলুন, আমাকে কি করতে হবে।"

"আপনাকে আমাদের সেবার অধিকার দিতে হবে। আমাদের প্রার্থনা, স্কুলে না গিয়ে এই বারোয়ারী মণ্ডপে মদনমোহন আসন গ্রহণ করুন, এখানেই পাঠ-কীর্তন হোক।"

"কিন্তু আমরা যে অনেক লোক, থাকব কোথায়?" প্রভুপাদ মৃদু আপত্তি করেন।

সঙ্গে সঙ্গে আরেকজন বৃদ্ধ বলে ওঠেন, "আমাদের বাড়িতে বাড়িতে। হয়তো একটু অসুবিধে হবে আপনাদের কিন্তু আমরা বড়ই আনন্দ লাভ করব।"

কথাবার্তা শুনে বুঝতে পারছি এঁরা দুজনেই রুচিবান ও শিক্ষিত মানুষ। প্রভুপাদ তবু আপত্তি করেন। বলেন, "আপনাদের গ্রামে যখন ভাল স্কুলবাড়ি রয়েছে, তখন কেন আপনারা অযথা এই কষ্ট স্বীকার করে নিচ্ছেন?"

"প্রথম কথা স্কুলটা গ্রামের প্রান্তে। সেখানে আপনারা থাকলে আমরা সর্বদা আপনাদের সেবা করতে পারব না। দ্বিতীয়তঃ আমাদের কোনো কষ্ট হবে না।" বৃদ্ধ ভদ্রলোক বলে ওঠেন, "তাছাড়া আপনার অনুমতি না নিয়েই আমি একটা কাজ করে ফেলেছি বাবা!"

"কী?" প্রভুপাদ প্রশ্ন করেন।

"আমার বাড়িতে আপনাদের রান্নার ব্যবস্থা করেছি। গৌরবাবু ও কানুবাবু আপত্তি করেছিলেন, কিন্তু আমি তাঁদের কথা শুনি নি। স্কুলে আপনাদের অসুবিধে হ'ত বাবা!"

তার মানে ব্যবস্থা যা করার, তা এঁরা করেই ফেলেছেন, এখন শুধু প্রভুপাদের আনুষ্ঠানিক অনুমতির অপেক্ষা। সুতরাং সহাস্যে প্রভুপাদ বলেন, "আপনারা যা করেছেন, তা আমাদেরই জন্য। আমি এতে আপত্তি করব কেন? নিতাই-গৌরের যেমন ইচ্ছে, তেমনি হয়েছে।"

"জয় গৌর, জয় নিতাই!" সহযাত্রীরা সমবেত স্বরে জয়ধ্বনি দিয়ে ওঠেন। শোভাযাত্রা শেষ হয়।

বেচারী গৌরবাবু ও কানু এতক্ষণ ভয়ে ভয়ে দাঁড়িয়েছিল। তারা প্রভুপাদের অনুমতি না নিয়েই গ্রামবাসীদের দাবী মেনে নিয়েছিল। এবারে

তাদের ভয় দূর হয়। কানু বলে, "আমরা থাকব বলে স্কুল দুদিন ছুটি পর্যন্ত দিয়ে..."

বৃদ্ধ ভদ্রলোক তাকে শেষ করতে দেন না। তিনি একটু হেসে বলেন, "আমি এবং আমার ছেলে দুজনেই ঐ স্কুলে শিক্ষকতা করি। ছুটির নোটিশ দেখেই তো আমরা জানতে পারলাম, আপনারা আসছেন। যাক্ গে ছেলে-মেয়েগুলো দুটোদিন ফাউ ছুটি পেয়ে গেল!"

ম্যানেজার গৌরদা ও দত্তবাবুকে প্রভুপাদ প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে এগিয়ে চলেন বারোয়ারী মণ্ডপে। সহযাত্রীরাও চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছেন। আমি একা দাঁড়িয়ে থাকি তেমাথার মোড়ে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গ্রামটিকে দেখি। এখান থেকে তিনটি মাটির পথ তিনদিকে প্রসারিত। একটি পথ গিয়েছে বড় রাস্তায় আর দুটি গাঁয়ের ভেতরে। পথের দুদিকে বাড়ি-ঘর। অধিকাংশই মাটির দেওয়াল আর খড়ের চাল। টালি আর টিনের বাড়িও রয়েছে। পাকাবাড়ি চোখে পড়ছে না। তার মানে মাজদিয়া গণ্ডগ্রাম না হলেও দরিদ্র গ্রাম।

তা হোক্ গে। ইতিমধ্যেই আমি গ্রামবাসীদের মনের যে ঐশ্বর্যের সন্ধান পেয়ে গেছি, তাতে এ গ্রামে আসতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। তাঁরা তাঁদের বুকের সবটুকু ভালোবাসা আমাদের উজার করে দিয়েছেন। মহাপ্রভু, তুমি অশেষ করুণাময়! তুমি আমাদের এমন অনাবিল ভালোবাসার অধিকারী করলে। তোমাকে প্রণাম, শত-সহস্র প্রণাম।

মাষ্টারমশায়ের বাড়ির বারান্দায় বসে প্রসাদ পাওয়া গেল। তাঁর তরুণী পুত্রবধূ প্রসাদ পরিবেশন করল। আর তখুনি জানিয়ে দিল কৃষ্ণা ও মানসী রাতে তার ঘরে থাকবে। অতএব তাদের আর আশ্রয় ভিক্ষায় বেরুবার দরকার হবে না।

প্রসাদের পরে আমি তাই নিশ্চিন্ত মনে দত্তবাবুর সঙ্গে পথে বের হই। আমরা আশ্রয় ভিক্ষায় চলেছি। বারোয়ারী মণ্ডপ থেকে সোজা পথে এগিয়ে চললাম। সহযাত্রীরা অনেকেই আমাদের আগে বেরিয়ে পড়েছেন। তাঁরা কাছের বাড়িগুলোতে আশ্রয় পেয়েছেন। আমরা এগিয়ে চলি। বেশ কয়েকটি বাড়ি ছাড়িয়ে আসি। তারপর ডানদিকে একখানি বাড়ি দেখিয়ে দত্তবাবু বলেন, "চলুন, এই বাড়িতে একবার দেখা যাক।"

পথের পাশে পাটকাঠির বেড়া। তারই মাঝে বাঁশের খুটি আর দরমার দরজা। আমরা সেই দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকি। অনেকটা জায়গা নিয়ে বাড়ি। ডানদিকে অর্থাৎ বাড়ির দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্ত জুড়ে একসারিতে তিনখানি পৃথক পৃথক ঘর। মাটি ও খড়ের ঘর। বেশ উঁচু ভিৎ। সামনে খোলা দাওয়া। মনে হচ্ছে পৃথক অন্ন হলেও এক পরিবার। ভাই কিম্বা ভাইপোরা পিতৃপুরুষের এক বাড়িতে বসবাস করছেন।

বাড়ির বাকি অংশ জুড়ে কয়েকটা ফুল ও ফলের গাছ। একেবারে পশ্চিমদিকে একটা বেশ বড় গোয়াল। কয়েকটা গরু দেখতে পাচ্ছি। আর রয়েছে একটা টিউব্‌ওয়েল। মনে হচ্ছে গৃহস্বামীদের অবস্থা মন্দ নয়। রুচিও খারাপ নয়। কারণ বাড়িখানি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

আমরা প্রথম ঘরখানির সামনে আসি। দেখি আমাদের সহযাত্রী ভীম-গৌর তার পরিবার পরিজনদের নিয়ে দাওয়াটি দখল করেছে। আগেই বলেছি আমাদের দলে তিনজন গৌর রয়েছে। পাছে এক গৌরের সঙ্গে আরেক গৌরের গোলমাল হয়ে যায়, তাই প্রভুপাদ তাদের এমনি নাম দিয়েছেন। বড়সড় স্বাস্থ্যবান চেহারা বলে এর নাম ভীমগৌর।

আমাদের দেখতে পেয়ে গৌর দাওয়া থেকে নেমে আসে। বলে, "আপনারা বুঝি জায়গা খুঁজতে বেরিয়েছেন?"

"হ্যাঁ।" দত্তবাবু উত্তর দেন। জিজ্ঞেস করেন, "এ বাড়িতে জায়গা পাওয়া যাবে কি?"

"পাবেন বৈকি, নিশ্চয়ই পাবেন। ঐ শেষঘরে চলে যান, ওখানে কেউ আসে নি এখনও।"

শেষ অর্থাৎ তৃতীয় ঘরখানির দিকে এগিয়ে চলি। কিন্তু দ্বিতীয় ঘরখানির সামনে এসে একবার থমকে দাঁড়াতে হয়। আমাদের দলের এক যুবক দম্পতি ঠাঁই নিয়েছে এখানে। তারা ঘরের মধ্যে ঘর বানিয়ে ফেলেছে। শাড়ী ধুতি চাদর যা ছিল, তাই দিয়ে খোলা দাওয়ার তিনদিক ঘিরে ফেলেছে। এতে মাঘের শীত কতটা মানবে বলতে পারছি না। তবে বেশ বুঝতে পারছি তারা নিজেদের আড়াল করতে সমর্থ হয়েছে। রসিক দম্পতি।

একটু এগিয়ে তৃতীয় ঘরের সামনে পৌঁছই। উঠানে দাঁড়িয়ে ডাক দিতেই জনৈক বৃদ্ধ ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। তাঁর কাছে দত্তবাবু আশ্রয় ভিক্ষে করেন।

বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি হাতজোড় করে সবিনয়ে বলেন, "এমনভাবে বলবেন না

বাবু, আমাদেব পাপ হবে। আপনারা পরিক্রমায় বের হয়েছেন, আপনাদের জায়গা দিতে পারলে আমারই পুণ্যি। কিন্তু আমরা গাঁয়ের গরীব মানুষ, আমাদের সাধ্যি কি আপনাদের সেবা করি। এই তো দেখছেন ঘরদোরের হাল। এই ঘরে আটজন মানুষ থাকি, তার ওপরে দুটো ছাগল আছে। সে দুটোকেও ঘরে না রাখলে শেয়াল আসে। কেবল দাওয়াটা খালি আছে। কিন্তু শীতকাল, আপনাদের ঠাণ্ডা লাগবে যে!"

"লাগবে না।" দত্তবাবু বলেন, "আমরা পরিক্রমায় বেরিয়ে খোলা আকাশের নিচে রাত কাটিয়েছি। এখানে তো মাথার ওপরে একটা চাল থাকবে।"

"তাহলে থাকুন।" বৃদ্ধ বলেন, "আমার নাতি গরু চড়াতে গেছে। ফিরে এসে চাটাই টানিয়ে খড় বিছিয়ে দেবে, তাতে ঠাণ্ডা কম লাগবে। আপনারা বসুন! ওরে মালতী, একটা চাটাই দে!"

একটুবাদে বারো-তেরো বছরের একটি শাড়ী পরা মেয়ে একখানি মাদুর এনে দাওয়ায় পেতে দেয়। আমরা বসে পড়ি। বৃদ্ধ মালতীকে বলেন, "বাবুদের জন্য দু-বাটি গরম দুধ নিয়ে আয়!"

"না, না। দুধের দরকার নেই।" আমরা সোচ্চার স্বরে প্রতিবাদ করে উঠি। বলি, "একটু আগে প্রসাদ পেয়েছি। এখন কিছু খেতে পারব না।"

"বাবু, আমরা জাতে গয়লা। আমাদের বাড়ি কেউ এলে আমরা তাঁকে গরম দুধ খেতে দিই।" বৃদ্ধ আবার হাতজোড় করেন। বলেন, "আপনারা অতিথি নারায়ণ। এটুকু সেবা না করতে পারলে যে আমার পরিবারের অকল্যাণ হবে বাবু!"

এরপরে আর কি বলব? আমি দত্তবাবুর দিকে তাকাই। তিনি মৃদু হেসে কানে কানে বলেন, "উপায় নেই ঘোষদা, আপনি গৃহস্থকে নারায়ণ-সেবা থেকে বঞ্চিত করতে পারেন না।"

বিনা মন্তব্যে দত্তবাবুর কথাটা মেনে নিই। মনে মনে ভাবি—গৌড়মণ্ডল পরিক্রমায় বেরিয়ে প্রায় প্রতিদিন আমাকে আমার অধঃপতিত দরিদ্র দেশবাসীর ভালোবাসার দান এমনি করে মাথায় তুলে নিতে হচ্ছে। অভাব অশিক্ষা আর অসাধুতা আজও এদের শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাব মুক্ত করতে পারে নি। সুতরাং দেশ ও দেশবাসী সম্পর্কে নিরাশ হয়ে পড়ার কোনো কারণ নেই। আমার বুকখানি পরম প্রশান্তিতে পূর্ণ হয়ে ওঠে।

॥ বারো ॥

বারোয়ারী মণ্ডপের সামনে তে-রাস্তার মোড়ে সামিয়ানা টাঙানা হচ্ছে। সন্ধ্যা-রতির পরে পাঠ-কীর্তন ও গানের আসর বসবে। সামিয়ানা টাঙাচ্ছে মাইক-ম্যান্ চন্দ্রা, সাইকেল ভ্যানের চালক সুশান্ত, রতন দুলাল কাশীনাথ ও ভীমগৌর।

আমাদের দলে তিনজন গৌর আছেন। বুঝতে যাতে অসুবিধে না হয়, তাই প্রভুপাদ তাঁদের নূতন নাম রেখেছেন—গাইড্ গৌর, ম্যানেজার-গৌর ও ভীমগৌর। সোজা সরল স্বাস্থ্যবান মানুষ ভীমগৌর। খুবই উৎসাহী কর্মী। নইলে এ বয়সে গাছে উঠবে কেন? তবে ঐ চেহারা নিয়ে তার গাছে না ওঠাই বোধকরি ভাল ছিল!

আগেই বলেছি, সন্ধ্যার পরে এই সামিয়ানার নিচে পাঠ-কীর্তনের আসর বসবে। আজ আবার রামায়ণ গান হবে। রসময়দা নবদ্বীপ থেকে এসে গিয়েছেন। এবং তিনি একা আসেন নি। জীবনদাদুকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন।

জীবনদাদুও প্রভুপাদ। তবু আমরা তাঁকে দাদু বলেই ডাকি। কারণ তিনি প্রভুপাদের কাকা। বয়সে অবশ্য প্রভুপাদের চেয়ে সামান্যই বড়। নবদ্বীপেই থাকেন। ভারী রসিক ও স্নেহপ্রবণ মানুষ। ভাইপোকে সাহায্য করার জন্য সব কাজ ফেলে ছুটে এসেছেন।

ওরা সামিয়ানা টাঙাচ্ছে। আমি পথের পাশে দাঁড়িয়ে রসময়দা ও জীবনদাদুর সঙ্গে কথা বলছিলাম। হঠাৎ রসময়দা বলেন, "মহারাজ, বৌমা আপনাকে ডাকছেন।"

তাড়াতাড়ি পেছনে ফিরি। একটু দূরে মানসী দাঁড়িয়ে আছে। আমি তার কাছে আসি। সে জিজ্ঞেস করে, "জায়গা পেয়েছো?"

"পেয়েছি।"

"কোথায়?"

"বেশি দূরে নয়, কাছেই।" আমি ইসারা করে বাড়িটা বুঝিয়ে দিই।

সে জিজ্ঞেস করে, "ঘর, না বারান্দা?"

"বারান্দা। তাহলেও তেমন ঠাণ্ডা লাগবে না, ওঁরা খড় বিছিয়ে চাটাই টাঙিয়ে দেবেন।"

"হ্যাঁ, একেবারে 'এয়ার কণ্ডিশ্‌নড কোয়ার্টার্স' যোগাড় করে এসেছো।"

চুপ করে থাকি। সে আবার বলে, "কিন্তু এখন তো সে কোয়ার্টার্সে নেই, এখন যে খোলা আকাশের নিচে মেটোপথে দাঁড়িয়ে আছো। তাহলে জুতো পরো নি কেন?"

অপ্রস্তুত হয়ে পড়ি। কোনমতে সামলে নিয়ে বলি, "আমার চপ্পল তো তোমার থলেতে।"

"তাই তো আমি প্রসাদের পর থেকে তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, কিন্তু তোমার সে খেয়াল আছে কি?"

"না।" একটু হেসে ওকে শান্ত করতে চাই। বলি, "তুমি যখন সঙ্গে এসেছো, তখন তো আমার খেয়াল রাখার কথা নয়।"

"থাক্ গে, আর ওকালতি চাল চালতে হবে না। এবারে চলো, মাষ্টারমশায়ের বাড়িতে গিয়ে পা ধুয়ে চপ্পল পরে আর চা খেয়ে আমাকে ধন্য করবে।"

রসময়দা ও জীবনদাদুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মানসীর সঙ্গে মাষ্টারমশায়ের বাড়িতে আসি। সে সোজা আমাকে কলতলায় নিয়ে আসে। তারপরে বাড়ির ভেতরে গিয়ে আমার চপ্পল আর গামছা আনে। সে টিউব্‌ওয়েল পাম্প্‌ করে, আমি পা ধুয়ে চপ্পল পরে নিই।

আর ঠিক তখুনি কৃষ্ণা এসে খবর দেয়, "ঘোষদা, মদনদা আপনাকে ডাকছে।"

আগেই বলেছি কৃষ্ণা প্রভুপাদকে মদনদা বলে। তার মানে প্রভুপাদ আমাকে ডাকছেন। অতএব মানসী ও কৃষ্ণার সঙ্গে মাষ্টারমশায়ের ঘরে আসি।

মাষ্টারমশাই ও অন্যান্য কয়েকজন গ্রামবাসীর সঙ্গে বসে কথা বলছিলেন প্রভুপাদ। তিনি আমাদের বসতে বলেন। তারপরে জিজ্ঞেস করেন, "রাতের আশ্রয় পেয়েছো?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।" উত্তর দিই।

একটু হেসে প্রভুপাদ মানসীর দিকে তাকান। বলেন, "তোমাকে বলি নি মা! দত্ত যখন সঙ্গে নিয়ে গেছে, তখন আশ্রয় পেতে অসুবিধে হবে না। যাক্ গে, এবারে তো নিশ্চিন্ত হলে!"

মানসী মাথা নিচু করে। কৃষ্ণা মৃদু হাসে।

একটি তরুণী বধূ এক কাপ চা নিয়ে ঘরে ঢোকে। মাষ্টার মশায়ের পুত্রবধূ, তার স্বামীও শিক্ষক।

মেয়েটি সামনে এসে আমাকে বলে, "আপনার চা।"

একটু অবাক হই। বলি, "একা আমার জন্য!"

"সবার খাওয়া হয়ে গেছে।" মেয়েটি বলে।

হাত বাড়িয়ে কাপটা নিই। বলি, "তাহলে আর আমার একার জন্য চা না বানালেই হত।"

"না, হত না।" মেয়েটি বলে, "দিদির কাছে শুনলাম আপনার নাকি চা না খেলে ঘুম হয় না।" মানসীর দিকে একবার তাকিয়ে হাসিমুখে মেয়েটি ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

প্রভুপাদ আবার একটু মুচকি হাসেন। আমি নিঃশব্দে চায়ে চুমুক দিই। তবে মনে মনে ভাবি, জীবনে এত আঘাত সয়েও যে এমন সংযমী, সে আমার সুখ-সুবিধের জন্য এত অস্থির হয়ে পড়ে কেন? এরই নাম কি ভালোবাসা? কিন্তু কে আমাকে এ প্রশ্নের উত্তর দেবে?

ছুটতে ছুটতে রতন ঘরে ঢোকে। বলে, "বাবা, বিপদ হয়ে গেছে। সামিয়ানা টাঙিয়ে গাছ থেকে নামার সময় গৌরদা পড়ে গেছেন। তাঁর পা কেটে গেছে। ভীষণ রক্ত পড়ছে।"

"সেকি! কোন্ গৌর?" প্রভুপাদ বলে ওঠেন।

"ভীমগৌর।" আমি বলি। রতন মাথা নাড়ে।

"তুমি জানলে কেমন করে? তুমি তো এখানে।" প্রভুপাদ জিজ্ঞেস করেন।

উত্তর দিই, "আমি তাকে গাছে উঠতে দেখে এসেছি।"

প্রভুপাদের সঙ্গে সবাই ছুটে আসি অকুস্থলে। দেখি ভীম ধরাশায়ী। তার পা দিয়ে অঝোরে রক্ত ঝরছে। কানু কাশীনাথ চন্দ্রা সুশান্ত এবং আরও অনেকে এখানে রয়েছে। তারা গাঁদাফুল গাছের পাতা থেৎলে নিয়ে কাটা জায়গায় চেপে ধরে রক্ত বন্ধ করার চেষ্টা করছে। কিন্তু কোনো ফল হচ্ছে না।

প্রভুপাদ জিজ্ঞেস করেন, "দত্ত কোথায়?"

"তিনি ও তাঁর ভাই মালপত্র নিয়ে তাঁদের আশ্রয়ে গেছেন।" দুলাল উত্তর দেয়।

"পুলিনবাবুকে খবর দিয়েছিস?"

"আজ্ঞে না।"

"তাকে তাড়াতাড়ি ডেকে নিয়ে আয়।"

পুলিনবাবু মানে ডাঃ পুলিনবিহারী ভৌমিক। প্রভুপাদের শিষ্য। আমাদের

সঙ্গে যাত্রায় এসেছেন। চা বাগানের ডাক্তার ছিলেন। এখন অবসর নিয়ে হালিসহরে প্রাক্‌টিস করছেন।

একটু বাদেই ডাক্তারবাবু ছুটে আসেন। ভীমের পায়ের কাটা জায়গাটা পরীক্ষা করে বলেন, "স্টীচ্ করে ইঞ্জেক্‌শন দিতে হবে। একে আমার ঘরে নিয়ে যাই বাবা!"

"তুমি কোথায় আশ্রয় পেয়েছো?"

ডাক্তারবাবু বাড়িটা দেখিয়ে দেন। খুবই কাছে। তবু প্রভুপাদ জিজ্ঞেস করেন, "নেবে কেমন করে, ভীমের শরীরটা তো ছোট নয়।"

"আমি নিজেই হেঁটে যেতে পারব বাবা।" ভীম কানুর কাঁধে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

"তা পারবি, আমি জানি তুই যেতে পারবি। বেশ যা, সাবধানে যা।" প্রভুপাদ অনুমতি দেন।

কানু ও কাশীনাথের কাঁধে ভর দিয়ে ভীম এগিয়ে চলে। চলতে চলতে আবার বলে, "আমি আরতির আগেই মন্দিরে আসছি বাবা!"

"বেশ তো! তুই আসার পরেই আরতি আরম্ভ করব।"

তাই হয়েছে। পায়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে ভীমগৌর ফিরে আসার পরে প্রভুপাদ সন্ধ্যারতি শুরু করেছেন। আরতির পরে জীবনদাদু দু'খানি গান গেয়েছেন। ইতিমধ্যে গ্রামবাসীদের ভিড়ে সামিয়ানা ভরে গিয়েছে। আমার সহযাত্রীরা যথারীতি বাইরে দাঁড়িয়ে জীবনদাদুর গান শুনেছেন। এবারে প্রভুপাদ পাঠ শুরু করেছেন। বলছেন—"ভক্তবৃন্দ, আজ আমরা এই গৌরকথার আসরে শ্রীগৌরাঙ্গের পূর্ববঙ্গ ভ্রমণ, লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবীর অকালমৃত্যু, দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের পরাজয়, শ্রীবাস ও শ্রীধরের সঙ্গে মহাপ্রভুর মিলন এবং বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর বিবাহের পুণ্য কাহিনী কীর্তন করব।"

একবার থামেন তিনি। তারপরে বলতে শুরু করেন, "নিমাই তখন সুদর্শন ও স্বাস্থ্যবান তরুণ। তার ওপরে তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ছে। তিনি নবদ্বীপের বিদগ্ধ সমাজে সুপরিচিত হয়ে উঠছেন। এই সময় একদিন হঠাৎ তিনি মাকে বললেন—মা আমি পূর্ববঙ্গ ভ্রমণে যাবো।

মা প্রথমে রাজী হলেন না। কিন্তু নিমাইকে নিবৃত্ত করার সাধ্য তাঁর কোথায়? মাকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে লক্ষ্মীপ্রিয়াকে মায়ের কাছে রেখে নিমাই

শেষ পর্যন্ত রওনা হলেন পূর্ববঙ্গে। কয়েকজন শিষ্য তাঁর সঙ্গে চলল।

অনেকে বলেন এই ভ্রমণের সময় নিমাই তাঁর পিতৃভূমি শ্রীহট্টে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর জ্যাঠতুতো ভাই প্রদ্যুম্ন মিশ্র রচিত 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চন্দ্রোদয়াবলী' গ্রন্থে দেখতে পাই তিনি সেখানে যান নি।

ভক্তবৃন্দ, আপনারা সবাই জানেন, নবদ্বীপে নিমাই বৈষ্ণবদের বিদ্রূপ করতেন। কিন্তু তাঁর এই পূর্ববঙ্গ ভ্রমণের বর্ণনায় শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থে বলা হয়েছে—তিনি হরিনামের নৌকো সাজিয়ে সজ্জন দুর্জন, আচারী বিচারী, পতিত ও অধম সবাইকে পার করেছিলেন।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে বলা হয়েছে—মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই নিমাই পূর্ববঙ্গকে হরিনামে উন্মত্ত করেছেন।

পূর্ববঙ্গ ভ্রমণের সময় একদিন তপন মিশ্র নামে একজন ভক্তব্রাহ্মণ এসে তাঁকে দণ্ডবৎ করে বললেন—আমি স্বপ্নে জেনেছি, আপনি পূর্ণব্রহ্ম সনাতন। আপনি আমাকে উদ্ধার করুন।

নিমাই তাড়াতাড়ি জিভে কামড় দিয়ে বললেন—"ছিঃ ছিঃ একথা বলতে নেই। জীবে ভগবৎ বুদ্ধি মহাপাপ। তুমি 'হরেকৃষ্ণ' মন্ত্র জপ কর আর কাশীবাসী হও। সেখানে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে।"

একবার থামলেন প্রভুপাদ। তারপরে বললেন, "ভক্তবৃন্দ, এই ঘটনাটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ তখন পর্যন্ত তাঁর সন্ন্যাস গ্রহণ কিংবা গৃহত্যাগের কোনো পরিকল্পনা ছিল না বলেই মনে হয়। আরেকটা মজার ব্যাপার পূর্ববঙ্গ ভ্রমণের সময় ব্যাকরণের তরুণ অধ্যাপক সবাইকে হরিনামে পাগল করলেও নবদ্বীপে ফিরে তিনি কিন্তু আবার সেই দুরন্ত নিমাই।

যাক্ গে যেকথা বলছিলাম, কয়েকমাস পরে নিমাই পূর্ববঙ্গ থেকে নবদ্বীপে ফিরে এলেন। ভক্তদের দেওয়া সমস্ত উপহার মায়ের পায়ের কাছে রেখে তিনি গঙ্গায় স্নান করতে গেলেন।

ফিরে এসে লক্ষ্য করলেন, মায়ের মুখখানি মলিন। বললেন—মা, আমি এতদিন পরে বাড়ি ফিরে এলাম অথচ তুমি এমন মনমরা হয়ে রইলে কেন?

মা কেঁদে ফেললেন। নিমাইয়ের মনে হল, লক্ষ্মীপ্রিয়ার কোনো অমঙ্গল হয়েছে। তিনি অস্থির কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন—তুমি কাঁদছ কেন মা! বল, কি হয়েছে? লক্ষ্মী কোথায়?

মা বলতে পারলেন না। বললেন প্রতিবেশীরা—তোমার লক্ষ্মীপ্রিয়া সেই নিমাই! সাপের কামড়ে মারা গেছে।

নিমাই কেঁদে উঠলেন। বাবার মৃত্যুর পরে তিনি আর এমন করে কেঁদে আকুল হন নি।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে নিমাই সে শোক সামলে উঠলেন। মুকুন্দ-সঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপে আবার টোল বসল। কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁর টোল ছাত্রে ভরে গেল।

এখন নিমাই উনিশ বছরের যুবক। এখন আর শচীর ঘরে দারিদ্র্য নেই। তিনি নবদ্বীপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত রূপে স্বীকৃত। সবাই তাঁকে সম্মান করেন। ধনীরা পর্যন্ত পথে নিমাইকে দেখলে দোলা থেকে নেমে নমস্কার জানান। কারও বাড়িতে ক্রিয়া-কর্ম কিছু হলে, নিমাইয়ের বাড়িতে ভেট আসে। কিন্তু তিনি বড়ই অমিতব্যয়ী ছিলেন। সাধু-সজ্জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলেই পরমসমাদরে তাঁকে বাড়ী নিয়ে আসতেন। ফলে শচীকে প্রায় প্রতিদিন অতিথিসেবা করতে হত।

এই সময় কেশব কাশ্মিরী নামে একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত নবদ্বীপে এলেন। তাঁর সঙ্গে বহু শিষ্য-সামন্ত ও হাতি-ঘোড়া। তিনি এসেই ঘোষণা করলেন— নবদ্বীপে যদি কোনো পণ্ডিতের সাহস থাকে, তবে আমার সঙ্গে বিচারযুদ্ধে অবতীর্ণ হোক, নইলে নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজ আমাকে জয়পত্র লিখে দিক।

নবদ্বীপে তখন অনেক পণ্ডিত। কিন্তু তাঁরা শুনেছিলেন, কেশব সরস্বতীর বরপুত্র, তাই কেউ তাঁর সঙ্গে বিচারে সাহসী হলেন না। নবদ্বীপের মান-সম্মান বিপন্ন হল।

ব্যাপারটা নিয়ে নিমাই একেবারেই মাথা ঘামান নি। কারণ তাঁর বয়স মাত্র উনিশ। এটা বড়দের বিষয় বিবেচনা করে তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আর হয়ে উঠল না।

সেদিন চাঁদনী রাত। নিমাই গঙ্গাতীরে বসে শিষ্যদের সঙ্গে শাস্ত্রালোচনা করছেন। এমন সময় কেশব সদলবলে সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি নিমাই পণ্ডিতের নাম শুনেছিলেন। তাঁর জনৈক শিষ্য জানালেন, নিমাইপণ্ডিত এখানে রয়েছেন।

আর যায় কোথায়? কেশব দলবল নিয়ে একেবারে নিমাইয়ের সামনে এসে হাজির হলেন। রাত হলেও চাঁদের আলোয় নিমাইকে স্পষ্ট দেখতে পেলেন। তাঁর অপরূপ রূপ কেশবকে মোহিত করল। কিন্তু অহঙ্কারী পণ্ডিত মন থেকে সেই মোহ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—তুমি নিমাই

পণ্ডিত! তুমি তো দেখছি হে নিতান্তই বালক। কিন্তু শুনলাম তোমার নাকি ব্যাকরণে বড়ই প্রতিষ্ঠা?

নিমাই তাঁকে আসন গ্রহণ করতে বলে সবিনয়ে উত্তর দিলেন—আমি আমার ছাত্রদের ব্যাকরণ পড়াই বটে, কিন্তু সে আমার পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র। কাজেই আমার কথা থাক। আপনি মহাপণ্ডিত। আমরা গঙ্গাতীরে বসে আছি। আপনি বরং গঙ্গার ওপরে কয়েকটি শ্লোক রচনা করুন, আমরা শুনে ধন্য হই।

কেশব খুবই খুশি হলেন। তিনি নিজের ক্ষমতা প্রদর্শনের জন্য ঝড়ের বেগে শ্লোক বলে যেতে থাকলেন। একটি শেষ হলেই আরেকটা আরম্ভ করেন। তারপরেই আবার আরেকটা। এইভাবে চলতে থাকল। আর নিমাই চোখ বুজে চুপচাপ বসে রইলেন।

নিমাইয়ের শিষ্যদের অবস্থা কিন্তু অন্যরকম। তাঁরা নিমাইকে খুবই ভক্তি-শ্রদ্ধা করেন। কিন্তু কেশবের পাণ্ডিত্যের কাছে নিমাই যে নিতান্তই বালক, তা বুঝতে তাঁদের তেমন দেরি হল না।

নিমাই কিন্তু অবিচলিত। কেশব শ্লোক রচনা শেষ করার পরে তিনি শান্তস্বরে বললেন—পণ্ডিতমশায়, আপনার মতো কবি জগতে দুর্লভ। সত্যই আপনার অসাধারণ শক্তি। তবে আপনি তো জানেন, শ্লোকের দোষ-গুণ বিচার না করলে, তা ভাল ভাবে আস্বাদন করা হয় না। কাজেই আপনি যদি আপনার একটি শ্লোকের বিচার করে দেন, তাহলে আমরা তৃপ্ত হই।

—বেশ, কোন্ শ্লোকটি বিচার করব, বলো?

নিমাই তৎক্ষণাৎ মাঝখানের দিকে রচিত একটি শ্লোক হুবহু আবৃত্তি করে গেলেন।

কেশব খুবই অবাক হলেন। প্রথম কিংবা শেষদিকের কোনো শ্লোক হলেও বা কথা ছিল, কিন্তু মাঝখানের একটা শ্লোক! তারপরে এই ভেবে শান্তি পেলেন যে নিমাই নিশ্চয়ই শ্রুতিধর।

নিমাই তাঁর মনের ভাব জানতে পেরে নিজেই বললেন—কেউ সরস্বতীর বরে কবি আবার কেউবা সেই সরস্বতীর বরে শ্রুতিধর।

কেশব নিশ্চিন্ত হয়ে তাঁর শ্লোকটির গুণ বিচার করলেন।

নিমাই মনযোগ দিয়ে সব শুনলেন। তারপরে সবিনয়ে বললেন—এবারে শ্লোকটির মধ্যে কি কি দোষ আছে, আমাকে একটু বলে দিন।

—দোষ! কেশব ক্ষেপে গেলেন। বললেন—আমার শ্লোকে দোষ!

তুমি ব্যাকরণ নিয়ে থাকো, তুমি অলঙ্কারের কি বোঝ হে? তুমি আমার শ্লোকের দোষ ধরতে চাইছ!

নিমাই তেমনি সবিনয়ে বললেন—আমি সত্যই অলঙ্কার শাস্ত্রের কিছুই জানি না। তবু আপনার শ্লোকটির দোষগুলি বলে যাচ্ছি, আপনি শুনুন।

নিমাই তারপরে একটির পর একটি দোষের উল্লেখ করতে থাকলেন। প্রথম দিকে কেশব কয়েকবার প্রতিবাদ করলেন। কিন্তু নিমাইয়ের বিচারের ধারায় তাঁর সব যুক্তি ভেসে গেল। অবশেষে লজ্জা ঘৃণা ও অপমানে কেশব প্রায় মাটির সঙ্গে মিশে গেলেন।

নিমাই তখন তাঁকে সান্ত্বনা দান করে বললেন—আপনি লজ্জিত হবেন না, কারণ কবিতায় দোষ থাকা কোনো গ্লানির কথা নয়। কালিদাস ভবভূতির কাব্যেও দোষ আছে। বরং কবিত্ব ভগবানের দান। আপনি ভাগ্যবান, ভগবান আপনাকে সেই স্বর্গীয় শক্তি দান করেছেন। কিন্তু আজ অনেক রাত হল, আজ আর বিচার নয়। আগামীকাল সকালে আবার আপনার সঙ্গে বিচারে বসা যাবে।

নিমাইয়ের কথায় কেশব খানিকটা শান্ত হয়ে বাসায় ফিরে গেলেন। কিন্তু সে রাতে তার আর খাওয়া হল না, ঘুমুতেও পারলেন না। শুধু সরস্বতীর স্তব করলেন। পরদিন সকালেই তিনি ছুটে এলেন নিমাই পণ্ডিতের বাড়িতে। তাঁর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ঘুম ভাঙার পরে নিমাই দরজা খুলে ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসতেই কেশব তাঁর পায়ের ওপর আছাড় খেয়ে পড়লেন। তাড়াতাড়ি পেছিয়ে গিয়ে নিমাই দুহাত দিয়ে কেশবকে ওপরে তুললেন। বললেন—এ আপনি কি করলেন? আপনি প্রবীণ পণ্ডিত, আমি সামান্য তরুণ। এতে যে আমার অপরাধ হল।

কেশব উত্তর দিলেন—মা-সরস্বতী স্বপ্নে আমাকে আপনার শরণ নিতে আদেশ করেছেন। আমি তাই নিলাম। বিচার-যুদ্ধ করে করে আমি বড়ই অহঙ্কারী হয়ে পড়েছিলাম। আপনি কৃপা করে আমার অহংবোধ দূর করে দিন।

নিমাই তখন তাঁকে প্রয়োজনীয় উপদেশ দান করলেন। তারপরে কেশব বাসায় ফিরে তার হাতি-ঘোড়া সহ সমস্ত সম্পত্তি বিলিয়ে দিয়ে দণ্ড-কমণ্ডলধারী হয়ে নবদ্বীপ ত্যাগ করলেন।"

থামলেন প্রভুপাদ। তাহলে আজকের মতো গৌরকথা শেষ হল।…

না। প্রভুপাদ একটু ভেবে নিয়ে আবার বলতে শুরু করেছেন, "দিগ্বিজয়ী

কেশব কাশ্মিরীকে শাস্ত্রযুদ্ধে পরাজিত করবার পরে নিমাই পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি আরও ছড়িয়ে পড়ল। যাঁরা তাঁর পূর্ববঙ্গ বিজয়ের সংবাদ বিশ্বাস করেন নি, তাঁরাও এখন তাঁর পাণ্ডিত্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠলেন।

কিন্তু খ্যাতি যতই হোক, মানুষ তাঁকে যতই শ্রদ্ধা করুক, তাঁর দুরন্তপনা কিন্তু তখনও যায় নি। বৈষ্ণবদের প্রতি তাঁর দৌরাত্ম্যও কিছুমাত্র কমে নি। দরিদ্র বৈষ্ণব পসারী শ্রীধর থেকে প্রবীণ বৈষ্ণবপণ্ডিত শ্রীবাস পর্যন্ত সবাই তখনও তাঁর দুরন্তপনার শিকার হয়ে চলেছেন।

শ্রীবাস পণ্ডিত পরম-বৈষ্ণব এবং সুপণ্ডিত। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে তখন তাঁর স্থান অদ্বৈতাচার্যের পরেই। তাছাড়া তিনি নিমাইয়ের পিতৃবন্ধু। তিনি ও তাঁর স্ত্রী মালিনী শিশু নিমাইকে কোলে পর্যন্ত নিয়েছেন। তাই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে পরাজিত করার পরে একদিন শ্রীবাস পথে নিমাইকে দেখে ভারী খুশি হলেন। ভাবলেন এখন নিশ্চয়ই নিমাইয়ের চাপল্য দূর হয়েছে। তিনি তাঁর কাছে এসে বললেন—নিমাই, তুমি তো জানো, শ্রীকৃষ্ণের চরণপ্রাপ্তি জীবনের পরম উদ্দেশ্য।

—জানি। গম্ভীর স্বরে নিমাই উত্তর দিলেন। বললেন—আর তাই আমি এমন বৈষ্ণব হব যে অজ ভব পর্যন্ত আমার দুয়ারে এসে উপস্থিত হবে।

শ্রীবাস বুঝতে পারলেন, নিমাই তেমনি রয়ে গিয়েছেন। তবু তিনি জিজ্ঞেস করলেন—নিমাই তুমি কি দেবতা মানো না?

—আমি আবার কাকে মানব? আমিই তো ভগবান।

শ্রীবাস আর কোনো কথা বলতে পারলেন না। নিমাই শিষ্যদের সঙ্গে হাসতে হাসতে সেখান থেকে চলে গেলেন।

শব্দহীন শ্রীবাস দুঃখ পেলেন কিন্তু নিরাশ হলেন না। তাঁর মন বলল, মুখে যা-ই বলুক, নিমাই বৈষ্ণবের ছেলে। বৈষ্ণব তাকে হতেই হবে।

শ্রীবাস পণ্ডিত যত আশাই করুন, নিমাইয়ের আচরণে তার কোনো প্রমাণ পাওয়া গেল না। তিনি পয়সা-কড়ি না নিয়েই বাজারে যেতেন। পানওয়ালার কাছ থেকে পান খেতেন, তাঁতীর কাছ থেকে কাপড় নিতেন, এমনি আরও অনেক জিনিস, তারপরে তাঁদের কথায় ভুলিয়ে বাড়ি চলে আসতেন। দাম ফাঁকি দেবার জন্য নয়, মজা করবার জন্যই তিনি এসব করতেন।

বাজারে শ্রীধর নামে একজন দরিদ্র দোকানী ছিলেন। তিনি থোড় মোচা ও কলার খোল বিক্রি করতেন। মানুষটি ভক্ত-বৈষ্ণব এবং বড়ই শান্ত। তাই নিমাই বাজারে গেলেই তাঁর ওপরে উপদ্রব করতেন। ফলে নিমাইকে দেখলেই

শ্রীধরের মুখ শুকিয়ে যেত। নিমাই তাঁর সামনে এলে তিনি বলতেন—ঠাকুর দয়া করে কাড়াকাড়ি করবেন না। ঠিক দাম দিয়ে জিনিস নিয়ে যান।

—শ্রীধর, তুমি বড়ই কৃপণ। তোমার অনেক টাকা, তবু তুমি বেশি দাম চাও। নিমাই বলেন।

শ্রীধর উত্তর দেন—ঠাকুর, তোমার পায়ে পড়ি। তুমি ঝগড়া করো না। আমি গরীব মানুষ। আমি কোথায় টাকা পাবো?

নিমাই তখন থোড় আর খোলা নিয়ে অর্ধেক দাম দিতে চাইলেন।

শ্রীধর বাধা দিয়ে বললেন—আবার বলছি, ঠাকুর তোমার পায়ে পড়ি। তুমি অন্য পসারীর কাছে যাও!

—শ্রীধর, তুমি আমার হাত থেকে জিনিস কেড়ে নিচ্ছ, এটা কি ভাল কাজ করছ? তুমি কি জানো, যে গঙ্গাকে তুমি প্রতিদিন নৈবদ্য দাও, সে আমার মেয়ে।

শ্রীধর তাড়াতাড়ি দুহাতে নিজের কান চেপে ধরে বলতেন—পণ্ডিত, বয়স বাড়লে মানুষ শান্ত হয়, আর তুমি আরও অশান্ত হচ্ছ। কিন্তু দেখ ঠাকুর, আমি আমার জিনিসের দাম কমাবো না। তুমি যদি নিতান্তই না ছাড়ো, তবে আমি তোমাকে রোজ একটুকরো থোড় ও খাবার জন্য একখণ্ড খোল দেব। তোমার পয়সা দেবার দরকার নেই। তুমি শুধু দয়া করে আমার সঙ্গে ঝগড়া করো না।

—বেশ কথা, তাহলে আর ঝগড়া করব কেন? নিমাই হেসে জবাব দিতেন।"

থামলেন প্রভুপাদ। না, এখনও পাঠ শেষ হয় নি। একটু থেমে তিনি আবার আরম্ভ করেন, "দিন যায়, নিমাইয়ের বয়স বাড়ে, পাণ্ডিত্যের খ্যাতি বাড়ে।

শচীও সুখে আছেন। সংসারের কাজ ঠাকুরসেবা আর গঙ্গাস্নানে তাঁর দিনগুলো আনন্দেই কাটছে। সেদিনও তিনি স্নান সেরে গঙ্গার ঘাটে উঠে এসেছেন। হঠাৎ কে যেন তাঁকে প্রণাম করলেন। তাকিয়ে দেখেন, একটি অপরিচিতা কিশোরী। তিনি তাড়াতাড়ি নিচু হয়ে মেয়েটির হাত ধরেন।

কিশোরী তাঁর দিকে তাকালেন। শচীও মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন মেয়েটির দিকে। ভাবলেন এটি কি দেবকন্যা? সোনার মতো গায়ের রং, হিঙ্গুলের মতো লাল দুটি ঠোঁট, পদ্মের মতো একজোড়া চোখ আর কুঁদেকাটা একখানি মুখ।

শচী কোমল কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন—বাছা, তুমি কার মেয়ে, তোমার নাম কি ?

কন্যা নতমস্তকে উত্তর দিলেন—আমার নাম বিষ্ণুপ্রিয়া, শ্রীসনাতন মিশ্র আমার বাবা।

মেয়েটিকে দেখামাত্র শচীর বাৎসল্য উথ্‌লে উঠেছিল, তাঁর মনে হয়েছিল মেয়েটিকে নিমাইয়ের বউ করে ঘরে নিতে পারলে বড় ভাল হয়। কিন্তু মেয়েটির পরিচয় পেয়ে তিনি নিরাশ হয়ে পড়লেন। সনাতন মিশ্র রাজপণ্ডিত ও ধনবান। তিনি কেন পিতৃহীন দরিদ্র নিমাইকে তাঁর মেয়ে দেবেন ?

ঘরে ফিরে এসেও শচী মেয়েটিকে ভুলতে পারেন না। কেবল তাঁরই কথা ভেবে চলেন—সে শুধু সুন্দরী ও সুলক্ষণা নয়, বড়ই ভক্তিমতী। প্রতিদিন গঙ্গাস্নান করে, ঘাট থেকে ঘরে ফিরে ঠাকুরসেবা না করে নাকি কিছু মুখে দেয় না। এমন মেয়ে ঘরে এলে তিনি খুবই সুখী হবেন। ভাবলেন, একবার চেষ্টা করে দেখতে কি দোষ ?

তাই শচীদেবী ঘটক কাশী মিশ্রকে ডাকিয়ে আনলেন। বললেন—মেয়েটির ওপর আমার বড্ড মায়া পড়েছে, তুমি ওকে আমার ঘরে এনে দাও।

সনাতনের এক ছেলে ও এক মেয়ে। মেয়েটি বড়। এগারোয় পড়ল। মেয়ের বিয়ের চিন্তায় তিনি অস্থির। এমন সময় একদিন পথে নিমাইকে দেখলেন। দেখে আর চোখ ফেরাতে পারেন না। ভাবেন একি মানুষ না দেবতা।

তারপর থেকে তিনি নিয়মিত নিমাইয়ের খবর রাখতেন। তখন দিন দিন নিমাইয়ের খ্যাতি বাড়ছে। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে পরাজিত করার পরে নিমাইয়ের প্রশংসায় নবদ্বীপ মুখর হয়ে উঠল। সনাতন ভাবলেন, নিমাইকে যদি জামাই করতে পারতাম। কিন্তু ভগবান কি আমার আশা পূর্ণ করবেন !

এইসময় একদিন কাশী মিশ্র তাঁর বাড়ি এসে শচীদেবীর প্রস্তাব পেশ করলেন। আনন্দের আতিশয্যে সনাতন কোনো উত্তর দিতে পারলেন না। কেবল কাশীকে বললেন—আপনি একটু বসুন, আমি আসছি।

তিনি ছুটে এলেন বাড়ির ভেতরে। স্ত্রীকে বললেন—ভগবান বোধহয় আমার আশা পূর্ণ করবেন।

কথাটা কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়ার কানে এলো। তাঁর মুখখানি লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। সেটা তাঁর ঠিক প্রেমে পড়ার বয়স নয়। তবু পথে নিমাইকে দেখে কেমন একটা আকর্ষণ অনুভব করেন। ঘাটে শচীমাতাকে দেখলে 'মা' ডাকতে ইচ্ছে করে। আর তাই তিনি শচীমাকে প্রণাম করেন। শচী তাঁকে আদর

করেন, তাঁর বড় ভাল লাগে। সেই নিমাই তাঁর স্বামী হবেন, শচীমা শাশুড়ী হবেন। তিনি আনন্দে দিশাহারা হয়ে পড়লেন।"

আবার থামলেন প্রভুপাদ, আমরা তেমনি তাঁর মুখের দিকে তাকাই। তিনি বলতে শুরু করেন, "ভক্তবৃন্দ, বিষ্ণুপ্রিয়ার এই অনুরাগ সম্পর্কে শ্রীচৈতন্যদেবের পার্ষদ মুকুন্দ পণ্ডিত তাঁর 'শ্রীগৌরাঙ্গ উদয়' গ্রন্থে লিখেছেন—নিমাই বিষ্ণুপ্রিয়ার হৃদয়ে উদয় হয়েছিলেন বলেই তিনি নবানুরাগে এমন পাগলিনীর মতো হয়ে গিয়েছিলেন। আর শ্রীচৈতন্যভাগবতে বলা হয়েছে—নিমাই স্বপ্নে বিষ্ণুপ্রিয়ার হৃদয়ে প্রবেশ করেছিলেন বলেই শচীদেবীকে তাঁর এত মিষ্টি লাগত।

সনাতন মিশ্রের সম্মতি পেয়ে শচীদেবী খুবই খুশি হলেন। কয়েকদিন পরে তিনি বিয়ের দিন স্থির করার জন্য কাশীকে আবার সনাতনের কাছে পাঠালেন। যাবার পথে সেদিন কাশীর হঠাৎ নিমাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। হাসতে হাসতে কাশী নিমাইকে জিজ্ঞেস করলেন—বল তো পণ্ডিত আমি কোথায় যাচ্ছি?

নিমাই উত্তর দিলেন—আমি জানি না।

—আমি একটা বিয়ের লগ্ন ঠিক করতে যাচ্ছি।

—কার বিয়ে?

—তোমার।

—সেকি! আমি যে কিছুই জানি না। নিমাই একটু বিস্ময় প্রকাশ করে নিজের কাজে চলে গেলেন।

কাশী ভাবলেন, তাহলে বোধহয় এ বিয়েতে নিমাইয়ের মত নেই। তিনি কথাটা সনাতনকে বললেন। সনাতন ভাবলেন কাশীর আশঙ্কা অমূলক নয়। তাঁর মনে হ'ল, নিমাই বড় হয়েছে কিন্তু শচীদেবী তাকে না জানিয়েই তার বিয়ে ঠিক করেছেন। কাজটা ঠিক হচ্ছে না। তিনি খুবই বিমর্ষ হয়ে পড়লেন।

কথাটা নিমাইয়ের কানে এলো। তিনি বুঝতে পারলেন—কাশী মিশ্র আমার কথাটা ঠিক ধরতে পারেন নি। তিনি তো জানেন না, সংসারের সব ব্যাপারেই আমি মায়ের ওপর নির্ভরশীল। মায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার কিছু করার কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না।

নিমাই একজন ভক্তকে দিয়ে সনাতনের কাছে বলে পাঠালেন—মায়ের ইচ্ছাই পূর্ণ হবে। আপনি বিবাহের ব্যবস্থা করুন।

সনাতনের বাড়ি আবার আনন্দময় হয়ে উঠল। শুধু সে বাড়ি নয়, সংবাদটা ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সারা নবদ্বীপ আনন্দময় হয়ে উঠল। জমিদার বুদ্ধিমন্ত খাঁ ঘোষণা করলেন—নিমাই পণ্ডিতের বিয়ের সব খরচ আমার।

ধনপতি মুকুন্দ সঞ্জয় বললেন—তা কেন হবে? নিমাই আমার বাড়িতে টোল খুলেছে, সে আমার বাড়ির ছেলে। তার বিয়ের খরচ আমি দেব।

শেষ পর্যন্ত দুজনে রফা হল—দুজনেই যৌথভাবে এই বিয়ের ব্যয় বহন করবেন।

অবশেষে শুভদিন সমাগত হল। বর বেশে সজ্জিত হয়ে নিমাই গোধুলি লগ্নে দোলায় আরোহণ করলেন। বুদ্ধিমন্ত খাঁয়ের পদাতিকবাহিনী আগে আগে পথ চলল। পেছনে পথ চলেছে বাজনদার ও বরযাত্রীদল। মৃদঙ্গ মাদল জয়ঢাক ও বীরঢাক প্রভৃতি বিভিন্ন বাজনা। আর বরযাত্রী তো অসংখ্য।

কনের বাড়িতেও আয়োজন কিছু কম নয়। সনাতনও একদল বাজনদার নিয়ে এগিয়ে এসে জামাইকে স্বাগত জানাইলেন। মেয়েরা উলু দিয়ে ও শাঁখ বাজিয়ে তাঁকে বরণ করলেন।

যথাসময়ে বিয়ের অনুষ্ঠান আরম্ভ হল, বিষ্ণুপ্রিয়াকে বাসরে আনা হল। নিমন্ত্রিতরা দেখলেন—

'বিষ্ণুপ্রিয়া অঙ্গ জিনি লাখবালা সোনা।
ঝলমল করে যেন তড়িৎ প্রতিমা॥'*

শুভদৃষ্টির সময়ে চারচোখের মিলন হল। এই দৃশ্যটিকে বর্ণনা করতে গিয়ে ভক্তকবি বলরাম দাস লিখেছেন—

'ঘোমটা আড়ালে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী।
আড় চোখে হেরে পতি-মুখ ছবি॥
ভাবিছেন মনে কি সুন্দর মুখ।
কি তপেতে বিধি দিল এত সুখ॥'

অবশেষে বর-কনে বাসরঘরে চললেন। সবাই বললেন লক্ষ্মী-নারায়ণ বাসরে চলেছেন। কিন্তু তখন বিষ্ণুপ্রিয়ার শরীরে কেমন যেন একটা অবশ ভাব। তাঁর পা চলছে না। বাসরঘরে প্রবেশ করতে গিয়ে তিনি চৌকাঠে হোঁচট্ খেলেন। তাঁর ডানপায়ের একটা আঙুল ছড়ে গেল, রক্ত পড়তে থাকল। নিমাই তাড়াতাড়ি নিজের পা দিয়ে বিষ্ণুপ্রিয়ার আঙুলটা চেপে

---

* শ্রীচৈতন্যমঙ্গল।

ধরলেন। সঙ্গে সঙ্গে রক্তপাত বন্ধ হয়ে গেল।

বালিকা হলেও বিষ্ণুপ্রিয়া বুঝতে পারলেন—এটা অমঙ্গল। তাঁর সারা শরীর সম্পূর্ণ অবশ হয়ে গেল। তিনি নিমাইয়ের গায়ের ওপরে ঢলে পড়লেন। নিমাই সস্নেহে বিষ্ণুপ্রিয়াকে বুকে জড়িয়ে ধরে বাসরে প্রবেশ করলেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার বিষাদ দূর হয়ে গেল, তিনি সুস্থ হয়ে উঠলেন।

সনাতনের সংসারকে অন্ধকার করে পরদিন বিষ্ণুপ্রিয়া স্বামীর সঙ্গে শ্বশুর-বাড়ি এলেন। শচীমা বাড়ির বাইরে ছুটে এসে বিষ্ণুপ্রিয়াকে দোলা থেকে কোলে তুলে নিলেন। এই কোলে আশ্রয় পাবার বাসনা তাঁর বহুদিনের। তাই বিষ্ণুপ্রিয়ার সর্বাঙ্গ পুলকিত হয়ে উঠল। তিনি শচীমাতার বুকে মুখ লুকালেন। নিমাইয়ের বুক থেকে তৃপ্তির নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো। প্রতিবেশীরা মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।"

॥ তেরো ॥

আজ কিন্তু কিছু ব্যতিক্রম হ'ল। গত চারদিন পরিক্রমা শুরু করেছি সকাল সওয়া সাতটায়। ব্যাপারটা কাকতালীয় হলেও গতকাল সকালে রওনা হবার সময়ে সেকথার উল্লেখ করেছি। আজ কিন্তু সেই বিচিত্র ব্যাপারটার কিছু ব্যতিক্রম হ'ল। আজ রওনা হতে আরও দশ মিনিট দেরি হয়ে গেল। সকাল সাতটা পঁচিশ মিনিটে আমাদের সংকীর্তন শোভাযাত্রা শুরু হ'ল। আজ আমরা কোলেরডাঙ্গা বা সাতকুলিয়া চলেছি। অর্থাৎ মধ্যদ্বীপ থেকে কোলদ্বীপে যাচ্ছি। দূরত্ব সাত মাইলের মতো।

সময়ের সামান্য পরিবর্তন হলেও বিদায় দৃশ্যটি অপরিবর্তিত। গ্রামের মানুষরা পথের পাশে দাঁড়িয়ে বিদায় জানাচ্ছেন আমাদের। বলাবাহুল্য তাঁদের মধ্যে মাষ্টারমশাই রয়েছেন। রয়েছে তাঁর পুত্রবধূ। মেয়েটি আজ সকালেও চা খাইয়েছে আমাকে। সেও সবার মতো পথের পাশে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মানসী ও কৃষ্ণাকে বলছে—আবার আসবেন দিদি!

কথাটা বলছেন আরও অনেকে। এবং আমিও সবার মতো মাথা নাড়ছি। কিন্তু সত্যিই আসব কি? না। তাহলে জেনে শুনে মিথ্যে আশ্বাস দিচ্ছি কেন? কি করব? অনেক সময় যে মিথ্যে সত্যের চেয়ে বেশি সুন্দর।

গাঁয়ের মেটেপথ ধরে সংকীর্তন শোভাযাত্রা চলেছে এগিয়ে। মাজদিয়া দরিদ্র হলেও বেশ বড় গ্রাম। বহু বাড়ি-ঘর। প্রায় প্রতি ঘরে তাঁত আছে। কুটির শিল্পের কল্যাণে বেকার সমস্যার জ্বালাটা কিছু কম। কিন্তু দিন দিন সুতোর দাম যে রকম বাড়ছে, তাতে তাঁতশিল্পের নাভিশ্বাস উঠতে আর বোধকরি বেশি বাকি নেই।

কয়েকজন গ্রামবাসী প্রভুপাদকে প্রণাম করলেন। তাঁদের মধ্যে জনৈক সুদর্শন যুবক বলেন, "বাবা, আমাদের গ্রামে একটা যাত্রাপার্টি আছে। আমি তার পরিচালক। আমরা নিয়মিত গান-বাজনা ও অভিনয় করি। আমি আপনাকে বলছি বাবা, এমন পাঠ ও গানের অনুষ্ঠান খুব কম শোনা যায়। আমাদের এখানে প্রতিবছর পরিক্রমা আসে কিন্তু তাঁরা কেউ এত সুন্দর অনুষ্ঠান করেন না। আপনারা আমাদের বড় আনন্দ দিয়ে গেলেন।"

"আধার ভাল না হলে ভাল জিনিস রাখা যায় না, আনন্দময় না হলে

আনন্দ লাভ করা যায় না। তবে আপনাদের ভাল লেগেছে জেনে আমরাও আনন্দ পেয়ে গেলাম। আপনারা সুখে থাকুন, আপনাদের ভাল হোক।"

প্রভুপাদ তাঁদের আশীর্বাদ করে এগিয়ে চলেন, আমরা তাঁকে অনুসরণ করি।

বাড়ি-ঘর শেষ হয়ে গেল, শুরু হল ক্ষেত—পথের দুপাশেই ক্ষেত। মাঝে মাঝে ঝোপঝাড় আর বাঁশবন। দূরে দুয়েকটা বাড়ি অবশ্য দেখা যাচ্ছে। আমরা সোজা দক্ষিণে চলেছি।

সহযাত্রীরা কীর্তন করছেন। শুনতে ভালই লাগছে। কীর্তনের মধ্যে না থাকলে কীর্তন ভাল লাগে না, মনে হয় চিৎকার কিংবা চেঁচামেচি। কীর্তন শুনতে শুনতে পথ চলি আর চলতে চলতে ভাবতে থাকি শ্রীগৌরাঙ্গের কথা—

ছেলের বিয়ে দিয়ে শচী কিছুদিন বড়ই সুখে কাটালেন। বিষ্ণুপ্রিয়া ভারী লক্ষ্মীমেয়ে। তার ওপরে নিমাইয়ের সংসারে মন মজেছে দেখে তিনি শান্তি লাভ করলেন।

কিছুদিন পরে নিমাই একদিন বললেন—মা, আমি গয়া যাবো, বাবা ও অন্যান্য পিতৃপুরুষদের পিণ্ডদান করব।

নিমাইয়ের কথা শুনে শচী সুখী হলেন। গয়া গিয়ে পিতৃপুরুষদের পিণ্ডদান করা প্রত্যেক পুত্রের পরম কর্তব্য। তাছাড়া ধর্ম-কর্মে ছেলের মতি হয়েছে দেখে তিনি খুবই আনন্দ পেলেন। খুশি মনে নিমাইকে গয়া যাবার অনুমতি দান করলেন।

মা এবং বালিকাবধূর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিমাই গয়া রওনা হলেন। অভিভাবক রূপে তাঁর সঙ্গে চললেন মেসো চন্দ্রশেখর আচার্য আর সঙ্গী হলেন কয়েকজন আত্মীয় এবং ছাত্র।

বঙ্গদেশের কয়েকটি প্রসিদ্ধ স্থান দর্শন করে তাঁরা গয়া পৌঁছলেন। ফল্গুনদীতে স্নান ও তর্পণ করে গৌরাঙ্গ শ্রাদ্ধ-শান্তি সুসম্পন্ন করলেন। বিষ্ণুপাদ-পদ্মে পিণ্ডদান করলেন। অক্ষয়বট-মূলে দান করে গদাধর ও গয়েশ্বরের পুজো করলেন। দিনগুলো তাঁর বড়ই আনন্দে কাটতে থাকল।

এইসময় একদিন নিমাই খবর পেলেন শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী গয়াতে রয়েছেন। এই মানুষটি সম্পর্কে একটা আশ্চর্য দুর্বলতা তখনও তাঁর মনে থেকে গিয়েছিল। তাই খবর পেয়েই তিনি ছুটে গেলেন পুরীজির কাছে। তিনিও তাঁকে কাছে পেয়ে ভারী আনন্দিত হলেন। নিমাই তাঁকে নেমন্তন্ন করে নিজের বাসায় নিয়ে এলেন। নিজের হাতে বেঁধে খাওয়ালেন।

ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে নিমাই ভগবৎতত্ত্ব আলোচনা আরম্ভ করলেন। পুরীজির মুখে প্রেম ও ভক্তির কথা তাঁর বড় ভাল লাগল। তাঁর মনে কেমন যেন একটা পরিবর্তন দেখা দিল। মনে হতে থাকল, টোল খুলে আর শাস্ত্রযুদ্ধ করে এতদিন তিনি বৃথা সময় নষ্ট করেছেন। তাঁর ভীষণ অনুশোচনা হল। অবশেষে একদিন তিন ঈশ্বরপুরীকে বলে বসলেন—আমি আপনার কাছে দীক্ষা গ্রহণ করব।

পুলকিত পুরীজি নিমাইকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তাঁর এ বাসনা বহু-দিনের। নবদ্বীপের পথে নিমাইকে প্রথম দেখার পর থেকে তিনি মনে মনে এমন একটি শুভ মুহূর্তের স্বপ্ন দেখছিলেন। করুণাময় গদাধর তাঁর সেই স্বপ্ন সত্য করতে চলেছেন।

শুভদিন দেখে উপযুক্ত আয়োজন করে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী শ্রীগৌরাঙ্গকে কৃষ্ণমন্ত্র দান করলেন। দীক্ষার পরে নিমাই গয়াতে কয়েকদিন সাধন-ভজন নিয়ে ব্যস্ত রইলেন। তারপরে গুরুদেবের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নবদ্বীপ রওনা হলেন।

যে নিমাই গয়া গিয়েছিলেন, সে নিমাই আর নবদ্বীপে ফিরে এলেন না। এ যেন অন্য মানুষ। তাঁর জীবন-যাপন প্রণালী ও মতি-গতি সবই কেমন বদলে গিয়েছে। তিনি এক বিস্ময়কর অধ্যাত্মদৃষ্টি লাভ করেছেন। সেই সঙ্গে দেশ ও সমাজের দুরবস্থা দেখে সর্বদা দুঃখ পাচ্ছেন। তাঁর মধ্যে সেই চাঞ্চল্য নেই, সেই বাচালতা, নেই সেই অহঙ্কার। তিনি স্থির অচঞ্চল ও গম্ভীর হয়ে গিয়েছেন।

ছেলের পরিবর্তন দেখে মা শিউরে উঠলেন। বিশ্বরূপের গৃহত্যাগের কথা তখনও তাঁর মনে কাঁটার মতো বিঁধে রয়েছে।

বিষ্ণুপ্রিয়ার বয়স অল্প। তবু স্বামীকে দেখে তাঁর কেমন একটা অজানা আশঙ্কায় বুক কেঁপে উঠল। কিন্তু মনে মনে ভয় পেলেও তিনি মুখে তা প্রকাশ করলেন না। কেবল তাঁর প্রাণের ঠাকুরের কাছে বার বার স্বামীর মঙ্গল কামনা করলেন।

নিমাইয়ের এই মানসিক পরিবর্তনের কথা কয়েকদিনের মধ্যেই নবদ্বীপে ছড়িয়ে পড়ল। সব শুনে গঙ্গাদাস পণ্ডিত বড়ই দুঃখ পেলেন। তিনি একদিন নিমাইকে বললেন—তুমি পণ্ডিত। তুমি অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ছেড়ে 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' করছ কেন? টোলে যাও, সংসারধর্ম পালন কর, চতুর্বর্গ ফল লাভ করবে।

নিমাই করজোড়ে বললেন—আচার্য, আমারও তো তাই ইচ্ছে। কিন্তু আমি কিছুতেই মনকে বশ মানাতে পারছি না। কে যেন জোড় করে আমাকে অন্যদিকে নিয়ে চলেছে।

কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ নিমাইয়ের সহপাঠী ও নবদ্বীপের একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। তিনি এসে নিমাইকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু কিছুই করতে পারলেন না। অবশেষে রেগে গিয়ে সবাইকে বললেন—নিমাই পণ্ডিত পাগল হয়ে গেছে।

কথাটা অদ্বৈতাচার্যের কানে এলো। নিমাই 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' করছেন শুনে তিনি মনে মনে পুলকিত হয়ে উঠলেন। তবে কি তাঁর প্রার্থনা পূর্ণ হতে চলেছে? কলির নন্দনন্দন এসে গিয়েছেন।

শ্রীবাস মুকুন্দ মুরারি দামোদর ও শ্রীধর প্রভৃতিকে নিয়ে অদ্বৈত নিমাইয়ের বাড়িতে এলেন। নিমাইকে দেখেই তিনি বুঝতে পারলেন, তাঁর অন্তরে অতি উচ্চস্তরের ভাব ও ভক্তি বিকাশ লাভ করেছে। তবু তিনি পরীক্ষা করতে চাইলেন। নিমাইয়ের সামনে ভগবৎপ্রসঙ্গ আরম্ভ করলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ম্রিয়মাণ নিমাই উল্লসিত হয়ে উঠলেন। অদ্বৈত বুঝতে পারলেন, তাঁর অনুমান সত্য। সত্য সত্যই কলির ভগবান আবির্ভূত হয়েছেন।

অদ্বৈত শচীদেবীকে আশ্বস্ত করে বললেন—আপনি চিন্তা করবেন না। নিমাইয়ের এই অবস্থা কোনমতেই পাগলামী নয়, এটি অতি দুর্লভ বস্তু। ভগবানের অংশে যাঁদের জন্ম, তাঁদেরই কেবল এমন হয়।

নিমাই ভগবদভক্তিতে বিভোর হলেন। একাগ্রচিত্তে সাধন-ভজনে নিবিষ্ট হলেন। ক্রমে তাঁর মন-প্রাণ দিব্যানন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। তাঁর ব্যাকুলতা ও বিষণ্ণতা কমে গেল। তিনি শান্ত হয়ে গেলেন।

পুত্রকে আনন্দময় হয়ে উঠতে দেখে শচী খুশি হলেন, বিষ্ণুপ্রিয়াও নিশ্চিন্ত হলেন।

নিমাইয়ের ভক্তসংখ্যা বাড়তে থাকল। ভগবৎপ্রসঙ্গ আলোচনা করার সময় কিংবা ভজন-কীর্তনের সময় নিমাইয়ের ভাবাবেশ দেখে তাঁরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়তেন। প্রাণপণে তাঁর সেবা করতেন।

নিমাইয়ের সুমধুর উপদেশ ও প্রেমভাবে মুগ্ধ হয়ে অনেকেই বলতে শুরু করলেন—নিমাই পণ্ডিত এক অসাধারণ মহাপুরুষ।

ভক্তদের ভালোবাসার দানে শচীর ঘর ভরে উঠতে থাকল। তাঁর ঘরে তখন নিত্য আনন্দোৎসব।

অদ্বৈতাচার্য ও শ্রীবাসাচার্যের পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বেড়ে চলল। মুরারি মুকুন্দ শ্রীধর গদাধর জগদানন্দ ও দামোদর প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ নিমাইকে আত্মসমর্পণ করলেন।

ভক্তদের সঙ্গে মিলিত হয়ে নিমাই নবদ্বীপে ভক্তিপ্রেমের এক অভূতপূর্ব স্রোত প্রবাহিত করলেন। সমস্ত সমাজ আলোড়িত হয়ে উঠল। ছোট-বড় ধনী-দরিদ্র পণ্ডিত-মূর্খ ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল সকলের মনে এক নূতন জাগরণের সাড়া পড়ে গেল।

আর ঠিক তখুনি হরিদাস ও নিত্যানন্দ এসে সেই স্রোতধারাকে বন্যায় রূপান্তরিত করলেন। কিন্তু তাঁদের কথা এখন থাক, এখন একবার পথের দিকে নজর দেওয়া যাক।

ইতিমধ্যে আধঘণ্টা কেটে গিয়েছে। আমরা একটা গ্রামে এসেছি। কানু বলে, "এ গ্রামের নাম চরব্রহ্মনগর। নাম থেকেই বুঝতে পারছেন গঙ্গার গতি পরিবর্তনের ফলে যে চর জেগে উঠেছিল, তারই ওপরে গড়ে উঠেছে গ্রাম। সওয়া পাঁচশয়ের মতো ঘর আছে। জনসংখ্যা তিন হাজারের কিছু বেশি।"

অর্থাৎ বেশ বড় গ্রাম। তাই ইট বাঁধানো পথ। পথের পাশে বাড়ি-ঘর। ঘরের মানুষ পথে বের হয়েছেন। সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে আমাদের অভিনন্দিত করছেন।

কিছুক্ষণ বাদে গ্রাম শেষ হয়ে গেল। শুরু হল মাটির পথ। ধূলিময় হলেও বেশ প্রশস্ত। কানু আবার বলে, "জানেন ঘোষদা, এই রাস্তাটার নাম মুখার্জি রোড।"

"এমন নামের কারণ?"

"সঠিক কারণ বলতে পারব না। তবে শুনেছি এই রাস্তাটি তৈরি হবার সময় জনৈক মুখার্জি কণ্ট্র্যাক্টর কিংবা নির্মাণ বিভাগের ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন।"

কানু আর কিছু না বলে সামনে এগিয়ে যায়। বোধকরি ওর কোনো কাজ আছে। অতএব মুখার্জি সাহেবের ভাবনা আর নয়। তার চেয়ে পথ চলতে চলতে আপন মনে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের জীবনকথা স্মরণ করা যাক।

হরিদাস ঠাকুরের আরেক নাম যবন-হরিদাস্। কেউ বলেন, তিনি মুসলমানের ছেলে, কেউবা বলেন মুসলমানের ঘরে মানুষ হয়েছেন। প্রকৃত সত্য যা-ই হোক, এ সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই যে হিন্দু-পরিবেশে তাঁর শৈশব কাটে নি। কিন্তু আশ্চর্য, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অন্তরে হরিনামে প্রবল অনুরাগ জন্মালো এবং সেই অনুরাগ ক্রমেই বাড়তে থাকল।

তিনি সারাদিন চিৎকার করে হরিনাম করেন, আত্মীয়-স্বজন আপত্তি জানায়, প্রতিবেশীরা প্রতিবাদ করে। কিন্তু কোনো ফল হয় না। শেষে তাঁরা কাজীর কাছে গিয়ে নালিশ করে। কাজী তাঁকে ডেকে পাঠান। হরিদাস কাজীর কাছে আসেন। কাজী বলেন—মুসলমানের ছেলে হয়ে তুমি হরিনাম করছ! তুমি কাফের। আর এ কাজ করলে তোমাকে কঠিন শাস্তি পেতে হবে।

কিন্তু ভয় দেখিয়ে কাজীর কোনো লাভ হল না। হরিদাস হরিনামে অটল রইলেন। ক্রুদ্ধ কাজী হুকুম দিলেন—এই ধর্মত্যাগীকে বেত মারতে মারতে বাইশ বাজার ঘুরিয়ে নিয়ে আয়। যতক্ষণ না হরিনাম ছাড়ে, ততক্ষণ ধরে ওকে বেত মারবি।

কাজীর সৈন্যরা সে আদেশ পালন করল। কিন্তু হরিদাসের হরিনাম বন্ধ হল না। বরং তাঁর মুখখানি আরও বেশি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। অবশেষে সৈন্যরা ভয় পেয়ে চাবুক মারা বন্ধ করে দিল।

ভয় পেলেন কাজী নিজেও। তিনি তখন ক্ষমা চেয়ে হরিদাসকে অন্য কোথাও চলে যাবার অনুরোধ করলেন। আর সেদিন থেকেই তার নাম হ'ল 'যবন-হরিদাস'। তাঁর আগের নাম জানা যায় না।

কাজীর অনুরোধ উপেক্ষা করলেন না হরিদাস। তিনি যশোর জেলার বুঢ়ন গ্রামে তাঁর নিজের জন্মভিটে ছেড়ে দূরের এক গ্রামের প্রান্তে জঙ্গলে কুটির বাঁধলেন। মনের আনন্দে চিৎকার করে দৈনিক তিনলক্ষ হরিনাম জপ করতে থাকলেন।

ইতিমধ্যে তাঁর হরিভক্তির কথা মানুষের মুখে মুখে বহুদূরে ছড়িয়ে পড়েছে। অনেকেই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। তাঁরা তাঁর কুটিরে গিয়ে নিয়মিত সিধে দিয়ে আসেন।

কথাটা গ্রামের জমিদার রামচন্দ্র খাঁয়ের কানে এলো। তিনি হরিদাসের জনপ্রিয়তায় ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে তাঁর চরিত্র নষ্ট করতে চাইলেন। লক্ষহীরা নামে এক সুন্দরী ও স্বাস্থ্যবতী যুবতী পতিতাকে হরিদাসের চরিত্র নষ্ট করার জন্য নিযুক্ত করলেন।

একদিন গভীর রাতে লক্ষহীরা স্বল্পবাসে সজ্জিতা হয়ে হরিদাসের কুটিরে এসে উপস্থিত হল। হরিদাস তখন একাগ্রচিত্তে হরিনাম করছেন। লক্ষহীরা ঘরে ঢুকে তাঁকে স্পর্শ করলেন। হরিদাস চোখ মেললেন, লক্ষহীরাকে দেখলেন কিন্তু হরিনাম বন্ধ করলেন না। শুধু ইসারা করে তাকে বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করতে বললেন।

লক্ষহীরা ভাবল—মানুষটির তাকে মনে ধরেছে। কেবল হরিনাম করছেন বলে কাছে নিতে পারলেন না। হরিনাম শেষ হলেই তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। সে খুশি মনে বাইরে এসে বসল। হরিনাম শেষ হবার প্রতীক্ষায় বসে বসে হরিনাম শুনতে থাকল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার অশান্ত মন শান্ত হয়ে গেল। কেমন যেন একটা অনাস্বাদিত আনন্দে তার হৃদয় পূর্ণ হয়ে উঠল।

অবশেষে একসময় তাঁর খেয়াল হল। রাত ফুরিয়ে গিয়েছে। কিন্তু তখনও হরিদাস হরিনাম করে চলেছেন। সে তাড়াতাড়ি জমিদার বাড়িতে ফিরে এলো। জমিদারকে সব জানালো।

ব্যর্থতার জন্য রামচন্দ্র তাকে তিরস্কার করে আবার পরদিন রাতে হরিদাসের কুটিরে যাবার আদেশ করলেন।

পরদিন রাতে লক্ষহীরা আবার হরিদাসের কুটিরে এলো। দেখল আগের রাতের মতই হরিদাস হরিনাম করছেন। সেদিনও হরিদাস ইঙ্গিতে তাঁকে বাইরে অপেক্ষা করতে বললেন। সেদিনও লক্ষহীরা বাইরে বসে সারারাত ধরে হরিনাম শুনল। তেমনি একটা অনাস্বাদিত আনন্দে তার হৃদয়-মন পূর্ণ হয়ে উঠল। এবং হরিদাসের হরিনাম শেষ হবার আগেই রাত ফুরিয়ে গেল।

এইভাবে লক্ষহীরা আরও দুটি রাত হরিদাসের কুটিরদ্বারে অতিবাহিত করল। হরিনামের অপার মহিমায় তার মনের ভাব সম্পূর্ণ পালটে গেল। নিজের জীবনের প্রতি তার ধিক্কার জন্মালো। তার অনুশোচনা হল। সে ছুটে গিয়ে হরিদাসের পায়ের ওপর আছড়ে পড়ল।

হরিদাস তাকে সান্ত্বনা দিয়ে সৎজীবন যাপন ও হরিনাম করার উপদেশ দান করলেন। লক্ষহীরা তার বিষয়-সম্পত্তি গরীবদের বিলিয়ে দিয়ে নামকীর্তন করে দিন কাটাতে আরম্ভ করল।

লক্ষহীরার পরিবর্তনে রামচন্দ্র লজ্জিত হলেন আর হরিদাসের খ্যাতি গেল বেড়ে। ফলে দলে দলে ভক্ত তাঁর কাছে আসতে আরম্ভ করল। তাঁর পক্ষে সেখানে বসে শান্তিতে হরিনাম করা অসম্ভব হয়ে উঠল। তিনি লক্ষহীরাকে কুটিরটি দান করে আবার পথে বেরিয়ে পড়লেন। ঘুরতে ঘুরতে শান্তিপুরে এসে উপস্থিত হলেন।

অদ্বৈতাচার্য হরিদাসের কথা শুনেছিলেন। হরিদাস শান্তিপুরে আসায় তিনি ভারী খুশি হলেন। তিনি নির্জন গঙ্গাতীরে তাঁকে একটি গুহার মতো আশ্রয় তৈরি করে দিলেন। তাঁর অন্নবস্ত্রের দায়িত্ব নিজে নিলেন। হরিদাস মনের আনন্দে হরিনাম করে দিন কাটাতে থাকলেন।

প্রস্তাবটা পছন্দ হয় গ্রামবাসীদের। তারা পথের পাশে গাছতলায় আমাদের বসার ব্যবস্থা করে দেয়। যুবনেতারা চিড়ে-গুড়ের যোগাড়ে চলে যায়। দলে দলে নারী-পুরুষ ও বালক-বালিকারা আসতে শুরু করে।

চন্দ্রা যথারীতি গাছে উঠে মাইকের সাউন্ বক্স একটা ডালের সঙ্গে বেঁধে দেয়। প্রভুপাদ কীর্তন শুরু করেন।

কিছুক্ষণ কীর্তনের পরে গৌরকথা আরম্ভ হয়। প্রভুপাদ বলেন, "এখন আমি আপনাদের কাছে নিতাই-গৌর মিলনের কথা বলব।······"

"হরিবোল, হরি······" ছেলেরা জয়ধ্বনি করে। মেয়েরা উলুধ্বনি দেয়।

প্রভুপাদ বলতে থাকেন, "কিন্তু নিতাই-গৌর মিলনের কথা বলতে হলে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মহাজীবনের আদিপর্বটি খুব সংক্ষেপে একবার বলে নিতে হয়।"

"তাই বলুন বাবা!" জনৈক বৃদ্ধ গ্রামবাসী বলে ওঠেন।

তাঁর দিকে একবার তাকিয়ে মৃদু হেসে প্রভুপাদ বলতে থাকেন, "বীরভূমের মল্লারপুর স্টেশন থেকে মাইল সাতেক দূরে একচক্রা গ্রাম। গ্রামের প্রতিষ্ঠাবান পণ্ডিত মুকুন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। ডাক নাম হাড়াই ওঝা। স্ত্রীর নাম পদ্মাবতী। গৌর আবির্ভাবের আট বছর আগে মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশীতে পদ্মাবতীর একটি পুত্র হ'ল। হাড়াই পণ্ডিত ছেলের নাম রাখলেন কুবের।

দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়। কুবের বড় হয়। কিন্তু সে সংসারের আর দশটা ছেলের মতো নয়। তার খেলাও বিচিত্র। সে কৃষ্ণলীলা নিয়ে খেলা করে। কখনও চানুর আর মুষ্টিককে হারিয়ে দেয়, আবার কখনও বা কৃষ্ণকে হারিয়ে গোপীদের মতো কান্না জুড়ে দেয়।

বাপ-মা ভয় পান। ভাবেন, এতটুকু ছেলে, এসব কথা জানল কি করে!

এইভাবে বছর কাটে, বছরের পরে বছর। কুবের বড় হয়। তখন তাঁর বয়স আট বছর। দোল পূর্ণিমার রাত। হঠাৎ কুবের একটা প্রচণ্ড চিৎকার করে উঠলেন। সবাই তাঁর এই বিকট হুঙ্কারে বিস্মিত হলেন। কিন্তু কেউ কিছু বুঝতে পারলেন না। পারবেন কেমন করে? তাঁরা তো আর জানেন না যে সেই শুভমুহূর্তে নবদ্বীপের মাটিতে কলির ভগবান পদার্পণ করলেন।

কিন্তু সেই থেকে কুবেরের মন উড়ু-উড়ু। মা-বাবা বুঝতে পারলেন, ছেলের ঘর ভাল লাগছে না। তাই তাঁরা তাঁকে আরও বেশি আঁকড়ে ধরেন। কুবের ঘরে থেকে যান কিন্তু তাঁর মনের পরিবর্তন হয় না। সময় গড়িয়ে চলে।

আরও কয়েক বছর কেটে যায়। তারপরে একদিন একজন তরুণ সন্ন্যাসী তাঁদের বাড়িতে এলেন। হাড়াই পণ্ডিত তাঁর যথাসাধ্য সেবা করলেন। পরদিন সকালে বিদায় নেবার সময় সন্ন্যাসী হাড়াইকে বললেন—আমার একটি ভিক্ষে আছে।

হাড়াই উত্তর করলেন—আপনাকে আমার অদেয় কিছুই নেই।

—আমি তীর্থদর্শনে যাচ্ছি। আমার ইচ্ছে, আপনার বড় ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে যাই।

হাড়াইয়ের বুক কেঁপে উঠল। শুনে পদ্মাবতী কেঁদে উঠলেন। কিন্তু অতিথি নারায়ণ। তাঁকে তো ফিরিয়ে দেওয়া যায় না! তাঁর দাতাকর্ণ ও মহারাজা হরিশ্চন্দ্রের কথা মনে পড়ে। পিতার পরামর্শ না শুনে কর্ণ ব্রাহ্মণ-বেশী অতিথি ইন্দ্রকে কবজ-কুণ্ডল দান করে নিজের মৃত্যু ডেকে এনেছিলেন, মহারাজা হরিশ্চন্দ্র অতিথি বিশ্বামিত্রের আদেশে রাজ্য ত্যাগ করে দুঃসহ দুঃখ-কষ্ট মাথায় তুলে নিয়েছিলেন।

তাই শেষ পর্যন্ত হাড়াইকে ছেলে হারাতে হল। কিশোর কুবেরের হাত ধরে সন্ন্যাসী তীর্থের পথে যাত্রা করলেন। পিতা-মাতা সজল চোখে পুত্রকে বিদায় দিলেন।

এই তরুণ সন্ন্যাসী আর কেউ নন নিমাইয়ের দাদা বিশ্বরূপ। শঙ্করারণ্যের সঙ্গে শুরু হ'ল কিশোর নিত্যানন্দের তীর্থ পর্যটন—বক্রেশ্বর বৈদ্যনাথ গয়া কাশী প্রয়াগ মথুরা বৃন্দাবন হস্তিনাপুর ও কুরুক্ষেত্র হয়ে হরিদ্বার। তারপরে পশ্চিমে, প্রভাস ও দ্বারকা। সেখান থেকে দক্ষিণে, একেবারে কন্যাকুমারী পর্যন্ত।

অবশেষে দাক্ষিণাত্যের পাণ্ডুরপুরে পৌঁছে থামলেন শঙ্করারণ্য। কুবের তখন আর কিশোর নয়, তীর্থের পথে পথে তাঁর বয়স বেড়েছে। তিনি তখন সুদর্শন যুবক, তিনি তখন সন্ন্যাসী—অবধূত।

শঙ্করারণ্য তাঁকে নিবিড় ভাবে আলিঙ্গন করলেন। বিশ্বরূপ কুবেরের দেহের মধ্যে বিলীন হয়ে গেলেন। কুবের হয়ে গেলেন নিমাইয়ের অগ্রজ, হলেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অগ্রজ বলরাম।

নিত্যানন্দ অবধূত নাম নিয়ে কুবের আবার তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াতে থাকলেন। বহুদিন বাদে হঠাৎ একদিন পথে তাঁর শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর সঙ্গে দেখা হ'ল। শ্রীকৃষ্ণের পরমপ্রেমিক পুরীজির কাছে তিনি দীক্ষা গ্রহণ করলেন। অর্থাৎ অদ্বৈতাচার্য এবং শ্রীচৈতন্যের দীক্ষাগুরু ঈশ্বরপুরীর তিনি গুরুভাই হলেন।

দীক্ষাগুরু হয়েও পুরীজি তাঁকে বললেন—তুমি তো প্রকট প্রেমমূর্তি। কৃষ্ণের অশেষ কৃপা তোমার সঙ্গে দেখা হল, তোমাকে আমি দীক্ষা দিতে পারলাম।

—কিন্তু কোথায় কৃষ্ণ? শিষ্য ব্যাকুল কণ্ঠে গুরুকে প্রশ্ন করেন।

গুরু উত্তর দেন—নদীয়ায়। কৃষ্ণ এযুগে নিমাই নাম নিয়েছেন। পরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হবেন।

"অতএব নিত্যানন্দ নবদ্বীপের পথে ছুটে চলেন।"

একবার থামলেন প্রভুপাদ। মতির কাছ থেকে জলের ঘটিটি চেয়ে নিয়ে এক ঢোক জল খেয়ে নিলেন। তারপরে আবার বলতে শুরু করলেন, "ভক্তবৃন্দ, নিতাই নবদ্বীপের পথে ছুটে আসছেন। তিনি আসতে থাকুন। আমরা বরং এই অবসরে নবদ্বীপের অবস্থাটি দেখে নিই একবার।

শ্রীবাস অঙ্গনে তখন নিত্য নিমাইয়ের সংকীর্তন লীলা। হরিদাস এসে তাঁর সঙ্গে যোগ দেবার পরে সংকীর্তন আরও সুমধুর হয়ে উঠেছে। এই সময় হঠাৎ একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে নিমাই ভক্তদের বলে বসলেন—একটা অপূর্ব স্বপ্ন দেখলাম। একখানি তালধ্বজ রথ আমার বাড়ির সামনে এসে থামল। হলধরের মতো একজন বিশালদেহী মহাপুরুষ সেই রথ থেকে অবতরণ করলেন। তাঁর পরনে নীল কাপড়, মাথায় লাল পাগড়ি, হাতে কমণ্ডলু। তিনি বার বার কাকে যেন জিজ্ঞেস করলেন—এই কি নিমাই পণ্ডিতের বাড়ি?

একবার থামলেন নিমাই। তারপরে আবার বললেন—আমার বিশ্বাস নবদ্বীপে কোনো মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে! তোমরা বেরিয়ে পড়ো, তাড়াতাড়ি তাঁকে খুঁজে নিয়ে এসো।

কিন্তু ভক্তরা তাঁকে খুজে পাবেন কেন? বলরাম এসেছেন কৃষ্ণের কাছে, সখারা তাঁকে খুঁজে পাবেন কেমন করে? স্বয়ং কৃষ্ণকেই যে যেতে হবে তাঁর কাছে।

তাছাড়া নিমাই যে সত্যই কৃষ্ণ, তা পরীক্ষা করবার জন্যই তো নিতাই তখন নবদ্বীপে লুকিয়ে রয়েছেন। শ্রীবাস ও হরিদাসের সাধ্য কি তাঁকে খুঁজে বের করেন।

তাই শ্রীবাস ও হরিদাস ফিরে এসে নিমাইকে বললেন—তুমি একটা বাজে স্বপ্ন দেখেছো, কেউ আসে নি নবদ্বীপে।

নিমাই হেসে বললেন—বেশ চলো আমার সঙ্গে আমি তাঁকে খুঁজে বের করছি।

সদলবলে নিমাই সোজা এসে উপস্থিত হলেন নন্দন আচার্যের বাড়িতে। দেখলেন অবধূত বেশে বলরাম বসে আছেন, ঠিক স্বপ্নে যেমনটি দেখেছিলেন— 'ধ্যানসুখে পরিপূর্ণ হাসয়ে সদায়।'

নিতাইও চিনতে পারলেন কৃষ্ণকে—'আপন ঈশ্বর'-কে।"

থামলেন প্রভুপাদ। চারিদিকে একবার দেখে নিয়ে আবার বলতে থাকলেন, "ভক্তবৃন্দ, নন্দন আচার্য হচ্ছেন আনন্দের আচার, তাঁর বাড়ি হচ্ছে আনন্দের আলয়। চৈতন্য অর্থাৎ চেতনার সঙ্গে নিত্যানন্দ অর্থাৎ নিত্যনব-নবায়মান আনন্দের মিলন হবে। এ কি আর কোথাও হতে পারে? তাই তো নিতাই আশ্রয় নিয়েছিলেন নন্দন আচার্যের আলয়ে আর গৌর ছুটে এলেন সেখানে।

নিতাই গৌরের দেখা পেল। গৌর দেখলেন নিতাই কেবল তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন কোনো কথা বলছেন না। তখন ভাবলেন, একবার যাচাই করে নেওয়া যাক। তাই তিনি শ্রীবাসকে ভাগবতের একটি শ্লোক আবৃত্তি করতে বললেন। শ্রীবাস শ্লোকটি আবৃত্তি করতেই নীরব নিতাই সরব হলেন। বলে উঠলেন—তুই আমার কানাই না রে? কিন্তু তোর চূড়া আর বাঁশী কোথায়?

নিমাই উত্তর দিলেন—শ্রীপাদ, 'ব্রজের লীলা দৌড়াদৌড়ি, ন'দের লীলা গড়াগড়ি। ব্রজের লীলা বাঁশীর তান, ন'দের লীলা নাম-গান। ব্রজের বেশ ধরাচূড়া, ন'দের বেশ কৌপীন পরা।'

তারপরে সহসা গম্ভীর হয়ে নিমাই নিতাইকে প্রশ্ন করলেন—আগামীকাল গুরুপূর্ণিমা, কোথায় বসে ব্যাসপূজা করবে?

নিতাই শ্রীবাসকে দেখিয়ে বললেন—এই বামনার বাড়িতেই আমার ব্যাস-পুজো হোক, কি বলো?

শ্রীবাস তাঁর কথায় কিছুই মনে করলেন না, বরং খুশি হলেন—তিনি নিত্যানন্দের ব্যাসপুজার পূজারী হতে পারবেন।

নিমাইও খুশি হলেন। নিত্যানন্দের ব্যাসপূজার জন্য শ্রীবাস অঙ্গন সবচেয়ে প্রশান্ত প্রাঙ্গণ। নন্দন আচার্যের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিতাই নিমাইয়ের সঙ্গে শ্রীবাসের বাড়িতে চললেন।"

আবার থামলেন প্রভুপাদ। আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "ভক্তবৃন্দ, এটি ১৫০৯ সালের জুন কিংবা জুলাই মাসের ঘটনা। অর্থাৎ তখন নিমাইয়ের বয়স তেইশ বছর আর নিতাইয়ের একত্রিশ। যাক্‌গে যেকথা বলছিলাম,

সেদিনই নিতাই শ্রীবাসের অতিথি হলেন। সস্ত্রীক শ্রীবাস তার যথাসাধ্য সেবা করলেন। খেয়ে-দেয়ে নিতাই শুয়ে পড়লেন।

কিন্তু মাঝরাতে নিতাইয়ের চিৎকারে শ্রীবাস ও তাঁর স্ত্রীর ঘুম ভেঙে গেল। যেমন তেমন চিৎকার নয় একেবারে হুঙ্কার। তাঁরা তাড়াতাড়ি নিতাইয়ের শয্যাপাশে ছুটে এলেন। দেখলেন নিতাই তাঁর দণ্ড ও কমণ্ডলু ভেঙে ফেলেছেন।

সবিস্ময়ে শ্রীবাস জিজ্ঞেস করলেন—দণ্ড-কমণ্ডলু ভাঙলেন কেন?

—আর কি হবে? নিতাই নির্বিকার স্বরে পাল্টা প্রশ্ন করেন। বলেন—যাঁকে পাবার জন্য এত সাধন-ভজন করলাম, এগুলি সম্বল করে এত তীর্থে ঘুরে বেড়ালাম, তাঁকে যখন খুঁজে পেয়েছি, তখন আর এই বোঝা বয়ে লাভ কি?

শ্রীবাস তখন সোজা ছুটে এলেন নিমাইয়ের বাড়িতে। তাঁকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে সব ঘটনা খুলে বললেন। সব শুনে গৌর এলেন নিতাইয়ের কাছে। এসেই হঠাৎ নিতাইকে বললেন—ভোর হতে আর দেরি নেই, চলো গঙ্গাস্নান করে আসি।

নিতাই আপত্তি করলেন না। সবাইকে নিয়ে নিমাই গঙ্গাতীরে এলেন। নিতাই তাড়াতাড়ি গিয়ে জলে নামলেন। প্রথমে দণ্ড-কমণ্ডলু জলে ভাসিয়ে দিলেন। তারপরেই একটা কুমির দেখে তাকে ধরবার জন্য সাঁতার দিলেন। সবাই হায় হায় করে উঠলেন। কিন্তু নিতাই নির্বিকার। তিনি কুমিরের দিকে এগিয়ে চলেছেন।

হঠাৎ নিমাই নিতাইকে ধমক লাগালেন—তোমাকে না আজ ব্যাসপুজো করতে হবে! তাড়াতাড়ি উঠে এসো!

ব্যস। নিতাই ফিরে এলেন তীরে। স্নান শেষ করে সবার সঙ্গে শ্রীবাসের বাড়ি রওনা হলেন।

সেখানে শুরু হ'ল নিত্যানন্দের ব্যাসপূজা। পুজারী স্বয়ং শ্রীবাসাচার্য। একসময় পূজা শেষ হল। নিমাই তখন আঙিনার আরেকদিকে ভক্তদের সঙ্গে কীর্তন করছেন। পূজাশেষে শ্রীবাস একখানি মালা নিত্যানন্দের হাতে দিয়ে বললেন—এটি ব্যাসদেবের আসনের ওপরে রাখুন!

নিত্যানন্দ কিন্তু সেকথা শুনলেন না, তিনি এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলেন। তাঁর চোখে এক আশ্চর্য উদাস দৃষ্টি।

শ্রীবাস বিরক্ত হলেন। ভাবলেন আবার বোধহয় পাগলামী শুরু হয়ে

গেল। তবু তাগিদ দিলেন—একি! বসে রইলেন কেন? ব্যাসদেবকে মালা দিন, মন্ত্রপাঠ করুন।

কিন্তু কাকে বলা! নিত্যানন্দ তেমনি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে কাকে যেন খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

এবারে শ্রীবাস নিজেকে অসহায় বোধ করলেন। জনৈক ভক্তকে নিমাইয়ের কাছে পাঠালেন। খবর পেয়ে নিমাই ছুটে এলেন পূজাস্থলে। শ্রীবাসের কাছে সব শুনে এগিয়ে গেলেন নিতাইয়ের সামনে। বললেন—মালা হাতে নিয়ে বসে রয়েছো কেন? ব্যাসদেবকে মালা পরাও!

নিতাইয়ের বিষণ্ন মুখখানি সহসা আনন্দে উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠল। তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তারপরেই মালা হাতে নিয়ে নাচতে শুরু করে দিলেন। নাচতে নাচতে হঠাৎ হাতের মালা পরিয়ে দিলেন গৌরের গলায়।

আশ্চর্য নিমাই তাঁকে কিছুই বলতে পারলেন না। কেবল দুহাত বাড়িয়ে নিত্যানন্দকে বুকে টেনে নিলেন। "নিতাই-গৌর এক হয়ে গেলেন।"

॥ চোদ্দ ॥

গৌরকথার পরে চিড়েমহোৎসব হল। চিড়ে গুড় ও ঠাণ্ডাজল ভালই লাগল। তারপরে গ্রামবাসীদের কাছ থেকে ছুটি পাওয়া গেল। তবে বিদায় নেবার আগে প্রভুপাদকে প্রতিশ্রুতি দিতে হল—আবার পরিক্রমা নিয়ে এলে এই গ্রামে রাত কাটাবেন। ছোট গ্রাম। কিন্তু গ্রামবাসীদের বড়-মন আমাকে মুগ্ধ করল। এবং শেষ পর্যন্ত সজল চোখে বিদায় নিতে হল। তাঁরা তেমনি সারি বেঁধে হাতজোড় করে পথের ধারে দাঁড়িয়ে রইলেন। কেউবা সেই একই কথা বললেন—আবার আসবেন। আমরাও একই ভাবে মাথা নেড়ে এগিয়ে চলি পরিক্রমার পথে।

মিনিট বিশেক হেঁটে আবার একটি গ্রাম। তার চেয়েও বড় কথা একটা চায়ের দোকান এবং দোকানী এই অসময়ে চা বানাতে রাজী আছে। অতএব আমরা কয়েকজন শোভাযাত্রার পেছনে পড়ে যাই। আর তা দেখে মানসী খুশি হয়। ওর ধারনা চা না খেলে আমার শরীর খারাপ হবে। কিন্তু নিজে চা ছেড়ে দিয়ে ওর যে এখন জানা উচিত, চায়ের সঙ্গে শরীরের তেমন সম্পর্ক নেই। চায়ের নেশাটি একান্তই মানসিক ব্যাপার।

চা খেয়ে বেশ কয়েক মিনিট জোরে জোরে পা চালাতে হল। অবশেষে শোভাযাত্রাকে ধরে ফেললাম। আর তার পরেই দেখা হয়ে গেল গঙ্গার সঙ্গে। নিতাই-গৌরের গঙ্গা। এই গঙ্গা আর মাকে দর্শন করার জন্য সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শ্রীক্ষেত্র থেকে ছুটে এসেছিলেন নবদ্বীপে।

কিন্তু গৌরের কথা এখন থাক, তার চেয়ে গঙ্গার কথা হোক। সেদিন নিদয়ায় গঙ্গা পার হবার পরে আর গঙ্গার সঙ্গে দেখা হয় নি। গঙ্গা আমাদের ডানদিকে। এদিকটায় বাড়ি-ঘর-নেই। শুধুই ক্ষেত আর বেলাভূমি। বাড়ি-ঘর ও বড় বড় গাছপালা রয়েছে বাঁদিকে। তবে মোটেই ঘনবসতি নয়।

দেখতে দেখতে এগিয়ে চলেছি। হঠাৎ নজর পড়ে সামনের দিকে। মানসী দাঁড়িয়ে রয়েছে পথের পাশে। নিশ্চয়ই আমাকে কিছু বলবে। তাই শোভাযাত্রা থেকে বেরিয়ে এসেছে। আমি পা চালিয়ে তার কাছে আসি। সে জিজ্ঞেস করে, "আচ্ছা, এ বাড়িটা এমন উঁচুতে কেন বল তো?" ইসারা করে সে বাঁদিকে পথ থেকে খানিকটা উঁচুতে অবস্থিত একটা কাঠ ও টিনের বাড়ি দেখিয়ে দেয়।

"বাড়ি নয়, স্কুল।" আমি কিছু বলতে পারার আগেই কাশীনাথ উত্তর দেয়। সে যেন কখন আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

"পাশের ঐ ছোট দালানটাও কি স্কুল?" মানসী জানতে চায়।

কাশীনাথ বলে, "না, ওটা মন্দির। ওখানে দুর্গাপূজা হয়।"

"তা না হয় হ'ল। কিন্তু মন্দির ও স্কুলের ভিৎ এত উঁচু কেন?" মানসী আবার প্রশ্ন করে।

এবারে আমি আবার দেখি। পথের পাশে একফালি খেলার মাঠ। সমতল হলেও সবুজ নয়। মাঠের পরে স্কুলবাড়ি ও মন্দির। মাটি থেকে পাঁচ-ছ' ফুট উঁচু একটা মাটির ঢিবির ওপরে মন্দির, আর তেমনি উঁচু কাঠের পাটাতনের ওপরে স্কুলঘর—দুদিকে দু'খানি মই। মানে মই বেয়ে ছেলে-মেয়েদের ওঠা-নামা করতে হয়। কাজটা সহজ নয়। তবে তাদের বোধকরি অভ্যেস হয়ে গেছে। না হয়েই বা উপায় কি, খরা আর বন্যা যে এই হতভাগ্য দেশের বাৎসরিক অভিশাপ।

কাশী সেই কথাই বলে মানসীকে। বলে, "দেখতেই তো পাচ্ছেন, গঙ্গা কত কাছে। বর্ষাকালে বন্যার জলে ভেসে যায় এসব জায়গা। তাই মন্দির আর স্কুল অত উঁচুতে।"

"কিন্তু এসব জায়গায় অতটা উঁচু জল হলে, ছেলে-মেয়েরা স্কুলে আসে কেমন করে?"

"জল যখন খুব বেশি হয়, তখন স্কুল ছুটি থাকে। অল্প জল হলে ছাত্র-ছাত্রীরা জল-কাঁদা ভেঙেই স্কুলে আসে।"

মানসী আর কোনো প্রশ্ন করে না। তাই কাশীনাথ নীরবে পথ চলে। সে আমাদের আগে আগে চলেছে। আমিও নীরবে পথ চলেছি। ভাবছি এই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের কথা। গ্রামবাংলায় বর্ষাকাল প্রায় পাঁচ মাস। জল-কাঁদা না ভেঙে তারা স্কুলে আসবে কেমন করে? তবু এদের ভাগ্য ভাল। স্কুলঘরটা উঁচুতে তৈরি করা হয়েছে, নইলে তো সারা বর্ষাকালই স্কুল বন্ধ থাকত।

কিন্তু না, বর্ষা নয়, আমি ভাবছি বন্যার কথা। আমরা বাৎসরিক বন্যার শিকার। এবং এ ব্যাপারে শহর আর গ্রামের অবস্থা একই। অথচ দেশ স্বাধীন হবার পর থেকেই বন্যা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চলেছে। নানা পরিকল্পনা রূপায়িত হয়েছে, নানা পরিকল্পনা রূপায়ণের চেষ্টা চলেছে। টাকা যাচ্ছে বন্যার মতো কিন্তু বন্যা রোধ করা যাচ্ছে না।

আমার ধারণা নদীতে বাঁধ দিয়ে আমরা বন্যা রোধ করার চেষ্টা করছি বলেই এই ব্যর্থতা। বর্ষার জল নদী দিয়ে সাগরে যায়। নদী মজে এসেছে, নদী জল টানতে পারছে না বলেই বন্যা। নদীর সংস্কার না করতে পারলে বন্যা রোধ করা যাবে না। এবং আমাদের অবহেলায় ডিব্রুগড় থেকে দ্বারকা পর্যন্ত ভারতের সব নদীর এখন একই অবস্থা। ফলে আসাম থেকে গুজরাত পর্যন্ত সর্বত্র বন্যা।

এই গেল বন্যার কথা, এবারে পথের কথা ভাবা যাক—বাংলার পথ। না, না, থাক। পথের প্রসঙ্গ না তোলাই ভাল হবে। কারণ এই একটা বিষয়ে আমরা যখন আজও চৈতন্যযুগে রয়ে যেতে পেরেছি, তখন পথ মেরামত করতে বলে অযথা অবৈষ্ণবের মতো আচরণ করব কেন? তার চেয়ে শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত কীর্তন করতে করতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আমলের পথ দিয়ে এগিয়ে চলা যাক।

মাটির পথ বেয়ে অনেকটা উঁচু বাঁধানো পথে উঠে এলাম। এটা কৃষ্ণনগর-বর্ধমান রোড। এই পথের ওপরেই তৈরি হয়েছে গৌরাঙ্গ সেতু। সামনেই দেখা যাচ্ছে। এখনও খুলে দেওয়া হয় নি। তবে কিছুদিনের মধ্যে দেওয়া হবে। তখন নবদ্বীপ আসতে আর নৌকোয় গঙ্গা পার হবার দরকার পড়বে না।

সেতুর দিকে না এগিয়ে আমরা সোজাসুজি বড় রাস্তাটিকে অতিক্রম করে তারই গা বেয়ে নেমে এলাম নিচের সমতলে। গৌরাঙ্গ সেতু পড়ে রইল পেছনে। গঙ্গাকে ডাইনে রেখে ক্ষেতের পাশ দিয়ে এগিয়ে চলি সামনে। আমরা দক্ষিণে চলেছি, গঙ্গা সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। গঙ্গার ওপারে নবদ্বীপ শহরের উপকণ্ঠ। এপারে শুধুই ক্ষেত।

গৌরাঙ্গ সেতু থেকে প্রায় আধঘণ্টা পথ চলে একটা বড়গ্রামে পৌঁছন গেল। গ্রামের নাম আনন্দবাস। এখন সকাল দশটা। আজ বেশ তাড়াতাড়ি পথ চলেছি। কিন্তু এর কোনো প্রয়োজন ছিল না। কারণ আজ আমরা মাত্র সাত মাইল হাঁটব। গতকাল সুবর্ণবিহার থেকে এগারো মাইল পথ পেরিয়ে মাজদিয়া পৌঁচেছি।

তাড়াতাড়ি পথ চলার জন্যই হোক, কিংবা রোদের তেজ বেশি হবার জন্যই হোক, এখন বেশ গরম লাগছে। একটু শ্রান্ত বোধ করছি। পিপাসাও পেয়েছে।

"তোমার কি হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে?"

মানসীর আকস্মিক প্রশ্নে চমকে উঠি। অস্বীকার করতে পারি না।

বলি, "গরম লাগছে, পিপাসা পেয়েছে।"

"তাহলে এখানে একটু ব'সো, আমি জলের যোগাড় করছি।"

আমি তার অবাধ্য হই না। পথের পাশে একখানা মেটেঘরের দাওয়ায় বসে পড়ি।

ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে দুজন মহিলা আমাদের সংকীর্তন শোভাযাত্রা দেখছিলেন। তাঁদের কাছে গিয়ে মানসী বলে, "একঘটি খাবার জল দেবেন, খাবার জল।"

"জল!" অপেক্ষাকৃত বয়স্কা মহিলা বলে ওঠেন।

মানসী মাথা নাড়ে।

এবারে মহিলা বলেন, "কিন্তু মা, আপনারা কি আমাদের জল খাবেন?"

"না খাবার কি আছে?" মানসী পাল্টা প্রশ্ন করে।

"যাঁরা পরিক্রমায় আসেন, তাঁরা খান না।"

"কেন বলুন তো।"

"আমরা যে ছোট জাত।"

"আমরা সবাই মানুষ, কেউ ছোট কিংবা বড় নই। আপনি জল নিয়ে আসুন!"

মানসীর কথায় মহিলার মুখখানিতে হাসি ফুটে ওঠে। তিনি সঙ্গিনীকে নিয়ে ঘরের ভেতরে চলে যান।

মানসী আপন মনে বলে ওঠে, "সত্যই দুর্ভাগা দেশ, চৈতন্য-আবির্ভাবের পরে পাঁচশ' বছর হতে চলল, আজও জাত-পাতের সংকীর্ণতা শেষ হল না।"

একঘটি জল আর এলুমিনিয়ামের একটা গ্লাস নিয়ে মহিলা বেরিয়ে আসেন। তাঁর সঙ্গে একটি কিশোরী, হাতে একটা টিনের প্লেটে কয়েকখানি বাতাসা। মানসী বলে, "আবার বাতাসা আনলেন কেন?"

"শুধু জল যে কাউকে দিতে নেই মা! আমরা গরীব মানুষ, আর কি দিতে পারি বলুন। নিন, বাতাসা মুখে দিয়ে জল খেয়ে নিন।"

আমরা তাই করি। আর মনে মনে ভাবি আমি ভাগ্যবান। পথে পথে বার বার গ্রামবাংলার গরীব মানুষদের এমন আন্তরিক আতিথেয়তার পরিচয় পেয়ে চলেছি।

প্রাণ ভরে ঠাণ্ডা জল পান করে শরীরের সকল শ্রান্তি দূর করি। তারপরে মহিলাটির কাছ থেকে বিদায় নিই। বিদায় বেলায় মানসী তাঁকে বলে, "মা, জলের যেমন জাত নেই, মানুষের মধ্যেও তেমনি জাতিভেদ থাকা ঠিক নয়।

মানুষই মানুষের জাত সৃষ্টি করেছে। শ্রীচৈতন্য জাত-পাতের সংকীর্ণতা থেকে সমাজকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। আমরা তাঁকে স্মরণ করে এই পরিক্রমা করছি। আমরা কেন আপনার হাতের জল খাবো না?"

মানসীর কথায় মহিলাটির চোখে জল এসে যায়। বোধকরি এমন করে একথা আর তাঁকে কেউ কোনদিন বলে নি। তিনি চোখ মুছে কোনরকমে বলেন, "আপনাদের ভাল হোক মা, আপনারা সুখী হোন।"

তারপরেই তিনি তাড়াতাড়ি ভেতরে চলে যান। আমরা আর কিছু বলার সুযোগ পাই না। বুঝতে পারছি নিজেকে সামলে নেবার জন্যই তিনি পালিয়ে গেলেন আমাদের সামনে থেকে। একটু কাল চুপ করে দাঁড়িয়ে এগিয়ে চলি। আমরা যে পথিক। আমাদের তো থামবার অবকাশ নেই।

চলতে চলতে কিন্তু মহিলাটির কথাই ভাবতে থাকি। ভাবি—এরাই আমার গ্রামবাংলার সহজ সরল সাধারণ মানুষ। একটু দরদ, একটু ভালোবাসা, একটু সহানুভূতির পরশ পেলেই এরা কেঁদে ভাসায়। এদের জন্যই শ্রীচৈতন্য সেদিন পথে নেমেছিলেন। আজ তিনি নেই কিন্তু এরা আজও তেমনি রয়ে গিয়েছে।

আনন্দবাস বেশ বড় গ্রাম। জনৈক বৃদ্ধ গ্রামবাসী জানালেন প্রায় হাজার ঘর বসতি। তার মানে পাঁচ-ছ' হাজার মানুষের গ্রাম। পথের পাশে মাঝে মাঝে টালি অথবা টিনের চালের পাকাবাড়ি, তবে অধিকাংশই খড় আর মাটির ঘর। শোভাযাত্রা চলে গিয়েছে। তবু গ্রামবাসীরা অনেকে এখনও পথের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাঁরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের দেখছেন। আমরাও তাঁদের দেখতে দেখতে পথ চলেছি।

চারদিক থেকে চারটি পথ এসে এখানে মিলিত হয়েছে। পথের মোড়ে একটা বটগাছ। গাছের গোড়ায় মাচা বাঁধা। বোধকরি সকাল-সন্ধ্যায় মোড়লদের আড্ডা বসে। এখন কেউ নেই। আজ সকাল থেকেই শরীরটা তেমন সুবিধের মনে হচ্ছে না। বটের শীতল ছায়ায় কয়েক মিনিট জিরিয়ে নেওয়া যাক।

আমাকে বসতে দেখে মানসীও আমার পাশে বসে পড়ে। বলে, "তোমার বোধহয় গরম লাগছে। সোয়েটারটা খুলে নাও।"

সে, ঠিকই বলেছে। আমি সোয়েটার খুলে কাঁধের ওপর রাখি! মানসী বলে, "আমাকে দাও, আমি ঝোলায় ভরে নিচ্ছি।"

"কি দরকার?" আমি বলি, "অযথা তোমার ঝোলাটা ভারী হয়ে যাবে।

এই তো আমার কাঁধে বেশ রয়েছে।"

"না।" রুক্ষস্বরে মানসী বলে, "তারপরে কাঁধ থেকে একসময় পথে পড়ে যাক, তুমি তো টেরও পাবে না। পরে ঠাণ্ডা লাগিয়ে কেবল আমার ঝামেলা বাড়াবে।" সে আমার কাঁধ থেকে সোয়েটারটা তুলে নিজের ঝোলায় ভরে নিয়ে পথ চলতে থাকে।

আমি নিঃশব্দে তাকে অনুসরণ করি।

পথের ডানদিকে একটা বেশ বড় পুকুর। না, ভুল হল একটি অসম্পূর্ণ জলাশয়। কারণ এখনও কাটা শেষ হয় নি। অর্ধেকটা জুড়ে জল, বাকি অর্ধেকটায় মাটি জেগে রয়েছে। সামনে সুবিরাট সাইনবোর্ড—'ভালুকা, গ্রাম পঞ্চায়েত, লালদীঘি, স্থাপিত ১৯৭৯।'

যতদূর জানি 'স্থাপিত' শব্দের অর্থ—স্থাপন করা হয়েছে এমন কিছু। সেই অর্থে দীঘি স্থাপিত করা যায় কি? কিন্তু তার চেয়ে বড় প্রশ্ন—তিন বছরেও এ দীঘি কাটা শেষ হল না কেন আর কেনই বা এর নাম লালদীঘি রাখা হল?

কিন্তু কে আমাকে এ প্রশ্নের উত্তর দেবে? অতএব মনের প্রশ্ন মনে রেখে এগিয়ে চলি।

আশ্রম মাতার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। তিনি শেষ পর্যন্ত রিক্সা নেন নি। জনৈকা শিষ্যার সঙ্গে ধীরে ধীরে হেঁটে চলেছেন। তিনি সবার শেষে পথ চলেন। আমরা জল খাবার জন্য গ্রামে থেমেছিলাম, তিনি সেই ফাঁকে আমাদের ছাড়িয়ে এসেছেন।

শুনেছি তাঁর বয়স আটের ঘরে। তাহলেও মাতাজী মোটেই জরাগ্রস্ত হন নি। একটু আস্তে হলেও দিব্যি হেঁটে চলেছেন। চলতে চলতে বলছেন, "কেদার-বদ্রী, গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী ও অমরনাথ দর্শন করেছি। কৃষ্ণের কৃপায় ব্রজমণ্ডল পরিক্রমও হয়েছে। গৌড়মণ্ডল পরিক্রমাটা বাকি ছিল, বাবার দয়ায় এবারে এটাও হয়ে যাবে। তোরা দেখে নিস, আমি ঠিক পারব।"

পারবেন, নিশ্চয়ই পারবেন। দুর্গম ও দুস্তর তীর্থপথে আনন্দ আর আত্ম-বিশ্বাসই প্রধান পাথেয়।

অতএব নিতাই-গৌরের কাছে তাঁর সাফল্য প্রার্থনা করে এগিয়ে চলি। সংকীর্তন শোভাযাত্রা এখনও দেখা যাচ্ছে না, পথের বাঁকে আড়ালে রয়েছে। কিন্তু কীর্তনের শব্দ কানে ভেসে আসছে। আমরা সেই শব্দ শুনতে শুনতে পথ চলেছি।

পথের দু-পাশে ক্ষেত। ডিজেল পাম্প চালিয়ে কুয়ো থেকে ক্ষেতে জল

দেওয়া হচ্ছে। কলাই শর্ষে টমেটো আর পালং শাকের ক্ষেত।

মানসী দাঁড়িয়ে পড়ে। বলে, "একটু দেখে নিই।" তারপরেই রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা জনৈক বৃদ্ধ গ্রামবাসীকে প্রশ্নবাণে জর্জড়িত করে তোলে।

নিরুপায় মানুষটি জানান—এই পাম্প্ তাঁদের নিজেদের নয়, ভাড়া করে এনেছেন। তেল সহ একঘণ্টার ভাড়া দশটাকা। একবিঘা ক্ষেত জল দিতে চার-পাঁচ ঘণ্টা সময় লাগে।

চলতে চলতে আমরা আবার গঙ্গার কাছে চলে এসেছি। পথের দু-পাশেই ক্ষেত। ডানদিকে ক্ষেত পেরিয়ে গঙ্গা। আমরা এখন দক্ষিণ-পুবে চলেছি। খানিকটা সামনে গিয়ে গঙ্গা ডাইনে অর্থাৎ পশ্চিমে বাঁক নিয়েছে। বাঁকের মুখে কয়েকখানি ঘর দেখা যাচ্ছে। কীর্তনের শব্দটা আর কানে আসছে না। তাঁরা কি অনেকটা এগিয়ে গিয়েছেন? তাড়াতাড়ি পা চালাই।

"এমন সাধন-ভজন করব যে তোদের ভস্ম করে ফেলব। রাধারাণী কৃপা করলে, আমি সব পারব। তাই তো গুরুদেবের সঙ্গে পরিক্রমায় এসেছি। রাধারাণী নিশ্চয়ই কৃপা করবেন আমাকে।"

কথাগুলো হঠাৎ কানে আসে। আমরা থমকে দাঁড়াই। সামনে জনৈকা যুবতী সহযাত্রী পথ চলেছে। সে-ই আপনমনে কথাগুলো বলছে। সে পারিবারিক কলহের প্রতিশোধ নিতে চাইছে। আর তাই নাকি পরিক্রমায় এসেছে। তার বিশ্বাস গুরুদেবের সঙ্গে এই পরিক্রমা করার ফলে রাধারাণী তাঁকে কৃপা করবেন। এবং তাঁর কৃপায় সে প্রতিপক্ষকে ভস্ম করে ফেলবে।

আবার চলা শুরু করি। মেয়েটিকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে আসি। বেশ কিছুক্ষণ নীরবে পথ চলার পরে, সহসা মানসী বলে, ওঠে, "সত্যি সখা, দিনগুলো বড় আনন্দে কাটছে।"

কথাটা ভাল লাগে। বলি, "আমার ভয় ছিল, তোমার হয়তো ভাল লাগবে না। তুমি আনন্দ লাভ করছ জেনে নিশ্চিন্ত হলাম।"

"কিন্তু তুমি তো আমাকে সঙ্গে আনতে চাও নি।"

"সঙ্গে আনতে চাই নি, কথাটা সত্য নয়। তবে তোমার কষ্ট হবে ভেবে তেমন গরজ করি নি।"

মানসী আমার আরও কাছে এগিয়ে আসে। তারপরে মুখে একটু দুষ্টুমির হাসি ফুটিয়ে বলে, "ওসব বলে পার পাবে না সখা! আমি জানি, তুমি কেন আমাকে সঙ্গে আনতে চাও নি।"

"কেন বলো তো?"

"রাগ করবে না বলো।" সে আমার একখানি হাত ধরে।

"না, না, রাগ করব কেন? তুমি বলো।" আমি ওর হাতখানি নিজের হাতের মুঠোয় ভরে নিই।

"পাছে তোমার দুর্নাম রটে, তাই তুমি আমাকে সঙ্গে আনতে চাও নি সখা!"

সেই একই কথা। সেবারে মানালী কুলু ও যোগীন্দর নগরের পথে মাঝে মাঝেই সে একথা বলেছে। সে নারী, তবু যেন তার কোনো মান-সম্মান নেই। পাছে আমার দুর্নাম রটে এটাই ওর বড় ভাবনা। কিন্তু এ আশঙ্কা তো আজ আর মনে পোষণ করা সমীচীন নয়। ব্রজ-পরিক্রমার সময় বৃন্দাবনে বঙ্কুবিহারী মন্দিরে সেই সাক্ষাতের পর থেকে তো আমরা আর কেউ কাউকে ছেড়ে যাই নি। ব্রজ-পরিক্রমার শেষে গোকুল মহাবনে জানকী আমাকে ওরই হাতে সঁপে দিয়ে আমার জীবন থেকে চিরকালের মতো হারিয়ে গিয়েছে। আমরা এখন দুজনেই দুজনের জীবনে অচ্ছেদ্য হয়ে পড়েছি। এই তো মাত্র দুদিন আগেও গৌরাঙ্গ নগরে একঘরে রাত্রিবাস করেছি।

তবু কেন ওর এই আশঙ্কা? ওর কাছে কি তাহলে মনের মিলন যথেষ্ট নয়? একটা সামাজিক স্বীকৃতি না পেলে সে আশ্বস্ত হতে পারছে না।

"কি আমার কথার জবাব দিচ্ছ না যে?" মানসী আবার কথা বলে।

"ভাবছি, নবদ্বীপে ফিরে প্রভুপাদকে বলব কথাটা।"

"কি কথা?" সে আমার দিকে তাকায়।

"বলব, শ্রীরাধামদনমোহনকে সাক্ষী রেখে আপনি আমাদের মালা বদল করে দিন।"

"মালা বদল, তার মানে তো বিয়ে!"

"হ্যাঁ, মানসী!"

"কিন্তু তুমি তো জানো সখা, ওতে আমার বড় ভয়।"

"না, সে ভয় আর এখন তোমার নেই মানসী, বরং তোমার ভয় অন্য কারণে। আর তাই আমরা মালা বদল করব।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ।"

সে সহসা নিচু হয়ে প্রণাম করে আমাকে।

সঙ্গীরা প্রায় সবাই সামনে এগিয়ে গিয়েছেন, দু-চারজন যাঁরা পেছনে পড়ে গেছেন তাঁদেরও দেখতে পাচ্ছি না—জনহীন পথ। চাষীরা যাঁরা ক্ষেতে কাজ

করছে, তারাও রয়েছে বহুদূরে। তাই মানসী মৌনপ্রণামের মধ্য দিয়ে যে আমাকে তার জীবনে বরণ করে নিল, তার কোনো সাক্ষী রইল না। না থাক, সংসারের সব আদালতে সাক্ষীর দরকার হয় না। জীবনদেবতা বিচারকের আসনে বসে সাক্ষী ছাড়াই সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন।

তাড়াতাড়ি দুহাতে মানসীকে মাটি থেকে তুলে কাছে টেনে নিই। মানসী আমার বুকে মুখ লুকোয়।

দূর থেকে পথের পাশে যে ঘরগুলো দেখা যাচ্ছিল, আমরা সেখানে এসে পৌঁছই। আগেই বলেছি এ গ্রামের নাম জঙ্গলবাস, বেশ বড় গ্রাম। এখানে পথের ধারে কয়েকটি দোকান রয়েছে—মুদী মনোহারী কাপড় ও চায়ের দোকান। রয়েছে একটা বড় বটগাছ আর খেয়াঘাট। সেই গাছের ছায়াতেই ঠাকুরের সিংহাসন রেখে কীর্তনীয়ারা কীর্তন করছেন। গ্রামবাসীরা তাঁদের চারিদিকে ঘিরে ধরেছেন। কেউ কীর্তন শুনছেন, কেউবা ঠাকুর দর্শন করছেন।

যে পথ দিয়ে আমরা এখানে এসেছি, সেটি দোকান-ঘরগুলোকে বাঁয়ে রেখে সামনে প্রসারিত। কিন্তু এখান থেকে একটি পায়ে-চলা পথ গঙ্গার দিকে চলে গেছে। এখানেই গঙ্গা ডাইনে অর্থাৎ পশ্চিমে বাঁক নিয়েছে। তারই বাঁতীর দিয়ে বেলাভূমির ওপরে ঐ হাঁটাপথ।

প্রভুপাদ ও কানু সহ বেশ কয়েকজন সহযাত্রীকে দেখতে পাচ্ছি না। গাইড গৌরবাবু অবশ্য রয়েছেন। তাঁকেই জিজ্ঞেস করি কথাটা। তিনি দূরে গঙ্গার বেলাভূমি দেখিয়ে বলেন, "বাবা, কয়েকজনকে নিয়ে এই হাঁটাপথে চলে গিয়েছেন। দেখতে গেছেন, এপথে সাইকেল ভ্যান্ যেতে পারবে কিনা। তিনি খবর পাঠাবার পরে আমরা রওনা হব। এপথে না যেতে পারলে, চার মাইল ঘুরে অপরাধভঞ্জনের পাটে পৌঁছতে হবে।"

"এপথে অপরাধভঞ্জনের পাট কতদূর?" মানসী জিজ্ঞেস করে।

গৌরবাবু উত্তর দেন, "মাইল খানেক।"

"আমরা তো এপথে যেতে পারব।"

"পারবেন বৈকি। কৃষ্ণাদি ও মতিদিরা বাবার সঙ্গে এইপথে গেছেন। আপনারাও চলে যান।"

অতএব আর অপেক্ষা না করে আমরা দুজনে এগিয়ে চলি। আঁকাবাঁকা

উঁচু পলিময় গঙ্গাতীর দিয়ে হেঁটে চলেছি। গঙ্গা এই তীর ভাঙছে। জল অনেকটা নিচে। নরম বেলেমাটির ওপর দিয়ে হাঁটতে বেশ মজা লাগছে। জায়গাটাও ভারী সুন্দর। আমাদের ডাইনে কলকল্লোলিনী গঙ্গা। গঙ্গার ওপারে চর জেগেছে। এপারে ক্ষেত। দিগন্ত প্রসারী ক্ষেত, কোথাও সবুজ কোথাও সোনালী কোথাও বা ধূসর।

সেদিন নিদয়া ঘাট পার হবার পরে আর আমরা গঙ্গার এত কাছে আসি নি। এই পরিক্রমায় মানসীকে পাশে নিয়ে এমন মনোরম পথ পাড়ি দেবার কথা কল্পনাও করি নি। দয়াময় মহাপ্রভুকে মনে মনে প্রণাম করে বলি—প্রভু তুমি না হ'লে, আর কি হ'ত তার হিসেব মেলাবার সময় নেই এখন। আমি কেবল জানি, যদি তুমি না হ'তে তাহলে আমার এই পরিক্রমা হ'ত না, আমি এই অপার্থিব আনন্দ লাভ করতে পারতাম না।

না। প্রভুপাদ আমাদের ফেলে এগিয়ে যান নি। খানিকটা এগিয়েই তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তিনি একা নন, মতি কানু কৃষ্ণা ও কাশীনাথ সহ দাদারা এবং অনেকেই তাঁর সঙ্গে রয়েছে। তারা গঙ্গাতীরে একটা ছোট খাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এপথে সাইকেল ভ্যান্ নিয়ে যাবার একমাত্র বাঁধা এই খাড়ি। তবে খাড়ির দুপাশে খানিকটা মাটি কেটে একটা ঢালু পথের মতো করে দিতে পারলে, ভ্যান্টিকে নিয়ে যাওয়া যাবে। কথাটা জানা ছিল কানুর। তাই সে প্রভুপাদকে নিয়ে এগিয়ে এসেছে। চাষীরা ক্ষেতে কাজ করছিল। প্রভুপাদ তাঁদের সাহায্য চেয়েছেন। তাঁরা এখন কোদাল দিয়ে পথ তৈরি করছেন।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাঁদের কাজ দেখতে থাকি। কিছুক্ষণ বাদে চাষীদের সর্দার বলেন, "বাবা! এবার আপনি গাড়ি আনতে লোক পাঠান। ওঁরা আসার মধ্যে পথ তৈরি হয়ে যাবে। আপনি চিন্তা করবেন না বাবা, আমরা গাড়ি পার করে দেব।"

সর্দারের মুখে দাঁড়ি, পরনে লুঙ্গি। তিনি হিন্দু নন। তাঁর সঙ্গীরাও সবাই মুসলমান। তবু তাঁরা সবাই সোচ্চার স্বরে প্রভুপাদকে 'বাবা' বলে ডাকছেন। মদনমোহনকে নিয়ে যাবার জন্য পথ তৈরি করে দিচ্ছেন। এমন দৃশ্য ভারতের পথে প্রান্তরে প্রতিদিন দেখা যায়। কারণ ভারত ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র।

আমার কিন্তু অন্য কথা মনে হয়। আমার ধারণা এই নিরপেক্ষ কথাটার মধ্যে কিছু আন্তরিকতার অভাব আছে। ভারত ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হবে কেন? ভারত ধর্মপ্রাণ দেশ। কিন্তু সে ধর্ম কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের নয়, ভারতের

নিজস্ব ধর্ম। সে ধর্ম ভারতের আপন সভ্যতা ও কৃষ্টি দিয়ে গঠিত, ধৈর্য ও সহনশীলতা দিয়ে পরিপুষ্ট আর উদারতা দিয়ে লালিত-পালিত। অপরিচিত গাঁয়ের অশিক্ষিত ও দরিদ্র চাষীভাইদের মধ্যে আমি আবার আজ সেই সংকীর্ণতামুক্ত ধর্মপ্রাণ ভারতকে প্রত্যক্ষ করলাম।

প্রভুপাদের নির্দেশে রতন ছুটে গেল জঙ্গলবাসের দিকে। তাকে শেষ পর্যন্ত যেতে হবে না। খানিকটা এগিয়ে ইসারা করলেই ওঁরা ভ্যান্ নিয়ে চলে আসবেন।

আধঘণ্টার মধ্যেই ওঁরা এসে গেলেন। মুসলমান চাষীভাইদের সাহায্যে মদনমোহনজী নির্বিঘ্নে খাড়ি পার হলেন। প্রভুপাদ চাষীদের ধন্যবাদ জানান। আবার কীর্তন শুরু হয়। আমরা এগিয়ে চলি।

আঁকাবাঁকা গঙ্গাতীরে বেঁলেমাটির বেলাভূমির ওপর দিয়ে সংকীর্তন শোভাযাত্রা চলেছে এগিয়ে। প্রত্যেককে পায়ের দিকে নজর রাখতে হচ্ছে। পথরেখা সুস্পষ্ট কিন্তু পথের পাশে ক্ষেতের সীমায় প্রচুর বাবলা কাঁটা মাটিতে ফেলে রাখা হয়েছে—পাছে কেউ ক্ষেতে অনধিকার প্রবেশ করে তাই। কিন্তু মাঝে মাঝেই বাবলা কাঁটাগুলো পথের ওপরে চলে এসেছে। আমাদের সবারই খালি পা। অতএব পায়ের দিকে নজর না দিয়ে উপায় নেই।

আমরা এখন কুলিয়া বা সাতকুলিয়া গ্রামে চলেছি। প্রাচীন নাম কুলিয়া-পাহাড়পুর। সবচেয়ে মজার ব্যাপার আমরা নবদ্বীপ থেকে হাঁটতে হাঁটতে সাতকুলিয়া চলে এসেছি।

শ্রীমন্মহাপ্রভু পুরী থেকে ব্রজের পথে জননী ও জাহ্নবীকে দর্শন করতে এসেছিলেন বাংলায়। পানিহাটি ও হালিশহরে কয়েকদিন কাটিয়ে এলেন কাঁচরাপাড়ায়। দর্শনার্থীদের ভিড়ে প্রভুর জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে দেখে ভক্তরা তাঁকে লুকিয়ে কুলিয়ায় নিয়ে এলেন, স্থানীয় অবস্থাপন্ন ভক্ত মাধব দাসের বাড়িতে এনে তোলেন। সেদিন ছিল অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশী। বলা বাহুল্য তাতে দর্শনার্থীদের ভিড় কমে নি, বরং বেড়েছে। কিন্তু সেকথা এখন থাক। এখন কুলিয়ার কথা ভাবা যাক।

শ্রীগৌরাঙ্গ সাতদিন কুলিয়ায় কাটিয়েছেন। জানি না, সেইজন্যই এখন একে সাতকুলিয়া বলা হয় কিনা। সেই সাতদিন কুলিয়ায় কীর্তনের বন্যা বয়ে গিয়েছে। কুলিয়ায় বাস করার সময় শ্রীচৈতন্য বৈষ্ণবনিন্দুক ও বৈষ্ণববিরোধী দেবানন্দের অপরাধ ভঞ্জন করেন। সেই পুণ্যস্থানটি অপরাধভঞ্জনের পাট নামে পরিচিত। এটি বর্তমান গৌড়মণ্ডলে একটি পুণ্যতম তীর্থ। এখনও অগ্রহায়ণ

কৃষ্ণাচতুর্দশীতে মেলা বসে কুলিয়ায়। তিনদিন ধরে মেলা হয়! কুলিয়ায় দোল, রাস প্রভৃতি উৎসবও পালিত হয়।

মন্দির এবং অপরাধভঞ্জনের পাট ছাড়াও কুলিয়াতে দেবানন্দ ও চাপাল গোপালের সমাধি মন্দির ছিল। এখন গঙ্গায় ভেঙে গেছে। এখন শুধু রয়েছে একটা তেঁতুল গাছ। সেই গাছতলায় ভক্তরা এখন অপরাধভঞ্জনের প্রতীক অনুষ্ঠান পালন করেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন, সেখানে গিয়ে নিতাইগৌরের পুজো করলে সব অপরাধ দূর হয়, পাপ ক্ষয়ে যায়। তাই কি আমার কয়েকজন সহযাত্রী আজ অন্যদিনের চেয়ে জোরে জোরে পা চালিয়েছেন?

॥ পনেরো ॥

খাড়ি থেকে মাইল আধেক হেঁটে পৌঁছলাম গৌড়মণ্ডল পরিক্রমার সেই পরম-পবিত্র তীর্থ—অপরাধভঞ্জনের পাটে। গঙ্গার বেলাভূমি ছাড়িয়ে মাত্র কয়েক গজ দূরে একটা বড় তেঁতুল গাছ। গাছটির গোড়া সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো। পাশেই ছোট-মন্দির। আর সেই শিউলি গাছ।

প্রভুপাদের দেখাদেখি অনেকেই গায়ের জামা খুলে মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে নিলেন। একদা এই পবিত্রভূমি মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের পদরজে রঞ্জিত হয়েছে। তাহলেও আমি আর গড়াগড়ি করলাম না। খানিকটা ধুলো তুলে মাথায় দিলাম। মানসীও তাই করে।

প্রভুপাদ বলেন, "এটাই অপরাধভঞ্জনের পাট। এখানেই মাধব দাসের বাড়ি ছিল। আমরাও ছোটবেলায় এখানে গ্রাম দেখেছি। গঙ্গা ছিল বেশ খানিকটা দূরে। কিন্তু এখন গঙ্গা এপার ভাঙছে বলে গ্রাম দূরে সরে গিয়েছে। গ্রামের স্কুলঘরে আমাদের রাত্রিবাসের ব্যবস্থা হয়েছে। তবে যারা স্নান করতে চাও, এখানেই সেরে নাও। নবদ্বীপ পৌঁছবার আগে গঙ্গা স্নানের এমন সুযোগ আর পাবে না।"

কথাটা ঠিকই বলেছেন প্রভুপাদ। আজকের মতো পদযাত্রা শেষ হয়ে গেছে। আস্তানায় পৌঁছুলে বোধকরি দুপুরের প্রসাদ পাওয়া যাবে। সামনেই গঙ্গা। স্নানের এমন সুযোগ নষ্ট করা উচিত নয়। কিন্তু আমার সঙ্গে যে গার্জেন রয়েছে। তার অনুমতি না পেলে তো আমার পক্ষে গঙ্গাস্নান করা সম্ভব হবে না।

আমি মানসীর দিকে তাকাই। সে কিন্তু অন্য কথা বলে—আমাকে নয় প্রভুপাদকে, "গঙ্গাস্নানের সুযোগ যখন পাওয়া গেছে, আমরা নিশ্চয়ই সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করব। কিন্তু তার আগে যে আপনাকে চাদরখানি আবার গায়ে দিতে হবে বাবা!"

"কেন বলতো!" প্রভুপাদ একটু বিস্মিত।

মৃদু হেসে মানসী বলে, "আপনাকে যে এখন একটু গৌরকথা শোনাতে হবে।"

"গৌরকথা! এখন!"

"হ্যাঁ বাবা! শ্রীমন্মহাপ্রভুর কুলিয়া বাসের কথা! এই পুণ্যস্থানে বসেই তো সেই পুণ্যকাহিনী স্মরণ করা উচিত।"

অতএব প্রভুপাদকে আবার চাদর গায়ে দিতে হয়। স্নান করবেন বলে তিনি খালি গা হয়ে মাটিতে গড়াগড়ি দিয়েছিলেন।

প্রভুপাদ এসে অপরাধভঞ্জনের পাটে আসন গ্রহণ করলেন। আমরা তাঁর তিনদিকে যে যেখানে পারি বসে পড়ি। কয়েকজন গ্রামবাসী কাছেই খড় ও বাঁশ দিয়ে একটা ঘর তৈরি করছিল। গৌরকথার নাম শুনে তারাও কাজ ফেলে আমাদের সঙ্গে এসে বসে।

প্রভুপাদ তাদের একজনকে জিজ্ঞেস করেন, "এখানে তো গঙ্গা পাড় ভাঙছে, তোমরা এখানে ঘর বাঁধছ কেন?"

"আজ্ঞে, এ ঘর তো একরাতের জন্য।" লোকটি উত্তর দেয়।

"কে থাকবেন?"

"আজ্ঞে আপনি। আপনারই জন্য আমরা এ ঘর বাঁধছি বাবা!"

"আমার জন্য!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।" আরেকজন গ্রামবাসী বলে, "আপনি আমাদের গ্রামে আসছেন শুনে প্রধান বললে, বাবা এসে যদি পাটের কাছে থাকতে চান, তাই তোরা ওখানে একটা ঘর বেঁধে রাখ।"

প্রভুপাদ হাসতে হাসতে বলেন, "না না, আমি তা চাইব না, আমি সবার সঙ্গে তোমাদের গ্রামেই রাত্রিবাস করব। তোমরা আর এই ঘর বেঁধে সময় নষ্ট ক'রো না। তার চেয়ে বরং একটু গৌরকথা শোনো।"

গ্রামবাসীরা মাথা নাড়ে। প্রভুপাদ আরম্ভ করেন—

"গৌড়দেশে হয় মোর দুই সমাশ্রয়।
জননী জাহ্নবী এই দুই দয়াময়॥
গৌড়দেশ দিয়া যাব তা সবা দেখিয়া।
তুমি দোঁহে আজ্ঞা দেহ প্রসন্ন হইয়া॥'

বেশ কিছুদিন থেকেই মহাপ্রভু পুরী থেকে বৃন্দাবনের পথে বাংলায় রওনা হতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু অন্যান্য ভক্ত ও শিষ্যদের সঙ্গে রামানন্দ ও সার্বভৌম তাঁকে নানা অছিলায় কেবলি বাধা দিচ্ছিলেন। এবারে তাই তিনি সোজা-সুজি তাঁদের অনুমতি চেয়ে বসলেন। ফলে তাঁরা আর বাধা দিতে পারলেন না।

দুর্গাপূজার ৺বিজয়া দশমীতে জগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ ও মালা-চন্দন নিয়ে মাতৃভক্ত সন্তান পুরী থেকে বাংলার পথে রওনা হলেন। দামোদর, সার্বভৌম,

বক্রেশ্বর, জগদানন্দ, মুকুন্দ, হরিদাস, গোবিন্দ, কালীশ্বর এমনকি রায় রামানন্দ পর্যন্ত তাঁর অন্তরঙ্গ সঙ্গী ও ভক্তগণ তাঁর সঙ্গে পুরী থেকে কটকে এলেন। কিন্তু সেখান থেকে সবাইকে ফিরে যেতে হল। কারণ প্রভু তাঁদের কাউকেই সঙ্গে নিতে সম্মত হলেন না।

মহাপ্রভু, মহানদী পার হয়ে পথ চলতে থাকলেন। পৌছলেন যাজপুরে। সেখান থেকে উড়িষ্যা সীমান্তে পৌছে কয়েকদিন বিশ্রাম করলেন। তারপরে নৌকোয় রওনা হলেন। স্থানীয় মুসলমান শাসক তাঁকে সেই নৌকাখানি দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, দশ নৌকো সৈন্য সঙ্গে দিয়ে তিনি প্রভুকে বিপজ্জনক মন্ত্রেশ্বর নদ পার করে দিলেন।

এদিকে ন'দের নিমাই ঘরে আসছেন খবরটা বাংলায় পৌছুল। সঙ্গে সঙ্গে সারা নবদ্বীপ জুড়ে উৎসবের আয়োজন শুরু হয়ে গেল। তাহলেও মহাপ্রভু কিন্তু প্রথমে নবদ্বীপ এলেন না। পানিহাটির ঘাটে এসে তাঁর নৌকো থামল। বহুদিন বাদে আবার নিতাই-গৌরের মিলন হ'ল। নাচ-গান ও পাঠ-কীর্তনের মহোৎসব শুরু হ'ল। তিনি যেখানে যান, সেখানেই ভিড় উপচে পড়ে। একবার তাঁকে দর্শন করার জন্য, তাঁর অমৃতবর্ষী বাণী শোনার জন্য দূর-দূরান্ত থেকে হাজার হাজার মানুষ প্রতিদিন ছুটে আসতে থাকল।

শ্রীবাস তখন কুমারহট্ট অর্থাৎ হালিশহরে বাস করছিলেন। মহাপ্রভু পানিহাটি থেকে সেখানে এসে শ্রীবাস পণ্ডিতের সঙ্গে মিলিত হলেন। তারপরে গুরু ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান দর্শন করে কাঁচরাপাড়ায় এলেন। শিবানন্দ সেনের বাড়িতে একরাত কাটিয়ে বাসুদেব দত্তের বাড়িতে এলেন। কিন্তু কয়েক-দিনের মধ্যেই সেখানে দর্শনার্থীদের ভিড় এত বেড়ে গেল যে ভক্তগণ আর তাঁকে সেখানে রাখা নিরাপদ মনে করলেন না। তাঁরা রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে মহাপ্রভুকে এই কুলিয়া গ্রামে নিয়ে এলেন। মাধব দাস নামে জনৈক অবস্থাপন্ন ভক্তের বাড়িতে এনে তুললেন।

কিন্তু কথাটা শেষ পর্যন্ত গোপন থাকল না। গঙ্গার তীর ধরে জনস্রোত কুলিয়ায় পৌছে গেল। মাধব দাসের প্রশস্ত আঙিনায় মেলা বসল। মহাপ্রভু দর্শনার্থীদের সঙ্গে সানন্দে সংকীর্তন শুরু করে দিলেন। ভক্তকবির ভাষায়—

'কুলিয়ার আকর্ষণ না যায় বর্ণন।
কেবলি বর্ণিতে পারে সহস্র বদন॥
লক্ষ লক্ষ লোক ভাসে জাহ্নবীর জলে।
সবে পার হয়েন পরম কুতূহলে॥'

বলা বাহুল্য এঁরা সবাই নবদ্বীপ থেকে কুলিয়ায় এসেছিলেন। কারণ কুলিয়ার ওপারেই নবদ্বীপ। ভক্তবৃন্দ, এই সেই পুণ্যক্ষেত্র। এখানেই ছিল মাধব দাসের বাড়ি। এখনও তাই প্রতি বছর মেলা বসে এখানে। কিন্তু আর কতদিন সে মেলা বসতে পারবে বুঝতে পারছি না।..."

"একথা কেন বলছেন বাবা?" জনৈক সহযাত্রী মাঝখান থেকে বলে ওঠেন।

প্রভুপাদ উত্তর দেন, "দেখতে পাচ্ছ না, গঙ্গার ভাঙনে সেকালের প্রায় সমস্ত গ্রামটাই নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে। এই অপরাধভঞ্জনের পাটটুকু শুধু বাকি আছে। কিন্তু যেভাবে গঙ্গা ভাঙছে, তাতে আর কতদিন থাকবে, তা কেবল নিতাই-গৌর জানেন।"

"কিন্তু এমন একটি ঐতিহাসিক পুণ্যস্থান গঙ্গায় চলে যাবে?" মানসী প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে।

প্রভুপাদ একটু হাসেন, অসহায় মানুষের হাসি। তারপরে বলেন, "কি করবে মা, যাঁরা রক্ষা করতে পারেন, তাঁদের যে এই ঐতিহাসিক পুণ্যস্থানের প্রতি কোনো আকর্ষণ নেই। সাধারণ মানুষের কি সাধ্য যে গঙ্গার এই ভাঙন রোধ করবে।" একটু থামেন তিনি। তারপরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বলে ওঠেন, "যাক্ গে, যেকথা বলছিলাম—শ্রীচৈতন্য সাতদিন কুলিয়ায় বাস করে ত্রিতাপদগ্ধ মানুষের প্রাণে প্রেমের সুশীতল শান্তিজল সিঞ্চন করলেন। তাঁকে দর্শন করে সবার চোখ সার্থক হল, তাঁর কথা শুনে সবাই তৃপ্ত হলেন, তাঁর কীর্তন শুনে সকলে মোহিত হলেন।

কুলিয়ার ওপারেই নবদ্বীপ। তাই নবদ্বীপ থেকেও দলে দলে লোক আসছিলেন। বলা বাহুল্য শচী আর বিষ্ণুপ্রিয়াও নিমাইয়ের আগমন সংবাদ পেয়েছিলেন। পুত্রমুখ দর্শনের আকাঙ্খায় শচী আকুল হলেন, স্বামীর শ্রীচরণ দর্শনের আশায় বিষ্ণুপ্রিয়া ব্যাকুল হলেন। কিন্তু নিমাই যে এখন সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। তিনি ডেকে না পাঠালে তো তাঁরা যেতে পারেন না। তবু তাঁরা তাঁর দর্শন পাবার প্রতীক্ষায় দিন গুনতে থাকলেন।

শেষ পর্যন্ত তাঁদের প্রতীক্ষা ব্যর্থ হ'ল না। ন'দের নিমাই নবদ্বীপে এলেন। তিনি শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী নামে জনৈক ভক্তের ঘরে রাত কাটালেন। পরদিন সকালে গঙ্গাস্নান করে বাড়ির দরজায় এসে উপস্থিত হলেন। তাঁকে দেখতে পেয়ে প্রতিবেশীরা সবাই ছুটে এলেন। দলে দলে পথচারী এসে ভিড় বাড়ালেন। তাঁরা সবাই নীরবে নিমাইয়ের পেছনে দাঁড়িয়ে রইলেন।

কিন্তু মা এলেন না। এলেন নিরাভরণা ও ক্ষীণাঙ্গী বিষ্ণুপ্রিয়া। অবগুন্ঠিতা স্ত্রী এসে স্বামীর শ্রীচরণে দণ্ডবৎ করলেন। গম্ভীর অথচ প্রেমপূর্ণ কণ্ঠে নিমাই বললেন—

'তব নাম বিষ্ণুপ্রিয়া সার্থক করহ ইহা
মিছা শোক না করহ চিতে।
এ তোমারে কহিনু কথা দূর করি আন চিন্তা
মন দেহ কৃষ্ণের চরিতে ॥'*

আত্মসংবরণ করে অবগুন্ঠিতা বিষ্ণুপ্রিয়া উঠে দাঁড়ালেন। সন্ন্যাসীর পা-দু'খানির দিকে দৃষ্টি স্থির রেখে তিনি ভিক্ষুণীর মতো হাত-দুখানি বাড়িয়ে ধরলেন স্বামীর সামনে।

স্নিগ্ধ স্বরে সন্ন্যাসী বললেন—'আমি যে সন্ন্যাসী। দেবার মতো আমার কিই বা আছে?' থাকার মধ্যে এই একজোড়া কাষ্ঠপাদুকা। তাই তোমাকে দিয়ে গেলাম।* *

নিমাই নিজের পা থেকে খড়মজোড়া খুলে বিষ্ণুপ্রিয়ার হাতে তুলে দিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া পরম শ্রদ্ধায় সেই পাদুকা একবার মাথায় ঠেকিয়ে ঘরের ভেতরে চলে এলেন।

মনে মনে গৃহদেবতা ও মাকে প্রণাম করে সন্ন্যাসী নিমাই শেষবারের মতো বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন।"

"তারপরে?"

প্রভুপাদ থামতেই মানসী প্রশ্ন করে বসে। তার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে প্রভুপাদ আবার আরম্ভ করেন, "নবদ্বীপ থেকে শ্রীচৈতন্যদেব শান্তিপুরে চলে গেলেন। তিনি অদ্বৈতাচার্যের বাড়িতে উঠলেন। সারা শান্তিপুর জুড়ে অহোরাত্র আনন্দ-সংকীর্তন শুরু হয়ে গেল। বাড়ি গিয়েও মায়ের সঙ্গে দেখা না হবার দুঃখটা তাঁর মনে রয়ে গিয়েছিল। তিনি জানতেন মায়ের কাছে না যাবার জন্যই মা তাঁর কাছে আসেন নি। অথচ মাকে দর্শন করবার জন্যই এত কষ্ট করে তাঁর বাংলায় আসা। তাঁকে প্রণাম না করে তিনি চলে যাবেন কেমন করে? তাই মাকে নিয়ে আসার জন্য তিনি ভক্তদের নবদ্বীপে একখানি শিবিকা পাঠাতে বললেন!

---

* শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

* * নবদ্বীপের মহাপ্রভু মন্দিরে আজও এই পাদুকা পূজিত হচ্ছে।

নিমাই তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছেন! অতএব মা এলেন। দশটি সন্তানের জননী হয়েও যিনি সন্তানসুখ ভোগ করতে পারলেন না, সেই দুঃখিনী মা ছেলের সঙ্গে দেখা করতে শান্তিপুরে এলেন।

শচীদেবী অদ্বৈতভবনে এসে দেখলেন, দেশের মানুষ শ্রীচৈতন্যকে যতই ভক্তি-শ্রদ্ধা করুক, তাঁর নিমাই প্রায় একই রকম রয়ে গিয়েছে। মাকে কাছে পেয়েই ছেলে বলে বসলেন—মা, আমি অনেকদিন তোমার হাতের রান্না খাই নি, যে ক'দিন এখানে আছি, আমাকে তোমাকে রান্না করে খাওয়াতে হবে।

মা সানন্দে সে আব্দার রক্ষা করলেন। দশদিন আচার্যের বাড়িতে থেকে তিনি নিমাইকে রান্না করে খাওয়ালেন।

তারপরে নিমাই বললেন—মা, এবার আমাকে অনুমতি দাও!

—কিসের অনুমতি বাবা?

—আমি কাশী প্রয়াগ ও মথুরা-বৃন্দাবন দর্শন করব। তুমি আমাকে আশীর্বাদ করো।

চোখের জল মুছে মা বললেন—এসো বাবা! তোমার যাত্রাপথ নির্বিঘ্ন হোক।

মায়ের আশীর্বাদ আর অসংখ্য ভক্তের শুভেচ্ছা সঙ্গে নিয়ে পরিব্রাজক শ্রীচৈতন্য ব্রজের পথে যাত্রা করলেন।*

গৌরকথা শেষ হবার পরে আমরা গঙ্গাস্নান করে নিলাম। তারপরে আবার শুরু হ'ল সংকীর্তন শোভাযাত্রা। কীর্তনীয়ারা ভক্তিরত্নাকর থেকে গাইছেন—

'কতক্ষণে স্থির হৈয়া লৈয়া শ্রীনিবাসে।
কুলিয়া-পাহাড়পুর গ্রামেতে প্রবেশে ॥
শ্রীনিবাস প্রতি কহে সমধুর ভাষ।
কুলিয়া-পাহাড়পুর দেখ শ্রীনিবাস ॥

---

* এবারে শ্রীচৈতন্য শেষ পর্যন্ত বৃন্দাবন যান নি। গৌড়নগরীর (মালদহ) উপকণ্ঠে রামকেলি পর্যন্ত গিয়েছিলেন। সেখানেই রূপ ও সনাতনের (সন্তোষ ও অমরদেব) সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তারপরে তিনি আবার পুরী ফিরে যান। পরের বছর তিনি ঝাড়খণ্ড জঙ্গলের ভেতর দিয়ে বৃন্দাবন গিয়েছেন। 'মধু-বৃন্দাবনে (ব্রজপর্ব)' দ্রষ্টব্য।

পূর্বে কোলদ্বীপ পর্বতাখ্যা এ প্রচার।
এ নাম হৈল যৈছে কহি সে প্রকার॥'

গৌড়মণ্ডল পরিক্রমায় বেরিয়ে আচার্যগণ কুলিয়া-পাহাড়পুর তথা কোলদ্বীপে প্রবেশ করলেন। কথিত আছে জনৈক ব্রাহ্মণ এখানে কোলদেব অর্থাৎ বরাহদেবের আরাধনা করেছিলেন। তিনি কোলদেবরূপে গৌরহরির দর্শন লাভ করেন। কোলদেবের সেই মূর্তিটি ছিল পর্বত-প্রমাণ। তাই এ দ্বীপের নাম হয় কোলদ্বীপ। ভক্তিরত্নাকরের যুগে কিন্তু নাম ছিল কুলিয়া-পাহাড়পুর। আর এযুগের নাম সাতকুলিয়া।

গঙ্গাতীর থেকে মিনিট পনেরো হেঁটে আমরা সাতকুলিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সামনে পৌঁছলাম। থেমে গেল কীর্তন। শেষ হ'ল আজকের পদপরিক্রমা।

স্কুল ঘরটি আকারে খুব ছোট নয়, অবস্থানটিও সুন্দর। পথের ধারে একফালি খেলার মাঠ। তারই একদিক জুড়ে স্কুলঘর। সামনে চওড়া বারান্দা। একখানি ছোট ও দুখানি বড় ঘর নিয়ে স্কুল। ছোট ঘরখানিতে ছেলেদের নিয়ে প্রভুপাদ থাকবেন। আমি জীবনদাদু, রসময়দা এবং অমলদা জায়গা পেলাম সেখানে। বড় দু-খানিতে বৃদ্ধ ও মহিলাদের জায়গা হল। পুরুষরা প্রসাদের পরে আশ্রয় ভিক্ষায় বের হলেন।

আজ আমাদের দল আরও ভারী হল। আজ অমলদা পরিক্রমায় যোগ দিলেন। অমলদা মানে প্রভুপাদের ভায়রাভাই। কলকাতায় থাকেন, ব্যবসা করেন। যেমন সুন্দর চেহারা, তেমনি সুন্দর স্বভাব।

তাঁকে পেয়ে আমরা সবাই আনন্দিত। তবে সবচেয়ে বেশি খুশি হয়েছে ছোড়দা, প্রভুপাদের ছোট ছেলে আনন্দগোপাল। সে সেই থেকে মেসোর হাত ধরে সমানে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আমাদের ঘরের সামনে, বারান্দায় ঠাকুরের সিংহাসন স্থাপন করা হয়েছে। এক কথায় আমরা ইতিমধ্যেই বেশ গুছিয়ে বসেছি। কেবল মাইক বসানো আর সামিয়ানা টাঙানো বাকি। ছেলেরা আশ্রয় যোগাড় করে ফিরে এসে কাজ দুটো করে ফেলবে। এখনও সন্ধ্যে হতে কিছু দেরি আছে।

আগেই বলেছি আজ আমরা মধ্যদ্বীপ থেকে কোলদ্বীপে এসেছি। সাত মাইল হেঁটেছি।

বর্তমানের কোলদ্বীপ অর্থাৎ সাতকুলিয়া ছোট গ্রাম নয়। প্রায় পাঁচ শ' ঘর, জনসংখ্যা হাজার তিনেক। তবে নতুন বসতি। সাবেক গ্রাম ছিল

অপরাধভঞ্জন পাটের কাছে। ওখানেই ছিল মাধব দাসের বাড়ি, ওখানেই গ্রাম। গঙ্গার ভাঙনের জন্য গ্রামবাসীরা বাড়ি-ঘর সরিয়ে নিয়ে এসেছেন। কিন্তু অপরাধভঞ্জনের পাট ওখানেই রয়ে গেছে। তাই তো থাকবে। কিন্তু আর কতদিন থাকে তা কেবল মা-গঙ্গাই বলতে পারেন।

দত্তবাবুরা ফিরে আসছেন। ওরা আশ্রয় ভিক্ষায় বেরিয়েছিলেন। আমি বারান্দা থেকে মাঠে নেমে আসি। ওঁরা কাছে আসেন। দত্তবাবু জিজ্ঞেস করেন, "ঘোষদা, চা পেয়েছেন?"

"না। কোথায় পাবো? এখানে তো কোনো দোকান বসে নি।"

"তাই তো এক জায়গায় ব্যবস্থা করে আপনাকে ডাকতে এলাম।"

"আমরা কি সঙ্গী হতে পারি?"

কৃষ্ণার কণ্ঠস্বর শুনে পেছনে তাকাই। সে বারান্দায় দাঁড়িয়ে প্রশ্নটা করেছে। তার পাশে মানসী। ওরাও নেমে আসে আমাদের কাছে।

দত্তবাবু উত্তর দেন, "নিশ্চয়ই পারেন।"

"তাহলে চলুন, চা খাওয়া আর গ্রাম দেখা দুটোই হয়ে যাবে।" মানসী একেবারে চলতে শুরু করেছে।

দত্তবাবু চলতে চলতে বলেন, "কিন্তু আপনি তো চা খান না বৌদি!"

"আপনার দাদা খেলেই আমার খাওয়া হয়ে যায়। তবে গ্রাম আমরা দুজনেই দেখব এবং সেটা যার যার নিজের চোখ দিয়ে।"

স্কুলের মাঠ ছাড়িয়েই সরু পায়ে-চলা পথ। পথের পাশে বাড়ি-ঘর। একখানি বাড়িতে কয়েকখানি করে ঘর—খড় আর মাটির ঘরই বেশি। এজমালি উঠান। কিন্তু বেশ পরিস্কার ও পরিচ্ছন্ন। গোবরগোলা দিয়ে ভারী সুন্দর করে নিকানো।

প্রায় প্রত্যেক ঘরের দাওয়াতেই আমার সহযাত্রীরা আশ্রয় নিয়েছেন। তবে মেয়েরা কেউ আসেন নি। আজ তাঁরা স্কুলেই থাকবেন। কেবল ব্যতিক্রম সেই রসিক-দম্পতি তথা কপোত-কপোতী। আজও তারা একখানি ঘরের দাওয়া দখল করে কাপড় টাঙাচ্ছে—ঘরের মধ্যে ঘর বানাচ্ছে।

আমরা এগিয়ে চলি। বেশি দূর এগোতে হয় না। এ গাঁয়ে বাড়িগুলো গায়ে গায়ে। বাড়ির জন্য বেশি জায়গা নষ্ট করেন নি এঁরা। কেমন করেই বা করবেন! গঙ্গা যে গ্রাম ভাঙছে।

মাঝখানে আরেকখানি বাড়ি ছাড়িয়ে থামতে হল আমাদের। কয়েকজন গ্রামবাসী একখানি ঘরের দাওয়ায় বসেছিলেন। তাঁদেরই একজন ডাকলেন

দত্তবাবুকে। আমরা কাছে আসতেই ওঁরা দাওয়া থেকে নেমে এলেন। বললেন, "আপনারা বসুন।"

তাকিয়ে দেখি, সারা দাওয়া জুড়ে তালপাতার চাটাই পাতা। মানসী দত্তবাবুকে বলে, "আপনারা বসুন, আমরা ভেতরে গিয়ে মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করি।"

"তাই ভাল মা।" জনৈক প্রৌঢ় বলে ওঠেন। "আপনারা আমার সঙ্গে আসুন।"

প্রৌঢ় বাড়ির ভেতরে চলে যান। মানসী ও কৃষ্ণা তাঁর সঙ্গী হয়। আমি দত্তবাবু ও তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে এসে দাওয়ায় উঠে বসি। এবারে গ্রামবাসীরা একে একে এসে আমাদের পাশে*বসেন। প্রৌঢ় ফিরে এসে আসন গ্রহণ করেন। বলেন, "একটু বসুন বাবু, চা আসছে।

"আসুক। তার জন্য কোনো তাড়া নেই। এবারে বলুন, আপনাদের কথা।" দত্তবাবু আমাকে দেখিয়ে বলেন, "ইনি কলকাতায় থাকেন, এঁর অনেক জানা-শোনা।"

"কি আর বলব বাবু, সবই তো আপনারা দেখলেন।" প্রৌঢ় বলতে থাকেন, "আমাদের এখন দিন-রাতের একটাই ভাবনা। গঙ্গা যেভাবে ভাঙছে, তাতে বড় জোর বছর দশেক এখানে বাস করা যাবে। তারপরে আবার গ্রাম সরিয়ে নিতে হবে। কোথায় সরাবো, কে আমাদের জায়গা দেবে? সরকার বলছে, ওপারে যে চর জেগেছে, সেখানে আমাদের জায়গা হবে। কিন্তু চর পেলেই তো জমি পাওয়া হয় না। বালি সরিয়ে খাল কেটে সেই চরকে বাগে আনতে যে জীবন কেটে যাবে বাবু! তাই বলছিলাম, আপনারা কলকাতার লোক, আপনাদের অনেক জানা-শোনা, আপনারা যদি আমাদের হয়ে একটু চেষ্টা করেন, যদি কোন রকমে গঙ্গার ভাঙন রোধ করা যায়!"

কি বলব? এঁরা গাঁয়ের সহজ সরল মানুষ। এঁদের ধারণা কলকাতায় যাঁরা থাকেন, তাঁরা সবাই এক-একজন ক্ষুদে মন্ত্রী, নিদেন পক্ষে এম. এল. এ.। অতএব আমরা এঁদের মুশকিল আসান করতে পারি। কিন্তু আমরা যে নিতান্তই অসহায়, সেকথা এঁদের বলে কোনো লাভ নেই। তাই অন্যকথা বলতে হয়। জিজ্ঞেস করি, "আপনাদের গ্রাম পঞ্চায়েত নেই?"

"আছে।" জনৈক যুবক উত্তর দেন। একবার থামেন তিনি। তারপরে একটা ঢোক গিলে বলেন, "আমিই পঞ্চায়েত প্রধান।"

"তাহলে তো এ ব্যাপারে আপনাকেই নেতৃত্ব দিতে হবে।" আমি বলি।

প্রধান মাথা নাড়েন। বলেন, "তা তো দিতেই হবে। কিন্তু কি যে করব, তাই বুঝতে পারছি না।"

"আপনারা নেতাদের সঙ্গে দেখা করছেন না কেন?"

"আজ্ঞে, করেছিলাম।"

"তাঁদের একবার এখানে নিয়ে এলেন না কেন?"

"আজ্ঞে, এনেছিলাম।"

"তাহলে তো আপনারা অনেক দূর এগিয়েছেন।" আমি খুশি হই। জিজ্ঞেস করি, "তা তাঁরা কি বললেন?"

"সব দেখে শুনে বললেন, সমস্যাটা সত্যই আমাদের জীবন-মরণের সমস্যা। কিন্তু এ সমস্যা সমাধানের সাধ্য তাঁদের নেই।"

"কারণ!"

"আজ্ঞে, গঙ্গার এই ভাঙন রোধ করতে হলে লক্ষ লক্ষ টাকার দরকার।"

প্রধান থামেন। এবারে আমি কি বলব বুঝতে পারছি না, তাই চুপ করে থাকি।

প্রধান আবার বলেন, "তাছাড়া, সত্যি বলতে কি এ ব্যাপারে আমাদের নেতাদের কোনো দায়িত্বও নেই।"

"কেন বলুন তো?" একটু অবাক হই।

প্রধান উত্তর দেন, "ফরাক্কায় বাঁধ তৈরি হবার পরে এ অঞ্চলের গঙ্গায় জল বেড়ে গিয়েছে, তাই গঙ্গা এমন মারমুখী হয়ে উঠেছে। ফরাক্কা বাঁধ যাঁরা তৈরি করেছেন, ভাঙন বন্ধ করবার দায়িত্বও তাঁদের।"

প্রধানের কথা, বিশেষ করে তাঁর যুক্তি শুনে অবাক হই। কিন্তু এই আবিষ্কার কি তিনি নিজে করেছেন? বোধকরি নয়। অন্য কেউ এঁদের যা বুঝিয়ে গিয়েছেন, সরল মানুষটি তাই মুখস্থ বলে গেলেন। কি করবেন? অসহায় মানুষদের দুরবস্থা নিয়ে প্রহসন করা যে আমাদের প্রায় জাতীয় চরিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু এসব কথা আলোচনা করা নিরর্থক। তাই মৃদু হেসে বলি, "পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের জন্যই ফরাক্কা বাঁধ প্রকল্প। গঙ্গার জল বাড়ায় অশেষ উপকার হয়েছে। দুর্ভাগ্যের কথা এখানে গঙ্গায় ভাঙন দেখা দিয়েছে, এবং আপনাদের গ্রাম ভাঙছে। এ ভাঙনকে রুখতে হবে, এবং এজন্য আমরা কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই অনুরোধ করতে পারি। কিন্তু সে অনুরোধ করবেন কে? আপনারা অথবা আপনাদের নেতারা আপনারা যখন পারছেন না, তখন

আবার মাননীয় নেতাদের সঙ্গে দেখা করুন, তাঁদের বলুন ব্যাপারটাকে কর্তৃপক্ষের দরবারে পৌঁছে দিতে।"

"কিন্তু তাঁরা কি আমাদের কথা শুনবেন?" একজন বৃদ্ধ গ্রামবাসী প্রশ্ন করেন।

উত্তর দিই, "শুনবেন কিনা জানি না। তবে শোনা উচিত।"

জানি না আমার প্রস্তাব কার্যকর হবে কিনা, কিন্তু আমি ও দত্তবাবু মুক্তি পেয়ে যাই। ওঁরা ভাঙন সম্পর্কে আর কোনো কথা বলেন না। একটু বাদে চা আসে। মানসী আর কৃষ্ণাও ফিরে আসে। আমরা চা খেয়ে বিদায় নিই গ্রামবাসীদের কাছ থেকে। ফিরে চলি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে।

ফিরে এসে দেখি মাইক বসানো এবং সামিয়ানা টাঙানো হয়ে গেছে। চন্দ্রা ও গৌরদা পেট্রোম্যাক্স জ্বাল্‌ছেন। কানু ও কাশীনাথ কয়েকজনকে নিয়ে সতরঞ্চি পাতছে।

কিন্তু বেশিক্ষণ ওদের কাজকর্ম দেখতে পারি না। তার আগেই সেই রসিক-দম্পতি অর্থাৎ কপোত কপোতী আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তারা সামিয়ানার নিচে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ। কলহের কারণ জানি না কিন্তু কপোতীর দাপটই বেশি। সে-ই আক্রমণ করছে। কপোত কেবল আত্মরক্ষার চেষ্টাকরে বিফল হচ্ছে।

সংসারের স্বামী-স্ত্রীর কলহ স্বাভাবিক। কিন্তু তার একটা স্থান ও কাল থাকে। গৌড়পরিক্রমায় এসে এত মানুষের সামনে এমন প্রকাশ্য কলহ অতিশয় লজ্জাকর।

কিন্তু কপোতীর কোনো লজ্জা আছে বলে মনে হচ্ছে না। সে দর্শকদের একজনকে সাক্ষী মেনে বলে চলেছে, "আচ্ছা, আপনিই বলুন, এই যে আপনারা সবাই আমাকে এত ভালোবাসেন। সে তো আমি এমন ঝাড়া হাত-পায়ে একা এসেছি বলে। আমি যদি ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে আসতাম, তাহলে কি আপনারা আমাকে এত ভালোবাসতেন?"

বেচারী সাক্ষী বিপদে পড়ে যান। কিছু বলাও মুশকিল। অথচ মেয়েটি নাছোড়বান্দা। বাধ্য হয়ে তিনি একটু মৃদু হাসেন। তারপরে জিজ্ঞেস করেন, "তা তোমার স্বামী কি বলছেন?"

"ওর কথা ছেড়ে দিন। পরিক্রমায় এসে অবধি ঘ্যানর ঘ্যানর করে চলেছে, ওর মা নাকি আমার বাচ্চাদের সামলাতে পারছে না, তার কষ্ট হচ্ছে।" একবার থামে সে। তারপরে গলার স্বর আরও চড়িয়ে বলে ওঠে "আমার ছেলে-মেয়ে, আমার ভাল মনে হয়েছে, তাই আমি তাদের রেখে এসেছি।

তুমি ভাল-মন্দ বলার কে ?”

“আহা, উনি তো তাদের বাবা।”

“তা হোক্ গে। কিন্তু ও কি করেছে ছেলে-মেয়ের জন্য। মানুষ করার বেলায় আমি আর দরদ দেখাবার বেলায় উনি। আমার ছেলে-মেয়ে। আমি সঙ্গে আনব কি বাড়িতে রেখে আসব, তা আমি বুঝব!”

“তা তো বটেই।” সাক্ষী এবারে পালাতে চাইছেন। পালাতে চাইছে মেয়েটির স্বামীও। সে তার স্ত্রীকে কি বলেছে জানি না। তবে তা বোধকরি একান্তেই বলেছে। বেচারী বুঝতে পারে নি যে তার সহধর্মিনী চিৎকার করে এত লোক জড়ো করে ফেলবে।

স্বামী সরে পড়তে চাইছে বুঝতে পেরেই বোধকরি স্ত্রী তার একখানি হাত ধরে ফেলে। এবং গলার স্বর সহসা খাদে নামিয়ে বলতে থাকে, “তুমি কেন ওদের কথা ভেবে এমন মন খারাপ করছ? আমি মা, আমার মন বলছে, ওরা ভাল আছে। ওরা তোমার মাকে কোনো জ্বালাতন করছে না। তুমি তো জানো, আমি বাড়ি না থাকলে ওরা ভাল থাকে।”

সে টানতে টানতে তার স্বামীকে কোথায় যেন নিয়ে চলল। দর্শকরাও যে যার কাজে চলে গেল। চলতে চলতে একজন বৃদ্ধা সহযাত্রী মন্তব্য করেন, “অতিরিক্ত মিল হলে আবার অমিলও বেশি হয়। মেয়েটা স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে সবাইকে ওর প্রেমের গভীরতা বোঝাতে চাইছে।”

“শুনলে মাসিমা কি বললেন ?” হঠাৎ মানসী প্রশ্ন করে আমাকে।

তাকিয়ে দেখি সে একাই রয়েছে আমার পেছনে। দত্তবাবু ও কৃষ্ণা কখন যেন চলে গিয়েছে। ওর দিকে তাকিয়ে উত্তর দিই, “হ্যাঁ শুনেছি এবং ভদ্রমহিলা ঠিক কথাই বলেছেন।”

“আমি কিন্তু বাপু প্রেমের গভীরতা বোঝাবার জন্য তোমার সঙ্গে ঝগড়া-টগড়া করতে পারব না, তা আগেই বলে রাখছি।”

“তার যে কোনো দরকার পড়বে না।”

“কেন বলো তো ?”

“তুমি ঝগড়া শুরু করার আগেই আমি তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করব।”

‘থাক, যথেষ্ট হয়েছে। আর মিথ্যে বলে পাপ বাড়িও না, আমাকেও যে তোমার পাপের অংশীদার হতে হবে। তার চেয়ে মন্দিরে চলো, বাবা এখুনি আরতি আরম্ভ করবেন।”

ইতিমধ্যে বেশ ভিড় হয়ে গিয়েছে। দলে দলে গ্রামবাসী এসেছেন।

বলতে গেলে তাঁরাই সামিয়ানা দখল করেছেন। সহযাত্রীরা স্কুলের বারান্দা কিংবা বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। আমাদের দলের মহিলারা অনেকেই ঘরে রয়েছেন। তাঁরা ঘরে বসেই শুনতে পাবেন সব, মাইক লাগানো হয়েছে।

আমরা ভিড় ঠেলে বারান্দায় চলে আসি। মতি ও কৃষ্ণার আনুকূল্যে একটু বসার জায়গা পেয়ে যাই। কয়েক মিনিট বাদেই আরতি আরম্ভ হয়।

সত্যি বড় সুন্দর আরতি করেন প্রভুপাদ। যেমন হাত-পায়ের ভঙ্গিমা তেমনি চোখ-মুখের ভক্তি-ভাব। প্রতিদিন দুবার করে তাঁর আরতি দেখছি, তবু পুরনো হচ্ছে না। দেখতে ভাল লাগছে, মনটা প্রশান্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠছে।

আরতির পরে পাঠের আসর বসল। প্রথমেই প্রভুপাদ হারমনিয়াম বাজিয়ে গান ধরলেন, বিদ্যাপতির গান—

'অঙ্গনে আওব যব রসিয়া।
পালটি চলব হাম ঈষৎ হাসিয়া।
আবেশে আঁচর পিয়া ধরবে॥
যাওব হাম যতন পহুঁ করবে॥
রভস মাগব পিয়া যবহি।
মুখ বিহসি নহি বোল তবহি॥
কাঁচুয়া ধরব যব হঠিয়া।
করে কর বারব কুটিল আধ দিঠিয়া॥
সো পঁহু সুপুরুস্ব ভঁওরা।
চিবুক ধরি অধর-মধু পিয়ব হামারা॥
তৈখনে হরব মঝু-চেতনে।
বিদ্যাপতি কহ ধনি তুয়া-জীবনে॥'

প্রভুপাদের গান শেষ হ'ল। তিনি হারমনিয়ামটা একটু দূরে সরিয়ে রেখে উদাত্ত কণ্ঠে বলতে শুরু করলেন, "ভক্তবৃন্দ, এই গানে মহাকবি বিদ্যাপতি শ্রীরাধিকার মনের যে অবস্থাটি বর্ণনা করেছেন, সেদিন গৌড়দেশবাসীদের মনের অবস্থাটিও একই রকম। কৃষ্ণ আসছেন শুনে রাধা তাঁর সখীকে বলেছেন—সে আমার আঙ্গিনায় এসে দাঁড়ালে, আমি মুখ ফিরিয়ে একবার তার দিকে কটাক্ষ-পাত করব, তারপরে একটু হেসে দূরে চলে যেতে থাকব।

ভক্তবৃন্দ, এই গানের মধ্যে কবি রাধিকার মনের সে চাঞ্চল্য বর্ণনা করেছেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নদীয়ায় আসছেন শুনে গৌড়জনের চিত্ত ঠিক তেমনি চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। সংবাদটি শুনে সেদিন নবদ্বীপবাসীদের মনে যে আনন্দ হয়েছিল

তা বোধ করি রাধারানীর আনন্দের চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়।

কেনই বা কম হবে? কৃষ্ণ যে নিজেই রাধাকে বলেছেন—সন্নিহিত কলিতে আমি গৌরমূর্তি ধারণ করে নদীয়ায় আবির্ভূত হব। বলেছেন—রাধা, দ্বাপরে আমি মূর্খ রাখাল কিন্তু কলিতে আমি হব পণ্ডিত। নদীয়ায় আমি আর চোর থাকব না, সেখানে আমি সব চোরকে সাধুতে রূপান্তরিত করব। দ্বাপরে আমি পাপীদের হত্যা করি কিন্তু কলিতে আমি প্রেম দান করে পাপীদের চিত্ত শুদ্ধ করে পৃথিবীকে পাপশূন্য করব।

ভক্তবৃন্দ, শ্রীক্ষেত্র থেকে এখানে এই কোলদ্বীপের, পুণ্যভূমিতে পদার্পণ করে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তাই করেছিলেন। তাঁর সেই অপরাধভঞ্জন লীলার কথা বলেই আমি আজ পাঠ শেষ করব। আমার পাঠের পরে রসময়দা রামায়ণ গাইবেন আর রাধেশ্যাম গৌরলীলা কীর্তন করবে।"

একবার থামলেন প্রভুপাদ। মতির হাত থেকে জলের ঘটিটি চেয়ে নিয়ে এক ঢোক জল খেয়ে আবার বলতে শুরু করেন, "ভক্তবৃন্দ, আপনারা সবাই জানেন, জ্ঞানান্বেষণ তীর্থদর্শন ও ধর্মপ্রচারের জন্য শ্রীগৌরাঙ্গ পূর্ববঙ্গ গয়া শ্রীক্ষেত্র দাক্ষিণাত্য ও ব্রজমণ্ডল ভ্রমণ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীলোচনদাস ও জয়ানন্দ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যমঙ্গল, শ্রীগোবিন্দদাসের কড়চা, শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত এবং কবিকর্ণপুরের শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেই ভ্রমণ কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছে। এইসব ভ্রমণ-বিবরণ চরিতকাব্য প্রণেতাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা না হলেও কাল্পনিক নয়, ঐতিহাসিক অবতার শ্রীচৈতন্যের বাস্তব ভ্রমণকাহিনী।

কবিকর্ণপুর তাঁর শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে মহাপ্রভুর উড়িষ্যা থেকে নবদ্বীপে আগমনের কথা বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সে বর্ণনার সঙ্গে অন্যান্য গ্রন্থের কিছু অমিল রয়েছে। তা থাক্ গে। আমি আজ সেই বিবরণের কথাই বলব। কবিকর্ণপুরের মতে দর্শনার্থীদের হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্য ভক্তরা প্রভুকে কাঁচরাপাড়া থেকে শান্তিপুরে নিয়ে এলেন। প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে কাছে পেয়ে অদ্বৈতাচার্য বড়ই পুলকিত হয়ে উঠলেন।

কিন্তু প্রভু বৃন্দাবন যাবেন শুনে তিনি আর তাঁকে বেশিদিন বেঁধে রাখতে পারলেন না। প্রভু শান্তিপুর থেকে নবদ্বীপে এলেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল, কয়েকদিন একটু নির্জনে কাটাবেন। কিন্তু দিনরাত দর্শনার্থী আসতে থাকল। লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল—হাজার হাজার লোক।

ভিড় এড়াবার জন্য প্রভু একদিন রাতে বিদ্যানগরের পালিয়ে গেলেন। তখন বিদ্যানগর ও নবদ্বীপের মাঝে গঙ্গা প্রবাহিতা। তার মানে বিদ্যানগর নবদ্বীপের ওপারে। তাই প্রভু নৌকোয় করে বিদ্যানগরে গিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে গঙ্গার গতিপথ পরিবর্তনের ফলে এখন বিদ্যানগর ও নবদ্বীপ গঙ্গার একই তীরে হয়ে গিয়েছে। আমরা আগামীকাল বিদ্যানগরে রাত্রিবাস করব।

যাক্ গে, ভূগোলের প্রসঙ্গ থাক, গৌরকথায় ফিরে আসা যাক। গভীর রাতে নৌকোয় রওনা হয়ে অন্ধকার থাকতেই তিনি বিদ্যানগরে সার্বভৌমের ভাই বাচস্পতির বাড়ি এসে উপস্থিত হলেন।

বাচস্পতি চোখ ডলতে ডলতে দরজা খুলে মহাপ্রভুকে দেখতে পেয়ে তাঁর পায়ের ওপরে পড়লেন। প্রভু বললেন—আমি কয়েকদিন এখানে অজ্ঞাতবাসে থেকে গঙ্গাস্নান করতে চাই।

বাচস্পতি বললেন—আমি আপনাকে লুকিয়ে রাখবার যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

কিন্তু তাঁর সাধ্য কি তিনি প্রভুকে লুকিয়ে রাখেন! পরদিনই কথাটা রাষ্ট্র হয়ে গেল। ফলে হাজার হাজার দর্শনার্থী পাগোলের মতো বাচস্পতির বাড়িতে ছুটে আসতে থাকলেন। শত্রু-মিত্র সকলেই এলেন। মিত্রদের কথা থাক। বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের ভাষায় শত্রুদের অবস্থা তখন—

'কান্দয়ে নিন্দুক সব করে হায় হায়।
এইবার নদীয়া এলে ধরিব তার পায় ॥
না জানি মহিমা গুণ কহিয়াছি কত।
এবার নাগালি পেলে হব অনুগত ॥
দেশে দেশে যত জীব তরাইল শুনি।
চরণে ধরিলে দয়া করিবে আপুনি ॥
না বুঝিয়া কহিয়াছি যত কুবচন।
এইবার পাইলে তাঁর লইব শরণ ॥'...

তাঁরা সবাই এসে বাচস্পতির বাড়িতে ভিড় করলেন। তাঁদের সেই এক কথা—একবার প্রভুকে দর্শন করাও।

প্রভু যখন দেখলেন জনতার চাপে বাচস্পতির বাড়ি-ঘর সব যায়, বিদ্যানগর উজাড় হতে চলেছে, তখন তিনি বাচস্পতিকে না জানিয়েই এই কুলিয়ায় মাধব দাসের বাড়িতে পালিয়ে এলেন। বাচস্পতি পরে তাঁর অন্তর্ধানের কথা জানতে পেরে খুবই কষ্ট পেলেন।

তবে তিনি সেই দুর্ভাগ্যের কথা ভাবার সময় পেলেন না। কারণ ততক্ষণে দর্শনার্থীদের ভিড় শতগুণ বেড়ে গিয়েছে। বাচস্পতি তাই বাইরে বেরিয়ে এসে কাঁদতে কাঁদতে বললেন—আপনারা দয়া করে শান্ত হোন, প্রভু আমাকে না জানিয়ে কোথায় যেন চলে গিয়েছেন।

কিন্তু কে তাঁর সে কথা বিশ্বাস করবে? তাই জনতা ঠিক করলেন বাচস্পতিকে পরীক্ষা করা হোক। হরিধ্বনি দেওয়া যাক। হরিধ্বনি শুনলে প্রভু আর বাচস্পতির বাড়িতে লুকিয়ে থাকতে পারবেন না।

হাজার হাজার কণ্ঠে হরিধ্বনি উঠল। বিদ্যানগর কখনও আর এমন হরিধ্বনি শুনতে পায় নি। কিন্তু প্রভু দর্শন দিলেন না। জনতা বুঝতে পারলেন, প্রভু এখানে নেই। তাহলে কোথায় গিয়েছেন? বাচস্পতি নিশ্চয়ই জানেন। অতএব আবার জনতা বাচস্পতির ওপরে চড়াও হলেন।

নিরুপায় বাচস্পতি তখন কাঁদতে কাঁদতে প্রভুকেই ডাকতে থাকলেন। একটু বাদে জনৈক ব্রাহ্মণ তাঁকে কানে কানে জানালেন—প্রভু কুলিয়ায় মাধব দাসের বাড়িতে গিয়েছেন।

বাচস্পতি তখন সানন্দে জনতার সামনে ঘোষণা করলেন—প্রভু কুলিয়ায় গিয়েছেন। চলো, আমি তোমাদের সঙ্গে করে সেখানে নিয়ে যাই।

এদিকে এখানে, এই কুলিয়ায় মাধব দাসের বাড়িতে তখন আনন্দের বন্যা। এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে প্রভুকে কাছে পেয়ে মাধব প্রথমে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলেন। তারপরে একটু প্রকৃতিস্থ হবার পরে ভাবলেন, আমার এই সৌভাগ্যের সংবাদ স্বজনদের দিতে হয়। কিন্তু হায়, সে সংবাদ কাউকে দিতে হল না। তার আগেই হাজার হাজার লোক এসে তাঁর বাড়ি ঘেরাও করে ফেলল। তাদের সবার মুখে সেই এক কথা—প্রভু, দর্শন দাও।

পাছে ভিড়ের চাপে প্রভুর কিছু ক্ষতি হয়, তাই মাধব লোকজন লাগিয়ে বাঁশ কাটিয়ে তাঁর বাড়ির চারিদিকে বেড়া বাঁধালেন। তাঁর বাড়ি প্রায় কেল্লার মতো সুরক্ষিত হ'ল। কিন্তু পরদিন সকালে মাধব দেখলেন বাঁশের কেল্লা ভেঙে চুড়মার। তিনি তখন প্রভুর নিরাপত্তার কথা ভেবে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ঠিক এই সময় কোলাহল আরও বেড়ে গেল। কয়েক হাজার দশনার্থীকে নিয়ে বাচস্পতি নবদ্বীপ থেকে কুলিয়া পৌঁছলেন।

অনেক বলে কয়ে দর্শনার্থীদের বাইরে দাঁড় করিয়ে বাচস্পতি বাড়ির ভেতরে এলেন। প্রভুর পায়ের ওপরে আছাড় খেয়ে পড়লেন। কাঁদতে কাঁদতে নিজের দুরবস্থার কথা বলে প্রার্থনা জানালেন—আপনি একবার বাইরে চলুন।

একটু হেসে প্রভু বললেন—নিশ্চয়ই যাবো। শুধু দর্শন নয় আমি সবার সঙ্গে সংকীর্তন করব। তুমি ওদের আরেকটু ধৈর্য ধরে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বল, আমি তার আগে পণ্ডিত দেবানন্দের অপরাধ ভঞ্জন করে নিই। ঐযে সে দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে, কাছে আসতে লজ্জা পাচ্ছে। ওকে বল, আমি ডাকছি।

প্রভুর আহ্বান শুনে পণ্ডিত দেবানন্দ ভয়ে ভয়ে কাছে এলেন। তিনি ছিলেন ভাগবতে অদ্বিতীয় পণ্ডিত, সচ্চরিত্র এবং মহাজ্ঞানী। কিন্তু তিনি ভক্তিতত্ত্বে বিশ্বাস করতেন না। বৈষ্ণবদের নিন্দা করতেন। একবার শ্রীবাস পণ্ডিতকে বড়ই অপমান করেছিলেন।

দেবানন্দ কাছে এসে হাতজোড় করে প্রভুকে বললেন—তুমি কৃপাময়। জগৎকে উদ্ধার করতে নবদ্বীপে আবির্ভূত হয়েছো। আমি পাপী। তোমাকে জানার চেষ্টা করি নি। ফলে এতদিন তোমাকে ভক্তি করার পরমানন্দ থেকে বঞ্চিত হয়েছি। প্রভু, সর্ব-ভূত-কৃপালুতা তোমার স্বভাব। তাই তুমি আমাকে কৃপা করো। আমাকে আশীর্বাদ করো, তোমার চরণে যেন আমার অনুরাগ জন্মায়।

প্রভু বললেন—দেবানন্দ, আজ তোমার সকল অপরাধ ভঞ্জন হ'ল।

তারপরে দেবানন্দ পণ্ডিতের অনুরোধে প্রভু তাঁর কাছে শ্রীমদ্‌ভাগবতের মূল তত্ত্ব পরিবেশন করলেন। তাঁকে ভাগবত অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার রীতি বলে দিলেন। বললেন—

'সকল শাস্ত্রেই মাত্র কৃষ্ণভক্তি কয়।
বিশেষত ভাগবত—ভক্তির রসময়॥
চল তুমি যাহ অধ্যাপনা কর, গিয়া।
কৃষ্ণভক্তি-অমৃত সভারে বুঝাইয়া॥
দেবানন্দ পণ্ডিত প্রভুর বাক্য শুনি।
দণ্ডবত প্রণাম করিলা ভাগ্য মানি॥
প্রভুর চরণ কায়-মনে করি ধ্যান।
চলিলেন বিপ্র করি অনেক প্রণাম।'

থামলেন প্রভুপাদ। তারপরে একটু কেঁশে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে আবার বলতে থাকলেন, "ভক্তবৃন্দ, শুধু দেবানন্দ পণ্ডিত নন, মহাপ্রভু বর দিয়েছিলেন—যে কোনো অপরাধী এখানে এসে নিজের অপরাধ কবুল করলে মহাপ্রভুর কৃপায় তার অপরাধ ভঞ্জন হয়ে যাবে, তাই এখানে অপরাধভঞ্জনের পাট। আমরা ধন্য, আজ এই পুণ্যভূমি দর্শন করতে পারলাম।"

॥ ষোল ॥

গতকাল রাত সাড়ে বারোটায় রাধেশ্যাম গৌরলীলা কীর্তন অর্থাৎ চাপাল-গোপাল উদ্ধারের পালা গাওয়া শেষ করেছে। গোপাল নামে জনৈক ব্রাহ্মণ নিজের স্বভাবের দোষে নবদ্বীপে চাপাল গোপাল নামে পরিচিত হয়েছিল। নিমাই ও তাঁর ভক্তমণ্ডলীর কুৎসা রটনার জন্য সে একদিন রাতে শ্রীবাসের বাড়ির দোরগোড়ায় একটি মদের হাড়ি, কয়েকটি জবাফুল এবং কলাপাতায় কিছু আতপ চাল ও দুর্বা রেখে দিল। ভাবল সকালে সবাই এগুলো দেখে ভাববে যে হরিনাম নিমাইয়ের লোক দেখানো, আসল তিনি একজন তান্ত্রিক। রাতে শ্রীবাসের বাড়িতে কাপালিকদের কুক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়।

পরদিন সকালে দরজা খুলে শ্রীবাস সব দেখতে পেয়ে খুব কষ্ট পেলেন। তিনি বুঝতে পারলেন এটি বৈষ্ণব নিন্দুক চাপাল গোপালের কাজ। কিন্তু বৈষ্ণব শ্রীবাস চাপল গোপালের কোনো অমঙ্গল কামনা করলেন না। কেবল তাঁর প্রাণের ঠাকুরকে স্মরণ করে এই দুঃখকে সহ্য করার শক্তি প্রার্থনা করলেন।

শেষ পর্যন্ত এই চাপাল গোপাল কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়ে শ্রীচৈতন্যদেবের সামনে এসে দণ্ডবৎ করেন। বলেন—সংসার উদ্ধার করার জন্য তুমি পৃথিবীতে উদিত হয়েছো। পরের দুঃখ দেখে কাতর হওয়াই তোমার স্বভাব। তাই আমি তোমার কাছে এসেছি। তুমি আমাকে এই কুষ্ঠরোগ থেকে ভাল হবার উপায় বলে দাও।

প্রভু তাঁর কথা শুনে রেগে গেলেন। ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললেন—তুই পাপী। তোর মুখ দেখলে দিন খারাপ যাবে। তুই বৈষ্ণব নিন্দুক। তুই মহাভাগবত শ্রীবাস পণ্ডিতের চরিত্র হনন করতে চেয়েছিলি। ধর্মরাজ তাই তোকে কুষ্ঠজ্বালা দিয়েছেন।

কুষ্ঠরোগী কাতর কণ্ঠে বললেন—আমি প্রমত্ত হয়ে বৈষ্ণবের নিন্দা করে তার উচিত শাস্তি পেয়েছি। এখন তাই তুমি আমাকে আর উপেক্ষা ক'রো না। তুমি সর্ব-জ্ঞাতা, তুমি বলো আমাকে কি প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে?

অবশেষে পরম-করুণাময় শ্রীচৈতন্য তাকে উদ্ধার করলেন। বললেন—

'চল কুষ্ঠরোগি! তুমি শ্রীবাসের স্থানে।
সত্বরে পড়হ গিয়া তাঁহার শ্রীচরণে॥

তাঁর ঠাঁই তুমি করিয়াছ অপরাধ।
নিস্কৃতি তোমার তিঁহো করিলে প্রসাদ ॥...
সেই কুষ্ঠরোগি শুনি প্রভুর বচন।
দণ্ডবৎ হইয়া চলিলা সেইক্ষণ ॥
সেই কুষ্ঠরোগে পাই শ্রীবাসপ্রসাদ।
মুক্ত হৈল—খণ্ডিল সকল অপরাধ ॥' *

রাধেশ্যাম দাসের গৌরীলীলা কীর্তনের আগে গতকাল রাতে রসময়দা রামায়ণ গান গেয়েছেন। গতকাল তাঁর বিষয়বস্তু ছিল—কুশ-লবের রামায়ণ গান। ফরমাশ করেছিল ছোড়দা। মানে প্রভুপাদের ছোটছেলে আনন্দগোপাল। তার সঙ্গে জেঠু অর্থাৎ রসময়দার খুবই খাতির। সে কিন্তু শুধু ফরমাশ করেই ক্ষান্ত হয় নি। প্রচণ্ড ঠাণ্ডার* মধ্যে রাত এগারোটা পর্যন্ত জেঠুর পাশটিতে বসে গান শুনেছে। বড়দা ও মেজদা মানে জয়গোপাল ও নিত্যগোপাল কিন্তু প্রভুপাদের পাঠের পরে আমাদের সঙ্গে এসে প্রসাদ পেয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছে। আমরা অবশ্য কেউই ঘুমিয়ে পড়ি নি। শুয়ে শুয়ে রামায়ণ গান এবং গৌরলীলা কীর্তন শুনেছি। কিন্তু ছোড়দার মতো প্রচণ্ড শীত উপেক্ষা করে রসময়দার পাশটিতে বসে থাকি নি।

গতকাল রাতের প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বলে নেওয়া দরকার। এ অঞ্চলে নাকি মাঝে মাঝেই ডাকাত পড়ে এবং তাঁদের হাত থকে তীর্থযাত্রীরাও নিস্তার পান না। কথাটা প্রভুপাদের জানা ছিল বলে তিনি যাত্রার আগে কর্তৃপক্ষের সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন। তাঁরা আমাদের রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েও শেষ পর্যন্ত কিছুই করলেন না। সেদিন রাজাপুর থেকে নবদ্বীপ থানায় ফোন করে কোনো সাহায্য পাই নি। তাই গতকাল যখন শুনলাম যে মাঝে মাঝেই এখানে ডাকাত পড়ে, তখন ঠিক করলাম আমাদের দলের যুবকরা রাতে পাহারা দেবে। কিন্তু রাধেশ্যামের কীর্তনের পরে তারা যখন লাঠি ও টর্চ নিয়ে তৈরি হচ্ছে, তখন দেখা গেল একদল মানুষ কাটারি বল্লাম আর আলো নিয়ে এখানে আসছে। আমরা ভয় পেয়ে গেলাম। ভাবলাম, শেষপর্যন্ত তাহলে গৌড়পরিক্রমায় বেরিয়ে ডাকাতের হাতে পড়তেই হল। কিন্তু তারা কাছে আসার পরে বুঝতে পারি আমাদের আশঙ্কা সত্য নয়। স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ি। তারা বলে—আমরা এই গাঁয়ের মানুষ। আপনারা অতিথি।

---

* শ্রীচৈতন্যভাগবত

একরাতের জন্ত আমাদের গাঁয়ে এসেছেন। আপনারা রাত জেগে পাহারা দেবেন? তা কি হয়? আপনারা শুয়ে পড়ুন। আমরা বেঁচে থাকতে আপনাদের কোনো ক্ষতি হবে না।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য কালরাতে তারা আসে নি। তবে এ গ্রামে না এলেও পাশের গ্রাম জঙ্গলবাসে এসেছে। এবং আজ সকালে ঘুম থেকে উঠেই সে খবর পাওয়া গেল। জনৈক অবস্থাপন্ন ঘোষমশায়ের বাড়িতে ডাকাত পড়েছিল। কিন্তু সেখানেও তাদের গ্রামবাসীদের প্রতিরোধের মুখোমুখি হতে হয়েছে। ফলে তারা তেমন কিছু নিয়ে যেতে পারে নি। কিন্তু তাদের বোমায় গৃহকর্তা ঘোষমশায় আহত হয়ে হাসপাতালে গিয়েছেন।

ইদানীং আমরা আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে বেশ একটু গর্ববোধ করতে শুরু করেছি। আমাদের ধারণা ভারতের অন্তান্ত রাজ্যের তুলনায় এখানে রামরাজত্ব চলেছে। ধারনাটি যে সত্য নয়, তা এই পরিক্রমায় এসে বেশ বুঝতে পারছি। গ্রামবাংলায় ডাকাতি প্রায় নিত্যকারের ঘটনা। ফলে গ্রামবাসীদের প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তুলতে হয়েছে।

যাক্ গে নিতাই-গৌরের অশেষ কৃপা। তাঁদের করুণায় কালরাতটি আমাদের ভালয় ভালয় কেটেছে। আজ সকালেও আমরা যথারীতি ভোরে উঠেছি। মঙ্গলারাত্তির পরে বিছানা বেঁধে ও জিনিসপত্র গুছিয়ে গাড়িতে দিয়ে দিয়েছি। তারপরে ঝোলা কাধে বেরিয়ে এসেছি পথে। শুরু হয়েছে সংকীর্তন শোভাযাত্রা।

এখন সকাল সাতটা। তার মানে আজ ঠিক সময়েই যাত্রা করা গেল। এর প্রয়োজনও ছিল। আজ এই পরিক্রমার দীর্ঘতম পথ পাড়ি দিতে হবে। আমরা প্রথমদিন সাড়ে ছ'মাইল হেঁটেছি—নবদ্বীপ থেকে নিদয়া, দ্বিতীয় দিনে এগারো মাইল—নিদয়া থেকে রাজাপুর, তৃতীয়দিন সাড়ে ছ' মাইল—রাজাপুর থেকে গৌরাঙ্গনগর, চতুর্থদিন এগারো মাইল—গৌরাঙ্গনগর থেকে মাজদিয়া। পঞ্চমদিন অর্থাৎ গতকাল সাতমাইল হেঁটে সাতকুলিয়া এসেছি। কিন্তু আজ হাঁটতে হবে তেরো মাইল। আজ আমরা একেবারে বিদ্যানগর গিয়ে থামব। সুতরাং সময়ে বেরুতে পেরে ভালই হ'ল আজ।

একটা কথা ভাবলে সত্যি অবাক হতে হয়। একে গ্রামবাংলা তার ওপরে এখন খুবই শীত পড়েছে। আমরা প্রায় সকলেই শহুরে মানুষ, অধিকাংশই বয়স্ক। কিন্তু প্রায় শেষরাত থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত একটি সংঘবদ্ধ দলের মতো আমরা সবকাজ করে চলেছি। আনন্দের সঙ্গেই করছি। আশি বছরের

আশ্রম মাতা থেকে দশ বছরের ছোড়দা পর্যন্ত সবাই সর্বদা আনন্দময় হয়ে রয়েছে। আর দাদাদের কথা কিই বা বলব? স্নানের ঠিক নেই। খাবার ঠিক নেই, শোবার ঠিক নেই। কিন্তু ওরা সর্বদাই আনন্দময়। কেউ সাইকেল ভ্যান টানছে, কেউ খোল বাজাচ্ছে, কেউ উর্দ্ধবাহু হয়ে কীর্তন করছে। এইতো দ্বিতীয়দিন দুপুরে বেলপুকুর থেকে রাজাপুর আসার পথে মেজদা অর্থাৎ নিত্যগোপালের পা কেটে গেল। সত্যি বলতে কি রক্ত দেখে ডাক্তারবাবু পর্যন্ত একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। তাই তিনি মেজদাকে নবদ্বীপ ফিরে যাবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু মেজদা সে পরামর্শ শোনে নি। সেই পা নিয়েই সমানে পরিক্রমা করে চলেছে।

যাক্ গে, এবারে পরিক্রমার প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। সাতকুলিয়া স্কুল থেকে মিনিট পনেরো হেঁটে আবার অপরাধভঞ্জনের পাটে এলাম। গ্রামবাসীরা অনেকেই কীর্তন করতে করতে আমাদের সঙ্গে এসেছেন। পাটে প্রণাম করে সজল চোখে তাঁদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। তারপরে গঙ্গার তীরপথ ধরে এগিয়ে চলি পশ্চিমে।

গঙ্গার দিকে চোখ পড়লেই গ্রামপ্রধানের সেই কথাগুলো মনে পড়ে যাচ্ছে, ব্যাকুল গ্রামবাসীদের অসহায় মুখগুলো চোখের সামনে ভেসে উঠছে। মনে পড়ছে সেই সনির্বন্ধ অনুরোধ—আপনারা যদি আমাদের হয়ে একটু চেষ্টা করেন, যদি কোনরকমে গঙ্গার ভাঙন রোধ করা যায়!

যে গঙ্গা ন'দের ধাত্রী, কলির ভগবানের জন্মদাত্রী, সেই গঙ্গা নদীয়াবাসীদের দিনের কাজ আর রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। অথচ আমরা তাঁদের আকুল আবেদনে সাড়া দিতে পারলাম না। আমরা কত অপদার্থ!

গঙ্গার তীরে তীরে সংকীর্তন শোভাযাত্রা চলেছে এগিয়ে। সহযাত্রীরা কীর্তন করছেন আর আমি গঙ্গাকে দেখছি। গঙ্গার এপার ভাঙছে, ওপার গড়ছে। ওপারে যতদূর দেখা যায় শুধুই গঙ্গার চর, ধু ধু করা সাদা বালিয়াড়ি। গঙ্গা জঙ্গলবাস গ্রাম পর্যন্ত দক্ষিণ প্রবাহিনী, তারপরে খানিকটা দক্ষিণ-পূর্ব বাহিনী হয়ে সহসা বাঁক ফিরে পশ্চিম প্রবাহিনী হয়েছে। সাতকুলিয়া সেই পশ্চিমবাহিনী গঙ্গার দক্ষিণতীর। আমরা সেই তীর ধরে গঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমে অর্থাৎ বর্ধমান জেলার দিকে এগিয়ে চলেছি।

আমি বরিশাল জেলার মানুষ। নদীর ভাঙনে গ্রাম ধ্বংস হবার ঘটনা আমার কাছে নূতন নয়। আবার খাল কেটে নদীর গতিপথ পরিবর্তন করতেও আমি দেখেছি। ওপারের বিস্তৃত চরটিকে দেখে আমার মনে হচ্ছে, এখানেও

তা সম্ভব। কারণ গঙ্গা অনেকখানি পথ ঘুরে এখানে এসেছে। তাছাড়া এর পরে আবার সে দক্ষিণবাহিনী হয়েছে। আমার ধারণা চরব্রহ্মনগর অর্থাৎ যেখানে দক্ষিণবাহিনী গঙ্গা দক্ষিণ-পূর্ব বাহিনী হয়েছে, সেখান থেকে যদি পরবর্তী বাঁক অর্থাৎ গঙ্গা যেখানে আবার দক্ষিণবাহিনী হয়েছে, সেই পর্যন্ত ওপারের চরের ওপর দিয়ে আড়াআড়ি ভাবে উত্তর-দক্ষিণে একটা খাল কেটে দেওয়া যায়, তাহলে গঙ্গার অধিকাংশ জল সেই সোজাপথে প্রবাহিত হবে, ফলে সাতকুলিয়া অঞ্চলের ভাঙন বন্ধ হয়ে যাবে। আর অদূর ভবিষ্যতে সেই খালটাই হবে মূল-গঙ্গা। নবাব অলিবর্দীর আমলে গার্ডেনরিচ অঞ্চলে একটি খাল কেটে গঙ্গার প্রবাহপথ পরিবর্তিত করা হয়েছিল। কাজেই আজকের যুগে এটি কোনমতেই অসম্ভব নয়। এবং সামান্য সাহায্য পেলে এ অঞ্চলের অধিবাসীরা নিজেরাই শ্রমদান করে খালটি কেটে দিতে পারেন। কিন্তু কে তাঁদের পরামর্শ দেবেন, কে তাঁদের পরিচালনা করবেন?

কিন্তু থাক্ গে, এসব কথা। মাননীয় নেতারা যদি তাঁদের অসহায় ভোটারদের আবেদনে অবিচলিত থাকতে পারেন, আমি কেন তাঁদের কথা ভেবে মন খারাপ করি। তার চেয়ে বরং মনে মনে গৌরকথা স্মরণ করা যাক। আমি যে গৌড়মণ্ডল পরিক্রমা করছি।

গতকাল মাজদিয়া থেকে সাতকুলিয়া আসার পথে প্রভুপাদ গ্রামবাসীদের কাছে নিতাই-গৌর মিলনের কথা বলেছেন। বলেছেন নিত্যানন্দের ব্যাসপূজার কথা। তারপরে সাতকুলিয়ায় এসে আর নিমাই পণ্ডিতের কথা আলোচনা হয় নি। সব আলোচনাই হয়েছে শ্রীচৈতন্যদেবকে নিয়ে। এই অবসরে তাই একটু নিমাই পণ্ডিতের কথা ভেবে নেওয়া যাক।

শ্রীবাস আচার্যের বাড়িতে মুহুর্মুহু নিমাইয়ের 'ভগবন্-ভাব' হতে থাকল। তারই মধ্যে একদিন নিমাই শ্রীবাসের ভাই শ্রীরামকে শান্তিপুরে যেতে বললেন। বললেন, "তুমি আদৈতাচার্যকে বলবে, যাঁর জন্য তিনি উপবাস ও তপস্যা করছেন, সেই তিনিই আমি। তাঁরই আকর্ষণে আমি এসেছি। এখন তিনি সস্ত্রীক এখানে এসে আমার আনন্দ বর্ধন করুন।"

শ্রীরামের কাছে সবকথা শুনে শ্রীঅদ্বৈত ভারী আনন্দিত হলেন। তিনি প্রথমে 'এনেছি, আমি এনেছি!' বলে নাচতে আরম্ভ করে দিলেন। কিন্তু একটু পরেই আবার কাঁদতে শুরু করলেন।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত সস্ত্রীক শ্রীঅদ্বৈতকে নিয়ে শ্রীরাম শান্তিপুর থেকে নবদ্বীপ রওনা হলেন। পথে হঠাৎ অদ্বৈত শ্রীরামকে বললেন, "আমি নবদ্বীপে

পৌঁছে নন্দন আচার্যের বাড়িতে লুকিয়ে থাকব। তুমি গিয়ে নিমাইকে বলবে আমি আসি নি। দেখি সে কি করে? তবে সে যদি সত্যই আমার নন্দনন্দন হয়, তাহলে নিশ্চয়ই জানতে পারবে আমি নবদ্বীপে এসেছি।

শ্রীঅদ্বৈত বোধকরি জানতেন না যে এই একই পরীক্ষা করে নিতাই একবার নিমাইকে যাচাই করে নিয়েছেন। জানতে অবশ্য তাঁর খুব দেরি হল না। তাঁরা নবদ্বীপের ঘাটে নেমেই দেখতে পেলেন, প্রভুর অনেক ভক্ত তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছেন। তিনি শ্রীঅদ্বৈতকে বললেন, "প্রভু আপনাদের পথ চেয়ে বসে রয়েছেন, আপনারা তাড়াতাড়ি আমার সঙ্গে আসুন।"

অদ্বৈত বুঝতে পারলেন নিমাই অন্তর্যামী, সে তাঁর আগমনের কথা জানতে পেরে একে ঘাটে পাঠিয়ে দিয়েছে। তিনি আবার কেঁদে ফেললেন।

কাঁদতে কাঁদতেই শ্রীঅদ্বৈত তাঁর বন্ধু জগন্নাথ মিশ্রের বাড়িতে এলেন। তারপরে চোখের জল মুছে তিনি নিমাইয়ের সামনে এসে দাঁড়ালেন। তিনি অপলক নয়নে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর মনের মানুষ বার বার তাঁকে বলতে থাকলেন—ইনিই তিনি, তোমার সেই নন্দনন্দন, যাঁর জন্য তুমি এতকাল ধরে তপস্যা করেছো।

অদ্বৈতকে নীরব দেখে নিমাই সহাস্যে বলে উঠলেন—অমন করে তাকিয়ে কি দেখছ? তোমার আকর্ষণে আমি এসেছি। এবারে তুমি অকাতরে জীবকে প্রেম বিতরণ করো।

অদ্বৈত আবার কেঁদে ফেললেন। কাঁদতে কাঁদতে বললেন—প্রভু, আমি তোমাকে এনেছি, একথা কে বিশ্বাস করবে? তুমি ইচ্ছাময়, তোমার ইচ্ছা না হলে কে তোমাকে আনতে পারে? জীবের দুঃখ দেখে তুমি নিজেই এসেছো, এখন অনুমতি দাও, আমরা তোমার চরণপূজা করে জন্ম সার্থক করি।

এখন সকাল সওয়া আটটা। তার মানে প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে আমরা গঙ্গার তীরে তীরে পদচারণা করছি। হঠাৎ চমকে উঠি। রেলের শব্দ! কোথায়, কতদূরে? কিছুই বুঝতে পারছি না। তবে এখনও আমরা নদীয়া জেলায় আছি। কতক্ষণ আছি, তা অবশ্য বলতে পারব না। শুধু জানি, গঙ্গা পার হলেই বর্ধমান। আজ বর্ধমান জেলাতেই রাত কাটাবো। আগামী-কাল আবার ফিরে আসব নদীয়ায়।

গঙ্গা পার হলে আমরা গঙ্গার পশ্চিমপারে পৌঁছব। নবদ্বীপ শহরটুকু ছাড়া

গঙ্গার পশ্চিমপার সবটাই বর্ধমান জেলা। তার মানে প্রশাসনিক দিক থেকে নবদ্বীপের অবস্থানটি বিচিত্র। নবদ্বীপ শহরের সঙ্গে জেলার বাকি অংশের কোনো সরাসরি যোগাযোগ নেই। এমনকি গৌরাঙ্গ সেতু খুলে দেবার পরেও এ অসুবিধে দূর হবে না।

আমরা গঙ্গাতীরে সারি বেঁধে পথ চলেছি। মাটির পায়ে-চলা পথ। ধুলো নেই, কাদা নেই, বেলেমাটির মসৃণ পথ। শীতের সকাল, খালিপায়ে চলতে একটু শীত-শীত করছে এই যা।

ডানদিকে গঙ্গা, বাঁদিকে ক্ষেত—পাট, অড়হর কলাই ও শর্ষে ক্ষেত। চাষীরা কাজে চলেছেন, তাঁদের হাতে কাস্তে কিম্বা কাটারি, কাঁধে কোদাল কিংবা কুড়াল। একজনকে জিজ্ঞেস করি, "কোথায় চলেছেন ভাই ?"

"সামনের ঐ ঘোড়াপাড়া গ্রামে।"

গ্রামটি দেখা যাচ্ছে। ঘর-বাড়ি দেখতে পাচ্ছি না এখনও, কেবল বাঁশবন আর কলাবাগান চোখে পড়ছে।

মানুষের তৈরি পথ নয়, গঙ্গার বেলাভূমি—প্রকৃতির পথ। তাই পথে যেমন ধুলো নেই, তেমনি খানা-খন্দ নেই। সাইকেল ভ্যান টেনে নিয়ে যেতে কোনো কষ্ট হচ্ছে না। আর কেবল সাইকেল ভ্যানের কথাই বা বলি কেন ? মাঝে মাঝে দু-একখানা সাইকেল বেল দিতে দিতে আমাদের শোভাযাত্রাকে অতিক্রম করে চলে যাচ্ছে। সত্যি বলতে কি এই ঘণ্টাধ্বনিটা ভাল লাগছে না। গত কয়েকদিন যেন গ্রামবাংলার অন্তরলোকের সঙ্গে মিলেমিশে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু কিছুক্ষণ আগের ঐ রেলের শব্দ আর এই সাইকেলের বেল শুনে আমি যেন গ্রামবাংলাকে হারিয়ে ফেলছি, কেমন একটা শহুরে গন্ধ নাকে আসছে।

তাহলেও বলব আমার আশঙ্কা সত্য নয়। আমি গ্রামবাংলাতেই পদচারণা করছি। এখন আমরা একটি বাঁশবনের ভেতর দিয়ে ঘোড়াপাড়া গ্রামে প্রবেশ করছি। ভারী সুন্দর পথ। পথের পাশে কলাগাছে ছাওয়া খড়ের ঘর—ছবির মতো মনোরম গ্রাম।

কীর্তনের শব্দ শুনে দলে দলে নারী-পুরুষ আর বালক-বালিকা ঘর ছেড়ে পথে নেবে এসেছে। তারা সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আমাদের অভিনন্দিত করছে। সস্ত্রীক দুলাল যথারীতি তাদের সবার কপালে চন্দন তিলক পরিয়ে দিচ্ছে। এদের মধ্যে মুসলমানও আছে। কিন্তু কেউ কোনো আপত্তি করছে না, হাসিমুখে প্রেমের তিলক ললাটে গ্রহণ করছে।

কয়েকজন গ্রামবাসী আবার আমাদের সঙ্গে সঙ্গে পথ চলেছেন, কেউবা কীর্তন শুরু করে দিয়েছেন। তাঁদেরই একজন জানালেন—ঘোড়াপাড়া বেশ বড় গ্রাম। কয়েকঘর মুসলমান সহ প্রায় হাজার ঘর গৃহস্থ আছেন। জন-সংখ্যা পাঁচ হাজারের মতো।

আরেকজন গ্রামবাসী বলেন, "আপনারা আজই চলে যাবেন কেন? দোলের সময় যে-সব পরিক্রমা আসেন, তাঁদের অনেকেই এখানে রাত কাটান। আমরা তাঁদের চাল-ডাল ও তরিতরকারী সিধে দিই। আপনারাও আজ থেকে যান না আমাদের গাঁয়ে! আমরা হিন্দু-মুসলমান সবাই মিলে আপনাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেব।"

প্রভুপাদ সবিনয়ে বলেন "তোমাদের এই ভালোবাসা অতুলনীয়। কিন্তু বাবা, কাল যে আমরা নবদ্বীপ ফিরব, আজ তাই বিদ্যানগর পর্যন্ত যেতেই হবে।"

"আপনারা চাঁপাহাটিতে থামবেন না?" লোকটি সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেন।

প্রভুপাদ উত্তর দেন, "না, আজ আমরা একেবারে বিদ্যানগর চলে যাবো।"

এবারে ওঁরা আমাদের অক্ষমতা অনুধাবন করতে পারেন। কারণ চাঁপাহাটি বড় জায়গা, সেখানে রাত্রিবাসের সুবন্দোবস্ত আছে। তবু আমরা সেখানে থাকছি না। আমাদের নিশ্চয়ই সময়ের অভাব। তবু তাঁদের একজন বলেন, "বিদ্যানগর তো বহুদূর। একদিনে অতখানি পথ যেতে পারবেন? সঙ্গে ঠাকুরের সিংহাসন রয়েছে, রয়েছেন অনেক বুড়োমানুষ।"

"হ্যাঁ বাবা! তবু যেতেই হবে আজ। তাই তো তোমাদের এখানে একবারটি বসতে পর্যন্ত পারছি না, বড্ড তাড়াতাড়ি করতে হচ্ছে।"

"তাই করুন।" ওঁরা পরামর্শ দেন। বলেন, "তবে আগামী বছর এখানে রাত কাটাতে হবে, তা কিন্তু এখুনি বলে রাখলাম।"

আমরা সম্মতি জানিয়ে এগিয়ে চলি। জানি এতে আমাদের কোনো দায়িত্ব বাড়ছে না। কারণ আগামী বছর আমরা পরিক্রমায় আসছি না। তবে একথাও সত্য, যদি আর কখনও গৌড়মণ্ডল পরিক্রমায় আসি, তাহলে এই অখ্যাত ঘোড়াপাড়া গ্রামে রাত্রিবাস করতেই হবে। নইলে এঁরা পথের ওপরে অবস্থান ধর্মঘট করবেন।

আগেই বলেছি গ্রামবাংলা সম্পর্কে আমার ধারনাটি খুব সুস্পষ্ট নয়। অথচ জানি গ্রামবাংলার সঙ্গে পরিচয় না হলে বাঙ্গালী মনেরও পরিচয় পাওয়া যায় না। বাঙ্গালী মনের প্রকৃত পরিচয় পেতে হলে আসতে হবে এইসব গ্রামে, যার সঙ্গে আজও কলকাতার সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হয় নি। অর্থাৎ

'ইলেকট্রোনিক্স' সভ্যতার 'স্পার্ক' বা স্ফুলিঙ্গ এসে এখানকার মানুষের চোখ ধাঁধিয়ে দেয় নি। এঁরা খবরের কাগজ পড়েন, মাঝে মাঝে শহরে গিয়ে হিন্দী সিনেমাও দেখেন এবং নিয়মিত ভোট দেন, তবু এঁদের মনগুলো আজও অনেকখানি উদার ও সরল রয়ে গিয়েছে। এঁদের শিক্ষা সামান্য, সাধ্য সীমিত, কিন্তু এঁরা মানুষের জন্য কিছু করতে পারলে ভারী খুশি হন। সবচেয়ে বড় কথা খরা বন্যা ও রাজনীতির শিকার হয়েও এঁরা মানুষকে ভালোবাসেন। আর তাই এঁদের মধ্যে মহাপ্রভু আজও বেঁচে রয়েছেন।

গ্রামের ভেতর দিয়ে আমরা খেয়াঘাটে এলাম। ঘাটের নাম ঘোলাঘাট। এখন সকাল ন'টা। আমরা এবারে ওপারে যাবো। পরিক্রমার প্রথম দিনে নিদয়ায় গঙ্গা পার হয়ে এপারে এসেছিলাম, আজ ষষ্ঠদিনে আবার ওপারে অর্থাৎ নবদ্বীপের পারে যাচ্ছি।

ঘোলা বেশ বড় ঘাট। খেয়া-নৌকাও বড়—ওপরে বাঁশের পাটাতন। গাড়ি-গরু সবই পার করা যায়। সবচেয়ে বড় কথা, ঠাকুরের সিংহাসন সহ আমরা সবাই দুবারে পার হতে পারব।

প্রথম নৌকোয় মেয়েরা রওনা হয়ে গেলেন। ওপার থেকে দ্বিতীয় নৌকো এপারে এলো। ঠাকুরের সিংহাসন সহ সবাই উঠে এলাম। এর আগে আরও দুবার নদী পার হয়েছি, কিন্তু এতলোক একসঙ্গে নৌকোয় উঠতে পারি নি। আজ তাই কীর্তনীয়ারা মনের আনন্দে গান ধরেছেন।

স্রোতের বিপরীত দিকে যেতে হবে বলে দু'জন জওয়ান মাঝি গঙ্গার তীরে তীরে গুণ টেনে আমাদের খেয়া বয়ে নিয়ে চলেছে। মিনিট দশেক গুণ টানার পরে তারা পা ধুয়ে নৌকোয় উঠে এলো, দাঁড় বাইতে আরম্ভ করল।

আধঘণ্টার মধ্যে আমরা এপারে পৌঁছলাম। এটিকে সমুদ্রগড় ঘাট বলা হলেও গঙ্গাতীরের এই গ্রামখানির নাম নসরতপুর। ছোট গ্রাম। সত্তর-আশি ঘর অর্থাৎ মাত্র তিন-চার শ' মানুষের বাস। সবাই মুসলমান। কিন্তু অনেকেই আমাদের কীর্তনের শব্দ শুনে ঘাটে ছুটে এসেছে। দু-পাশে শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে ওরা আমাদের স্বাগত জানাচ্ছে। ওদের চোখে সশ্রদ্ধ দৃষ্টি, আমাদেরও তাই।

এই শ্রদ্ধা, এই ভালোবাসা আর এই আনন্দে নবদ্বীপ তখন উদ্বেল হয়ে উঠেছে। কারণ কায়স্থ ও বৈদ্যরা ছাড়া সবাই যখন ব্রাহ্মণের পদতলে দলিত হচ্ছেন, নিমাই তখন বলতে শুরু করেছেন—'যে ভক্ত সেই ব্রাহ্মণ।'

শুধু মুখের কথা নয়। তাঁর ব্রাহ্মণ ভক্তগণ যবন হরিদাসকে প্রণাম করেন। ফলে দলে দলে নীচজাতির মানুষ নবদ্বীপে ছুটে আসতে আরম্ভ

করলেন। নিমাইয়ের ভক্ত সংখ্যা বাড়তে থাকল। নবদ্বীপ আনন্দে উচ্ছলিত হয়ে উঠল।

সুতরাং সমাজপতিরা নিমাইয়ের কুৎসা রটনা আরম্ভ করে দিলেন। কিন্তু তাতে তাঁদের কোনো লাভ হল না। কারণ দলে দলে মানুষ এসে শ্রীবাস অঙ্গনে নিমাইয়ের ভাগবত আলোচনা ও কীর্তনে অংশ নিতে থাকলেন। প্রতিদিন নতুন নতুন মানুষের সঙ্গে নিমাইয়ের পরিচয় হয়। তিনি তাঁদের ত্রিতাপ জ্বালার পরিচয় পান। তাঁর কোমল প্রাণ কেঁদে ওঠে। অবশেষে উচ্চবর্ণের অত্যাচার ও অহঙ্কার আর নিম্নবর্ণের নিপীড়ন দেখে তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন। একদিন ভক্তদের নিয়ে বেরিয়ে এলেন শ্রীবাস অঙ্গন থেকে। নিমাই নবদ্বীপের পথে পথে হরিনাম সংকীর্তন শুরু করে দিলেন। কারণ তিনি জানতেন অযাচিত হরিনাম বিতরণ করে সমাজের এই ব্যভিচার বন্ধ করা সম্ভব এবং হরিনামের মধ্য দিয়েই সমাজে বিপ্লব আসবে—রক্তপাতহীন বিপ্লব।

নিমাই নবদ্বীপের পথে পথে হরিনাম করেন আর সবাইকে বলে বেড়ান—ভাই, এই দুর্লভ মনুষ্যজন্ম কেন নষ্ট করছ আর কষ্ট পাচ্ছ? হরিকে ডাকো, হরিনাম কীর্তন করো, অন্তরে পরমানন্দ লাভ করবে।

ব্রাহ্মণ-শূদ্র পণ্ডিত-মূর্খ ধনী-দরিদ্র সবাইকে তিনি একই কথা বলে বেড়ান।

না, তিনি একা নন। নিত্যানন্দ এবং হরিদাসও নবদ্বীপের পথে পথে একই কথা বলে বেড়ান। তাঁরাও পতিত ও দীনদুঃখীদের মধ্যে নিমাইয়ের ধর্ম প্রচার করেন।

এই সময় জগন্নাথ ও মাধব নামে দুই ভাই নবদ্বীপের কোতোয়াল ছিলেন। তাঁরা ব্রাহ্মণ হলেও মাতলামি ও গুণ্ডামী করে কাটাতেন। সবাই তাঁদের জগাই মাধাই বলত। নিমাইয়ের ধর্মপ্রচার ও হরিনাম সংকীর্তন তাঁদের ভাল লাগত না, তবু তাঁরা নিমাইকে বাধা দেন নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁদের কয়েকজন ইয়ার-দোস্ত পর্যন্ত গিয়ে নিমাইয়ের দলে ভিড়ে গেল। তারা মদ খাওয়া ছেড়ে দিল আর হরিনাম শুনলেই মাটিতে গড়াগড়ি দিতে আরম্ভ করল।

জগাই মাধাই খুবই ক্ষেপে গেলেন। ঠিক করলেন এর প্রতিশোধ নিতেই হবে। সুযোগও এসে গেল।

সেদিন নিত্যানন্দ প্রচারে বেরিয়েছেন। প্রেমভাবে বিভোর হয়ে কীর্তন করতে করতে পথ চলেছেন। ভক্তকবির ভাষায়—

'নিতাই যারে দেখে তারে বলে জোড়কর করি।
আমারে কিনিয়া লহ বল গৌর-হরি॥'

ঠিক তখুনি মাতাল জগাই মাধাই টলতে টলতে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁরা নিত্যানন্দকে দেখতে পেয়েই অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি সহ অশ্রাব্য গালাগালি দিতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু নিতাই তাঁর প্রেমহর্ষিত বাহুযুগল বাড়িয়ে ধরে হাসিমুখে হরিনাম করতে করতে নাচতে নাচতে জগাই-মাধাইয়ের দিকে এগিয়ে এলেন।

জগাই মাধাই নিতাইয়ের প্রেমভাব দেখে প্রথমে একটু ঘাবড়ে গেলেন। কিন্তু তা সাময়িক। শত হলেও তাঁরা নগর-রক্ষক। তাঁরা কেন এত সহজে বিচলিত হবেন? তাই নিত্যানন্দ আরেকটু কাছে আসতেই মাধাই তাঁর মদের কলসিটা সজোরে ছুড়ে মারলেন।

লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'ল না। কলসির কানা গিয়ে লাগল নিতাইয়ের মাথায়। সঙ্গে সঙ্গে মাথা ফেটে রক্ত পড়তে থাকল।

ভক্তবৃন্দ বিভ্রান্ত। পথচারীরা ছুটে এলেন। নিতাই কিন্তু অবিচলিত। তাঁর মুখে তখনও হাসি। তিনি তেমনি নাচতে নাচতেই এগিয়ে এলেন মাধাইয়ের কাছে। দু-বাহু বাড়িয়ে তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে গেয়ে উঠলেন—

'হরি বলে আয়, নেচে আয়, জগাই মাধাই॥
মেরেছ বেশ করেছ, হরি বলে নাচ ভাই॥'

মাধাই কিন্তু নিত্যানন্দের আলিঙ্গনমুক্ত হবার কোনো চেষ্টা করলেন না। বরং তিনি তাঁর বুকে মুখ লুকিয়ে রইলেন। নিতাইয়ের মাথা থেকে ফোটা ফোটা রক্ত তাঁর মাথায় ঝরে পড়তে থাকল।

জগাইও আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। তিনিও ছুটে এসে নিতাইকে জড়িয়ে ধরলেন।

নিত্যানন্দের প্রেমের পরশে জগাই-মাধাইয়ের পাষাণ-হৃদয় দ্রবীভূত হল। তাঁদের মদের নেশা ছুটে গেল, মন অনুশোচনায় পূর্ণ হল। তাঁরা নিত্যানন্দের পায়ের ওপরে আছাড় খেয়ে পড়লেন। বার বার তাঁর কাছে ক্ষমা চাইতে থাকলেন।

সেদিন নিমাইও ভক্তদের নিয়ে প্রচারে বেরিয়েছেন। এবং তিনি কাছেই ছিলেন। খবর পেয়ে তিনি সেখানে ছুটে এলেন। নিতাইয়ের অবস্থা দেখে নিমাই খুবই রেগে গেলেন। তাঁর রুদ্রমূর্তি দেখে সবাই ভয়ে কেঁপে উঠল।

জগাই-মাধাই তখন নিতাইকে ছেড়ে দিয়ে নিমাইয়ের পা জড়িয়ে ধরলেন।

কিন্তু নিমাই শান্ত হলেন না।

নিতাই তখন তাড়াতাড়ি নিমাইয়ের কাছে এলেন। জগাই-মাধাইকে ক্ষমা করার জন্য নিমাইকে অনুরোধ করতে থাকলেন।

নিত্যানন্দের ত্যাগ তিতিক্ষা ও দয়ার পরিচয় পেয়ে প্রভু মুগ্ধ হলেন। তাঁর ক্রোধের উপশম হল। তিনি অবাক হয়ে ভাবলেন—

'মার খেয়ে প্রেম যাচে,
এমন দয়াল কোথায় আছে ?'

তারপরে নিমাই নিতাইকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন—তোমার কৃপাতেই এরা উদ্ধার পেলো।

প্রভু জগাই-মাধাইকে ক্ষমা করলেন। তাঁর কৃপায় সেদিন থেকেই তাঁদের চিত্তশুদ্ধি ঘটল। তাঁরা হরিনাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করলেন।

জগাইমাধাই নবদ্বীপের অভিজাত সমাজের নেতৃস্থানীয় ছিলেন। সুতরাং তাঁদের দেখাদেখি আরও অনেকে নিমাইয়ের দলে যোগ দিলেন। আবার জগাই-মাধাইয়ের উপদ্রব থেকে মুক্তি পেয়ে বহুলোক হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। তাঁরাও নিমাইয়ের ভক্ত হয়ে গেলেন।

জগাই-মাধাইয়ের ভক্তি দেখে নিমাই খুশি হলেন। একদিন তিনি জগাই-মাধাইকে বললেন—তোমাদের বাড়ির সামনে যে গঙ্গার ঘাট, সেটা বড় নোংরা হয়ে থাকে। সেখানে মানুষের স্নান করতে অসুবিধে হয়। তোমরা এখন থেকে রোজ সকালে ঘাটটিকে পরিষ্কার করে রাখবে।

পরদিন থেকেই দু-ভাই নিয়মিত সে আদেশ পালন করতেন। শুনেছি এখনও সে ঘাটটি আছে। সবাই বলেন—মাধাইয়ের ঘাট। আমরা আগামীকাল সে ঘাট দর্শন করব।

॥ সতেরো ॥

সংকীর্তন শোভাযাত্রা সমুদ্রগড় পৌঁছল। ব্যাণ্ডেল-বারহারওয়া লাইনে নবদ্বীপ ধামের আগের স্টেশন সমুদ্রগড়। এখান থেকে নবদ্বীপ মাত্র পাঁচ মাইল। কিন্তু আমাদের কাছে নবদ্বীপ এখনও বহুদূর। আমরা যে গৌড়মণ্ডল পরিক্রমায় বেরিয়েছি।

স্টেশনের লেভেল ক্রসিং দিয়ে রেললাইন পার হলাম। এখন আমরা সমুদ্রগড় বাজারের ভেতর দিয়ে পথ চলেছি। পিচ বাঁধানো মোটর পথ। পথের দু পাশেই দোকান পাট। বহু লোকজন, সাইকেল রিক্সা ও ভ্যান। পথের পাশে খানদুয়েক মোটরগাড়িও দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমরা এখন গ্রামবাংলা থেকে শহরে চলে এসেছি বলা চলে।

প্রভুপাদের ইসারায় কীর্তন থেমে গেল। মাইক হাতে নিয়ে তিনি বললেন, "যারা চা কিংবা কিছু খেয়ে নিতে চাও, তারা এখানেই খেয়ে নাও। আমি সামনে ঐ পথের ধারে অপেক্ষা করব। আধঘণ্টার মধ্যে ওখানে চলে এসো সবাই। আরও অনেকটা পথ যেতে হবে আজ।"

ঠাকুরের সিংহাসন সহ কয়েকজনকে নিয়ে প্রভুপাদ এগিয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে সহযাত্রীরা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লেন। আমি কি করব বুঝতে পারছি না। সকাল থেকে কিছুই পেটে পড়ে নি। এমন কি চা পর্যন্ত নয়। কিন্তু মানসী কোথায় গেল? তাকে না পেলে যে কিছুই করতে পারছি না।

আমি তাকে খুঁজে না পেলেও সে কিন্তু আমাকে খুঁজে বের করল। কাছে এসে বলল, "কৃষ্ণা ও দত্তদা ডাকছেন, চলো চা খেয়ে নেবে।"

"শুধু চা কেন, সেই সঙ্গে কিছু খেয়ে নিলেও হ'তো। খিদে পেয়েছে।" আমি বলি।

সে উত্তর দেয়, "তা তো পাবেই, সকাল থেকে যে কিছুই খাও নি। তোমার তো আর আমাদের মতো উপোস করার অভ্যেস নেই।"

"তুমি কিছু খাবে না?"

"খেলে তুমি খুশি হবে?"

"নিশ্চয়ই।"

"তাহলে খাবো।"

মানসীর সঙ্গে একটা চা-জলখাবারের দোকানে এসে ঢুকি। ছোট দোকান, কিন্তু বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কৃষ্ণা দত্তবাবু ও কাশীনাথ সহ আমার কয়েকজন সহযাত্রী বেঞ্চিতে বসে আছে। আমরা তাদের পাশে এসে বসি।

গরম গরম লুচি তরকারী ও চা খেয়ে বেরিয়ে আসি দোকান থেকে। তারপরে পিচ্ বাঁধানো মোটর পথ ধরে এগিয়ে চলি। বাজার ছাড়িয়ে কয়েক পা এগিয়েই দেখতে পেলাম প্রভুপাদকে। পথের পাশে একটা মন্দিরের সামনে একফালি চত্বর। সেখানেই সিংহাসন রেখে কয়েকজন সহযাত্রীর সঙ্গে তিনি আমাদের প্রতীক্ষা করছেন। আমরা কাছে আসতেই বললেন, "তোমরা এসে গিয়েছো, ভালই হল। এবারে রওনা দেওয়া দরকার। অনেকটা পথ যেতে হবে।"

"ওরা কিন্তু অনেকেই অযথা বাজারে ঘোরাঘুরি করছে বাবা!" দত্তবাবু অভিযোগ করেন।

কাশীনাথ বলে, "ডেকে নিয়ে আসি?"

"না, তুই বোস্। গৌর ডাকতে গেছে। এখুনি এসে যাবে সবাই।"

প্রভুপাদ যাই বলুন, সবার আসতে কিন্তু আরও আধঘণ্টা লেগে গেল। তারপরে শুরু হল সংকীর্তন শোভাযাত্রা। মোটরপথ ধরে আমরা এখন উত্তরে চলেছি, বিদ্যানগরের দিকে। বাঁধানো পথ, সুতরাং পায়ে পাথরকুচি বিঁধছে। সাবধানে পা ফেলে এগোতে হচ্ছে।

"এত কহি' ঈশান সমুদ্রগড়ি হৈতে।
পরম আনন্দে চলে চম্পকহট্টেতে॥
শ্রীনিবাসে কহে এ চম্পকহট্ট গ্রাম।
চাঁপাহাটি নাম এ দিব্য রম্য স্থান॥ ··"

আমরাও তাই যাচ্ছি, সমুদ্রগড় থেকে চাঁপাহাটি চলেছি। কীর্তনীয়ারা ভক্তিরত্নাকর থেকে এই পথের ভ্রমণ বিবরণ গেয়ে চলেছেন।

ওঁরা কীর্তন করুন। আমি পথ চলতে চলতে কিছু গৌরকথা স্মরণ করে নিই।

জগাই-মাধাই ভক্ত হবার পরে নিমাইয়ের ভক্তসংখ্যা আরও তাড়াতাড়ি বাড়তে থাকল। অদ্বৈত নিত্যানন্দ হরিদাস শ্রীবাস শ্রীধর মুরারি মুকুন্দ দামোদর জগদানন্দ প্রভৃতি বিশিষ্ট ভক্তগণ বড়ই পুলকিত হয়ে উঠলেন। তাঁরা নিমাইয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে অনেক চিন্তা ভাবনার পরে মৃদঙ্গ বা খোল

তৈরি করে ফেললেন। বড় বড় করতালও তৈরি করা হল। খোল করতাল ও শিঙ্গার সহযোগে কীর্তন আরও জনপ্রিয় হয়ে উঠল। প্রায় প্রতিরাতে শ্রীবাস অঙ্গনে কিম্বা রাজপথে নিমাই সংকীর্তন করতে থাকলেন। আর সেই মহাসঙ্গীতকে কেন্দ্র করে ছোট-বড় ধনী-দরিদ্র ও পণ্ডিত-মূর্খের বিভেদ ঘুচে গেল। নবদ্বীপে সত্যিকারের সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। বিনা রক্তপাতে নিমাই এক সফল মহাবিপ্লব সংগঠিত করলেন। প্রেমের মাধ্যমে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হল। বোধকরি বিশ্বের প্রথম সাম্যবাদ।

বলা বাহুল্য ঈর্ষাকাতর শত্রুরা এ অবস্থাটিকে শান্ত চিত্তে মেনে নিতে পারল না। তারা মরণ-কামড় দিল। কীর্তন বন্ধ করার জন্য ছুটে গেল কাজীর কাছে।

কিন্তু সেকথা সেদিন কাজীর সমাধিতে বসে প্রভুপাদ আমাদের বলেছেন। সুতরাং কাজীকে দমন করার জন্য ইতিহাসের সেই প্রথম আইন-অমান্য আন্দোলনের কথা আর নয়। তার চেয়ে পরবর্তীকালের কথা স্মরণ করা যাক।

কাজী দমনের পরে নিমাইয়ের প্রভাব আরও বেড়ে গেল। ফলে হিন্দু মুসলমান ও বৌদ্ধধর্মের ছোট-বড় অনেকেই তত্ত্বকথা শোনার জন্য নিমাইয়ের কাছে আসতে আরম্ভ করলেন। তাঁরা নিমাইকে নানা জটিল প্রশ্ন করতেন। নিমাই মধুর কণ্ঠে অত্যন্ত সহজ ও সরলভাবে তাঁদের সব প্রশ্নের উত্তর দিতেন। তারপরে বলতেন—শ্রীভগবানের শরণাগত হয়ে সরল প্রাণে ভক্তিভরে তাঁকে ডাকা ও তাঁর নামকীর্তন করাই তাঁকে পাবার সহজ পথ।

তাঁর উপদেশে বহু মানুষের জীবনপথ পালটে গেল। ফলে তাঁর প্রচারিত ধর্মে ছোট বড় সবাই নিজেদের বিভেদ বিস্মৃত হয়ে একসঙ্গে দাঁড়িয়ে নৃত্যগীত করতে আরম্ভ করলেন। তাঁরা নিজেদের পদমর্যাদা ভুলে পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করতে থাকলেন। হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানের, ধনীর সঙ্গে দরিদ্রের অথবা পণ্ডিতের সঙ্গে মূর্খের আর কোনো পার্থক্য রইল না। সবাই এক হয়ে গেলেন।

কেনই বা হবেন না? নিমাই যে তাঁদের বলেছেন—ভগবদ্‌ভক্ত চণ্ডাল ভগবদ্‌বিমুখ ব্রাহ্মণের চেয়ে বড়। ভক্তকবির ভাষায়—

'মুচি যদি ভক্তি করি ডাকে কৃষ্ণ করে।
কোটি নমস্কার করি তাহার চরণে॥'

বেলা সওয়া বারোটার সময় আমরা চাঁপাহাটি পৌঁছলাম। বেশ বড় এবং

উন্নত গ্রাম। বাসপথের দু পাশেই বাড়িঘর। আছে কিছু পাকাবাড়ি আছে বাজার আর গৌরগদাধর মঠ।

কেবল ভক্তিরত্নাকর নয়, বিভিন্ন বৈষ্ণবগ্রন্থে চম্পকহট্ট মানে চাঁপাহাটির উল্লেখ রয়েছে। কথিত আছে এখানকার জনৈক ব্যাধ স্বপ্ন দেখেছিলেন যে একদিন গৌর এখানে প্রকট হবেন। ভক্তিরত্নাকরে বলা হয়েছে, এখানে চম্পক বা চাঁপাগাছের বন ছিল। মালিরা সেই চাঁপাফুল তুলে হাটে বিক্রি করতে বসত। সজ্জন ব্রাহ্মণগণ ফুল কিনে দেবার্চনা করতেন। তাই জায়গাটার নাম হয়েছে চম্পকহট্ট তথা চাঁপাহাটি।

গৌরগদাধর মঠ পেরিয়ে কয়েক পা এগিয়েই বাসপথ ছেড়ে দিতে হল ধূলিময় মাটির পথ ধরে সংকীর্তন শোভাযাত্রা চলল এগিয়ে। আমাদের খালি পা। হাঁটতে ভালই লাগছে, তবে বড্ড ধুলো উড়ছে।

অথচ আমরা আর নদীয়ায় নেই, বর্ধমানে এসেছি। জেলা ভিন্ন হলেও পথ অভিন্ন। মানে নদীয়া জেলার গ্রাম্যপথের সঙ্গে বর্ধমান জেলার গ্রাম্যপথের কোনো পার্থক্য নেই। গত কয়েকদিন ধরে যেমন নাকে-মুখে ধুলো ঢুকেছে, আজও তেমনি ঢুকছে। সুতরাং জেলা পরিবর্তনে পথের পরিবর্তন হয় নি।

পরিবর্তন হয় নি মানুষের। নদীয়ার পথে আমরা যেমন সর্বত্র সাদর অভিনন্দন লাভ করেছি, বর্ধমানের পথেও তার অভাব হচ্ছে না। তেমনি দলে দলে নারী-পুরুষ পথের পাশে দাঁড়িয়ে আমাদের অভিনন্দিত করছেন।

কীর্তনীয়ারা একইভাবে ভক্তিরত্নাকর থেকে গেয়ে চলেছেন—

"এথা গৌরাঙ্গের অতি অদ্ভুত বিহার॥
এথা ছয় ঋতু—বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত।
শিশির, বসন্ত, গ্রীষ্ম স'বে মূর্তিমন্ত॥
কোহো কারু প্রতি কহে মধুর ভাষায়।'
—'হইব প্রকট কৃষ্ণচন্দ্র নদীয়ায়॥'

আমরা ঋতুদ্বীপ অর্থাৎ বিদ্যানগর এলাকায় এসে গিয়েছি। কথিত আছে ঋতুগণ এখানে বসে গৌর আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন বলেই এ জায়গাটির নাম হয়েছে ঋতুদ্বীপ। বিদ্যানগর ঋতুদ্বীপের অন্তর্গত।

বেলা সওয়া একটার সময় অর্থাৎ সাতকুলিয়া থেকে রওনা হবার দু'ঘণ্টা পরে আমরা বিদ্যানগরে পৌঁছলাম। কীর্তনীয়ারা গান ধরেছেন—

'দেখ বিদ্যানগর পরম সুশোভিত।
বিদ্যানগর ব্যাখ্যা যৈছে কহিয়ে কিঞ্চিৎ॥'

একদিন দেবসভায় দেবগুরু বৃহস্পতিকে উদ্বিগ্ন দেখে দেবগণ কারণ জিজ্ঞেস করলেন।

বৃহস্পতি উত্তর দিলেন—কলিযুগে নদীয়া নগরে জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে প্রভু গৌরচন্দ্র জন্মগ্রহণ করবেন। রাম অবতারে তিনি ছিলেন অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী, কৃষ্ণ অবতারে তিনি রাজনীতিতে অগ্রগণ্য আর গৌর অবতারে তিনি অধ্যয়নে অদ্বিতীয় হবেন।

তারপরে প্রভুকে প্রকট করার জন্য বৃহস্পতি এখানে অবতীর্ণ হলেন। তিনি আরাধনা করে গৌর আবির্ভাবকে প্রশস্ত করে তুললেন।

কীর্তনীয়ারা এখন সেই কথা কীর্তন করছেন—

'ওহে শ্রীনিবাস, এই বিদ্যানগরে।
বৃহস্পতি আরাধয়ে শ্রীগৌরসুন্দরে॥...'

তাঁরা গেয়ে চলেছেন—

"প্রভু ক্রীড়া-লাগি' এথা বিদ্যা প্রচারিল।
এই হেতু শ্রীবিদ্যানগর নাম হইল॥"

ভক্তিরত্নাকরের মতে মহাপ্রভুর বিদ্যা-প্রচারস্থল বলে এ জায়গাটির নাম বিদ্যানগর। এই পুণ্যস্থান দর্শন করলে অবিদ্যার বিনাশ হয়।

আমাদের হবে কিনা জানি না। তবে আমরা এখন বিদ্যানগর পৌঁছে গিয়েছি। অর্থাৎ কোলদ্বীপ থেকে ঋতুদ্বীপে এসে গেলাম।

শ্রীল নরহরি চক্রবর্তী ঠাকুর ভক্তিরত্নাকরে বিদ্যানগর নামকরণের যে কারণই বলে থাকুন, কারণ কিন্তু আরও একটি রয়েছে। নবদ্বীপ থেকে নিমাই এখানে বিদ্যাশিক্ষা করতে আসতেন। মহাপ্রভুর বিদ্যালাভের স্থানটির নাম বিদ্যানগর হতেই পারে। আর আমরা প্রথমেই সেই পুণ্যস্থলে এলাম—এলাম মহাপ্রভুর টোলে।

পথের পাশে অনেকখানি জায়গা নিয়ে মন্দির ও বাগান। আমরা মন্দিরে আসি। নিতাই গৌরের নৃত্যরত দণ্ডায়মান বিগ্রহ। দর্শন করি। গৌর-নিতাইকে দণ্ডবৎ করে বলি—অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে এই হতভাগ্য দেশকে মুক্ত করার যে সাধনা তোমরা শুরু করেছিলে, তা আজও সফল হয় নি। তোমরা আশীর্বাদ করো, আগামী বংশধরগণ যেন তোমাদের স্বপ্ন সফল করে তুলতে পারে।

প্রণাম শেষে নেমে আসি মন্দির থেকে। মানসী বলে, "এখানে নিশ্চয়ই একটু বিশ্রাম করা যাবে।"

আমি মাথা নাড়ি। সে বলে, "চলো আমরা ঐ গাছতলায় গিয়ে একটু বসি। জায়গাটা ভারী সুন্দর।"

মন্দিরের সামনে প্রশস্ত অঙ্গন। আঙ্গিনার মাঝখানে একটি সুন্দর দোলমঞ্চ; বাঁদিকে সেবাইতের বাসগৃহ আর ডানদিকে বাগান—ফুল ও ফলের গাছ। যে গাছটি মানসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, সেটি একেবারে শেষে—সীমানার ধারে। আমরা সেখানেই আসি।

সহযাত্রীরা অনেকেই এসে গেছেন, যাঁরা এখনও এসে পৌঁছন নি, তাঁরাও আসবেন। কারণ মন্দির নয়, এই গাছটাই এখানকার প্রধান আকর্ষণ। গাছটির গোড়া বাঁধানো—অনেকখানি জায়গা জুড়ে।

কাশীনাথ বলে, "দেখে মনে হচ্ছে তিনটি গোড়া তিনটি গাছ। কিন্তু লক্ষ্য করে দেখুন, তিনটে নয়, একটাই গাছ। বটগাছের মতো ঝুরি নেমে তিনটি গোড়া হয়েছে।"

"কিন্তু এটা তো বটগাছ নয়!" মানসী বলে।

"না, না, বটগাছ হবে কেন?" কাশীনাথ উত্তর দেয়, "এটা যে কি গাছ, তা কেউ বলতে পারেন না। কথিত আছে, মহাপ্রভু যখন এই টোলে পড়তেন, তখন একদিন তিনি তাঁর খাগের কলমটি এখানে পুতে দিয়েছিলেন, তা থেকে এই গাছ।"

গাছটি শুধু বিচিত্র নয়, ভারী সুন্দর। বিস্তীর্ণ এলাকাকে ছায়াশীতল করে রেখেছে। গোড়া বাঁধানো সিমেন্টের বেদিটাও প্রকাণ্ড। বহুলোক বসতে পারে। বসেছেনও অনেকে। সেই সমুদ্রগড়ের পরে আর কেউ বসতে পারেন নি।

বসেছে আমাদের দাদারাও। ওরা তিনভাই মূল-গাছের গোড়ায় দিব্যি পাশাপাশি বসেছে। ভারী সুন্দর লাগছে দেখতে।

দৃশ্যটা মানসীরও দৃষ্টি এড়ায় না। কিন্তু সে আমার মতো নীরব থাকে না। সোজাসুজি প্রভুপাদকে বলে বসে, "বাবা ওদের একটা ছবি নিন না!"

প্রভুপাদ মানসীর কথা রাখেন। ছবি নেবার পরে ছোড়দা বলে, "ঘোষদা, একটু ব'সো। এখানে এলে এই গাছের গোড়ায় বসতে হয় একবার।"

তাড়াতাড়ি বসে পড়ি। বসে বসে ওদের কথাই ভাবতে থাকি, ওদের তিন ভাইয়ের কথা। কিই বা বয়স! বড়দারই বোধকরি বছর বারো হবে। কিন্তু ক'দিন ধরে কি কষ্টটাই না করছে। অথচ মুখে সর্বদা হাসিটুকু লেগে আছে। তা তো হবেই, ওরা যে নিত্যানন্দের বংশধর। কলসির কানায়

মাথা ফেটে যাবার পরেও যিনি মাধাইকে বুকে জড়িয়ে ধরে গেয়ে উঠেছিলেন—'মেরেছ বেশ করেছ, হরি বলে নাচ ভাই॥' বংশকৌলীন্য বলে যে কথাটি সমাজে প্রচলিত আছে, তা যে মিথ্যে নয়, তার একটা বাস্তব প্রমাণ পেয়ে গেলাম গৌড়পরিক্রমায় এসে।

দর্শন ও বিশ্রামের পরে আবার শুরু হ'ল সংকীর্তন শোভাযাত্রা। কীর্তনীয়ারা সেই একই কীর্তন ধরেছেন—'দেখ বিদ্যানগর পরম সুশোভিত।'

বৃদ্ধ ঈশান যখন শ্রীনিবাসাচার্য ও তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে গৌড়মণ্ডল পরিক্রমা করেছিলেন, তখন বিদ্যানগর কতখানি সুশোভিত ছিল, জানা নেই আমার। কিন্তু আজকের বিদ্যানগর সত্যই সুশোভিত। পিচ বাঁধানো পথ। পথের ধারে সারি সারি গাছ আর ছোট বড় সুদৃশ্য বাড়ি-ঘর। অধিকাংশ বাড়ির সামনে সবজি ক্ষেত কিংবা ফুলের বাগান। এ যাত্রায় আমরা আর এমন সুন্দর জায়গা দেখি নি।

পথের বাঁদিকে বেশ বড় একটা খেলার মাঠ, তারপরেই সুবিশাল অট্টালিকা নবদ্বীপ ছাড়ার পরে আমরা আর এতবড় বাড়ি দেখি নি।

বড়দা বলে, "এটাই বিদ্যানগর স্কুল।"

মেজদা যোগ করে "মাল্‌টি পারপাস স্কুল। হস্টেল পর্যন্ত রয়েছে।"

ছোড়দা জানায়, "আজ আমরা এই স্কুলে থাকব ঘোষদা!"

ভাবতে ভাল লাগছে, শ্রীচৈতন্যদেবের বিদ্যাতীর্থ বিদ্যানগর আজও গৌড়মণ্ডলে বিদ্যা বিতরণ করে চলেছে। যাঁরা এই পুণ্যতীর্থকে বিদ্যাপীঠে পরিণত করেছেন, তাঁদের সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাই।

ভেবে ছোড়দার মতই আনন্দিত হচ্ছি, আজ আমরা এই চমৎকার স্কুলবাড়িতে রাত কাটাতে পারব। শুধু তাই নয়, আজ রাতে আমরা আবার সবাই একবাড়িতে বাস করতে পারব।

কার যেন একটা সাইকেল নিয়ে কানু সমুদ্রগড় থেকে সোজা এখানে চলে এসেছিল। বলা বাহুল্য আমাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা পাকা করার জন্যই সে আগে চলে এসেছে। ভরসা করি ইতিমধ্যে সে সব ব্যবস্থা করে ফেলেছে। এখন সে স্কুলের সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের স্বাগত জানাচ্ছে।

অগ্রবর্তী শোভাযাত্রীদের নিয়ে কানু এগিয়ে চলেছে। কিন্তু স্কুলে না ঢুকে কোথায় চলেছে সে!

স্কুলের পেছনেও অনেকখানি ফাঁকা জায়গা। সেখানে রয়েছে কয়েকটি গাছ ও একটা টিউব্‌ওয়েল। রয়েছে ছোট একটা স্কুলঘর। তারই সামনে

আমাদের রান্না চড়েছে। আমাদের গরুর গাড়িগুলিও দাঁড়িয়ে আছে। সেখানেই শেষ হল শোভাযাত্রা।

বুঝতে পারছি না ব্যাপারটা। এখানে কেন? বোধকরি এখানে রান্না-খাওয়া আর স্কুল বাড়িতে শোবার ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু কানু মহিলাদের ওকথা বলছে কেন? বলছে, "এই প্রাইমারী স্কুলটা আমরা পেয়েছি। বারান্দায় ঠাকুর থাকবেন। ভেতরে দুখানি ঘর আছে। আপনাদের সবাইকে জায়গা করে নিতে হবে।"

ব্যস, জায়গা দখলের জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে গেল।

কানু প্রভুপাদের কাছে আসে। বলে, "আজ হেড্‌মাষ্টার মশায়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে বাবা, তিনি এখনও স্কুলেই আছেন। তাঁকে বললাম, কিন্তু তিনি বড় স্কুল দিতে রাজী হলেন না। এই প্রাইমারী স্কুলেই ম্যানেজ করে নিতে বললেন।"

হায় গৌর! এতক্ষণ বৃথাই কল্পনার জাল বুনেছি। আমাদের ঐ অট্টালিকায় প্রবেশের অধিকার নেই।

এমন একটা দুঃসংবাদ পেয়েও কিন্তু প্রভুপাদ অবিচলিত। তিনি শান্ত স্বরে কানুকে বলেন, "রাতের কথা পরে ভাবা যাবে, এখন তাড়াতাড়ি প্রসাদের ব্যবস্থা কর। আজ সবাই ক্লান্ত এবং খুবই ক্ষুধার্ত।"

"প্রায় হয়ে এসেছে বাবা।" গৌরদা ভরসা দেন।

প্রভুপাদ আমাকে বলেন, "চলো, আমরা ওখানে গিয়ে বসি।"

তাকিয়ে দেখি সত্যই তো! ভারী সুন্দর একটি আশ্রয় রয়েছে। মাঠের প্রান্তে একটা পাকাবাড়ি, তারই বেশ চওড়া বারান্দা। মনে হচ্ছে না ওখানে বসলে কেউ আপত্তি করবে।

আমরা এসে বসি। শুধু আমি আর প্রভুপাদ নই। দত্তবাবু, রসময়দা, জীবনদাদু, অমলদাও সঙ্গে আসেন। আসে কৃষ্ণা ও মানসী আর দাদাদের নিয়ে মতি।

প্রভুপাদ বলেন, একটু বিশ্রাম করে টিউব ওয়েল থেকে হাত-মুখ ধুয়ে নাও। যারা স্নান করতে চাও, তারা তাড়াতাড়ি সেরে এসো। প্রসাদ হয়ে এলো বলে।"

প্রসাদ পেতে তিনটে বেজে গেল। প্রসাদের পরে আমরা আবার সেই বারান্দায় আসি। কার বাড়ি জানি না। তবে এখনও কেউ আমাদের অনধিকারের প্রতিবাদ করেন নি। না করলেই ভাল। অন্তত এই খোলা বারান্দায় রাতটুকু কাটানো যাবে।

দুটি ছেলে এসে হাজির হয়। তাদের হাতে দুখানি খাতা। বোধকরি এই স্কুলেরই ছাত্র, হয়তো ওপরের দিকেই পড়ে। তারা খাতা দুখানি প্রভুপাদের দিকে এগিয়ে ধরে সবিনয়ে বলে, "একটা অটোগ্রাফ্ দেবেন ?"

"অটোগ্রাফ্ !" প্রভুপাদ বলে ওঠেন। তিনি একবার আমার দিকে তাকান। তারপরে আবার বলেন, "বেশ দাও।"

সই করতে করতে প্রভুপাদ প্রশ্ন করেন, "তোমরা বুঝি এই স্কুলে পড়ো ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আমরা হস্টেলেই থাকি।"

সই করে প্রভুপাদ খাতা দুখানি ফিরিয়ে দেন। ছেলে দুটি চলে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ায়।

প্রভুপাদ আমাকে দেখিয়ে সহসা তাদের জিজ্ঞেস করেন, "তোমরা একে চেনো ?"

ছেলে দুটি আমার দিকে তাকায়। তারা অপ্রস্তুত আর আমি রীতিমত নার্ভাস। প্রভুপাদ কি বলবেন বুঝতে পারছি না। তিনি কি আমার পরিচয় প্রকাশ করে দেবেন ? কিন্তু এমন তো কথা ছিল না।

ছেলে দুটিকে নীরব দেখে প্রভুপাদ আবার বলেন, "তোমরা লেখক শঙ্কু মহারাজের নাম শুনেছো ?"

"হাঁ, শুনেছি বৈকি ! আমরা তাঁর বই পড়েছি।"

"ইনিই শঙ্কু মহারাজ। তোমরা ইচ্ছে করলে এরও অটোগ্রাফ নিতে পারো।"

"নিশ্চয়ই নেবো।" ছেলে দুটি আমার কাছে এগিয়ে এসে খাতা খুলে দেয়।

আমি নিঃশব্দে সই করি। আর মনে মনে ভাবি প্রভুপাদ এমন কাণ্ড করলেন কেন ? এখন পর্যন্ত অবশ্য কোনো গোলমাল হয় নি। কারণ এখানে যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা সকলেই আমার প্রকৃত পরিচয় জানেন। বিপদে পড়ব একটু বাদেই, অন্যান্য সহযাত্রীরা জানার পরেই।

ছেলে দুটি খাতা হাতে নেয়। প্রভুপাদ বলেন, "তোমাদের কিন্তু একটা কাজ করতে হবে।"

"বেশ বলুন !"

"তোমরা গিয়ে হেডমাস্টার মশায়কে ব'লো, এই পরিক্রমার সঙ্গে শঙ্কু মহারাজ এখানে এসেছেন। তিনি একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান।"

"আমরা এখুনি যাচ্ছি।" ছেলে দুটি প্রায় দৌড়ে চলে যায়।

মানসী থেকে দাদারা পর্যন্ত উপস্থিত সকলেই প্রভুপাদের কথায় অবাক

হয়েছে, আমি তো বটেই। তবে কেউ যেমন কোনো কথা বলছে না, তেমনি আমিও চুপ করে থাকি।

নীরব কিছুক্ষণ। তার পর প্রভুপাদ আমাকে বলেন, "ঘোষবাবা, এতদিন আমি তোমার কথা রেখেছি। আমার কয়েকজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ও শিষ্য ছাড়া আর কারও কাছে তোমার পরিচয় প্রকাশ করি নি। কিন্তু পরিক্রমার প্রয়োজনে আজ আমাকে তোমার নামটি ভাঙাতে হচ্ছে।"

তিনি একটু হাসেন। কিন্তু আমি তাঁর কথা ঠিক বুঝতে পারছি না। তাই তেমনি নীরবে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকি। তিনি আবার বলেন, "তাছাড়া আগামীকালই পরিক্রমা শেষ হবে। একদিনে তোমার সহযাত্রীরা তোমাকে আর কতই বা প্রশ্ন করবে?"

তাড়াতাড়ি বলে ফেলি, "আমার অশেষ সৌভাগ্য বাবা, আপনি আমার অনুরোধে এই পরিক্রমার আয়োজন করেছেন। সহযাত্রীরা সবাই আমাকে ভালোবাসেন। শুধু ভয়, আমার লেখক পরিচয় পেয়ে তাঁরা আমাকে যদি আর আগের মতো আপন করে নিতে দ্বিধা করেন। তাহলেও আপনি যখন বলছেন পরিক্রমার প্রয়োজনে আপনি আমার পরিচয় প্রকাশ করছেন, তখন আমি সানন্দে আপনার নির্দেশ মাথা পেতে নিলাম।"

"বাবা!" মানসী হঠাৎ কথা বলে ওঠে, "আপনাদের দুজনের বৈষ্ণব বিনয়ে বিভ্রান্ত আমরা। এবারে আসল ব্যাপারটা জানতে পারলে কৌতূহলের নিরসন হয়।"

তার কথায় সবাই হেসে ওঠে, প্রভুপাদও বাদ যান না। হাসতে হাসতে তিনি বলেন, "বলব মা, তোমাদের জন্যই যে ঘোষবাবাকে বলতে হবে ব্যাপারটা।" একবার থামেন তিনি। তারপরে আমার দিকে ফিরে বলতে থাকেন, "হ্যাঁ, বাবা, পরিক্রমার প্রয়োজনেই আমি তোমার পরিচয় প্রকাশ করছি। কারণ তোমার সহযাত্রীরা গত পাঁচরাত অশেষ কষ্টে কাটিয়েছে। এখানে এতবড় এতভাল স্কুলবাড়ি থাকা সত্ত্বেও আজ যদি তাদের গাছতলায় রাত কাটাতে হয়, তবে বড়ই দুঃখের কথা হবে।"

"বেশ বলুন, আমাকে কি করতে হবে?"

"এই স্কুলের হেড্‌মাষ্টার মশায় পরেশবাবু, শ্রীপরেশ চন্দ্র গোস্বামী একজন সুশিক্ষিত ও কর্মঠ মানুষ। একসময় তিনি এম. এল. এ. ছিলেন। তাঁরই ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে এই স্কুল এতবড় হয়েছে, বিদ্যানগরের এত উন্নতি হয়েছে। তিনি গুণীলোক। আমার বিশ্বাস, তুমি আমাদের সঙ্গে আছো শুনলে

তিনি খুশি হবেন। তোমার অনুরোধ তিনি ফেলতে পারবেন না। আমরা স্কুলবাড়িতে রাতের আশ্রয় পাবো।"

"আমি সাধ্যমত চেষ্টা করব বাবা!"

"তাহলেই হবে।"

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় না। একটু বাদেই ছুটতে ছুটতে ছেলে দুটি ফিরে আসে। হাঁফাতে হাঁফাতে বলে, "হেড্‌স্যার্ আপনাকে ডাকছেন স্যার।"

প্রভুপাদ মৃদু হাসেন। জিজ্ঞেস করি, "আমি একাই যবো?"

"না, না, একা যাবে কেন? কাউকে সঙ্গে নিয়ে যাও।" একবার থামেন প্রভুপাদ। তারপরে আবার বলেন, "অমলদা একটু যান না ঘোষবাবার সঙ্গে।"

"বেশ যাচ্ছি।" অমলদা উঠে দাঁড়ান।"

ছেলেদুটির সঙ্গে আমরা স্কুলের দোতলায় উঠে আসি। হেড্‌মাষ্টার মশায় তাঁর অফিসঘরে বসে কাজ করছিলেন। আমাদের ঢুকতে দেখে সহাস্যে বলে ওঠেন, "আসুন, আসুন, কি সৌভাগ্য আমাদের।"

আমরা এসে বসি। অমলদা আমার পরিচয় দেন, আমিও অমলদার পরিচয় দিই।

হেডমাষ্টার মশাই বেল বাজান। বেয়ারা ঘরে ঢোকে। তিনি বলেন, "আরও কয়েকখানা চেয়ার দাও এঘরে আর মাষ্টারমশায়দের আসতে বলো। একটু চায়ের ব্যবস্থাও ক'রো।"

বেয়ারা চলে যাবার পরে তিনি আবার বলেন, "সত্যি আমার বড় আনন্দ হচ্ছে। এই স্কুলটি হচ্ছে আমার জীবনের সর্বস্ব। আজ আপনার মতো একজন সাহিত্যিক আমার স্কুলে এলেন।"

আমি 'সাহিত্যিক' কথাটায় প্রতিবাধ করি। সবিনয়ে বোঝাবার চেষ্টা করি, আমি সাহিত্যিক নই, একজন নগণ্য লেখকমাত্র। কিন্তু তাতে তেমন একটা ফল হয় না।

একটু বাদেই মাষ্টারমশায়রা আসেন, তারপরে চা আসে। গল্প-গুজবের মধ্য দিয়ে বেশ খানিকটা সময় চলে যায়। আমি এই পরিক্রমা নিয়ে বই লিখব শুনে সবাই খুশি হন।

অবশেষে পরেশবাবু জিজ্ঞেস করেন, "বলুন, আমরা কিভাবে আপনাদের সাহায্য করতে পারি।"

উত্তর দিই, "গত পাঁচরাত আমার সহযাত্রীরা বড়ই শীতে কষ্ট পেয়েছেন। আজ যদি আপনার এই স্কুলবাড়িতে আমরা একটু রাতের আশ্রয় পেতাম,

তাহলে খুবই ভাল হ'ত।"

"এ আর একটা এমন কথা কি ?" তিনি মাষ্টারমশায়দের দিকে তাকান। তাঁরা মাথা নাড়েন।

পরেশবাবু কেয়ারটেকার মাষ্টারমশায়কে বলেন, "এঁরা তো কাল সকালেই চলে যাবেন, স্কুলের কোনো অসুবিধে হবে না। আপনি এঁদের থাকার ব্যবস্থা করে দিন।" তারপরে আমাকে বলেন, "একটা কথা কিন্তু বলব আপনাকে।"

"বেশ বলুন।" আমি মাথা নাড়ি।

পরেশবাবু বলেন, "আপনাদের একটি ছেলে কিছুক্ষণ আগে আমার সঙ্গে দেখা করেছিল। আমি তাকে এবাড়ি দিতে রাজী হই নি। অথচ আমি নবদ্বীপের মানুষ। প্রভুপাদ শ্রীমদনগোপালকে আমি ছোটবেলা থেকেই জানি। তবু আমি রাজী হই নি কারণ পরিক্রমার মানুষদের আশ্রয় দিলে, তাঁরা বাড়ি-ঘর বড্ড নোংরা করে যান। এখানে বাথরুম পায়খানা টিউবওয়েল— সবই আছে। সবাইকে বলে দেবেন, যেন একটু পরিষ্কার মতো ব্যবহার করেন।"

আমি তাঁকে কথা দিই। তারপরে সবাইকে প্রভুপাদের পাঠ ও কীর্তন শোনার জন্য আমন্ত্রণ জানাই।

পরেশবাবু বলেন, "যাঁরা এখানে থাকেন তাঁরা সবাই প্রভুপাদের পাঠ-কীর্তন শুনবেন। আমি নবদ্বীপে থাকি। বাড়ি ফিরতে হবে। বেশি রাত করতে পারব না। তাহলেও কিছুক্ষণ শুনব বৈকি, নিশ্চয়ই শুনব।"

সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে আমরা বিদায় নিই। কেয়ারটেকার মাষ্টারমশায় আমাদের ঘর দেখিয়ে দেন। পার্টিশান ও বেঞ্চি সরিয়ে দোতলার একখানি ও একতলার দু'খানি ঘর আমাদের জন্য নির্দিষ্ট হয়। তিনখানাই প্রকাণ্ড ঘর। নিচের তলায় বিরাট বাঁধানো চত্বর, রয়েছে দুদিকে চওড়া বারান্দা। এখানেই পাঠের আসর বসবে।

সুসংবাদ নিয়ে ফিরে আসি প্রভুপাদের কাছে। সহযাত্রীরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠেন।

ঠাকুরের সিংহাসন আসে। সতরঞ্চি পাতা হয়। চন্দ্রা স্কুলের ছাদে ও বাইরে সাউন্ বক্স লাগায়। দত্তবাবু ঘোষণা শুরু করেন।

সন্ধ্যার আগেই সহযাত্রীরা গুছিয়ে বসেন। গ্রামবাসীরাও পাঠের আসরে আসতে আরম্ভ করেন। আজ আর সামিয়ানা টাঙানো অথবা পেট্রোম্যাক্স জ্বালাবার দরকার হচ্ছে না। স্কুলে ইলেকট্রিক আলো আছে এবং নিতাই-

গৌরের কৃপায় এখন পর্যন্ত লোড্ শেডিং হয় নি।

মাষ্টারমশায়দের নিয়ে পরেশবাবু নেমে আসেন। প্রভুপাদ সন্ধ্যারতি শুরু করেন। আরতির পরে শুরু হয় পাঠ।

প্রথমেই প্রভুপাদ পরিক্রমার পক্ষ থেকে হেডমাষ্টার মশায় ও তাঁর সতীর্থদের ধন্যবাদ জানান। তারপরে বলতে শুরু করেন—

'ভক্তবৃন্দ, আজ আমাদের গৌড়মণ্ডল পরিক্রমার শেষ সন্ধ্যা। এই পরিক্রমার প্রথম সন্ধ্যায় আমি নিদয়ায় বসে বলেছিলাম, শ্রীমন্মহাপ্রভুর মর্ত্যলীলা মাত্র আটচল্লিশ বছর স্থায়ী হলেও, তাঁর কর্মময় মহাজীবন মহাসিন্ধুর মতই সীমাহীন। সুতরাং এই পরিক্রমাকালে তাঁর সমগ্র জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়াও সম্ভব নয়। আমি শুধু নবদ্বীপ-লীলা সম্পর্কে সামান্য কিছু বলে কলির ভগবানের একটি মোটামুটি পরিচয় প্রদান করব। সেই লীলা-কাহিনীর শেষ অধ্যায় অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গের বৈরাগ্য ও সন্ন্যাস আমার আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু।"

একবার থামেন প্রভুপাদ, তারপরে একটু ঠিক হয়ে বসে নিয়ে আবার আরম্ভ করেন, "ভক্তবৃন্দ, শুধু নবদ্বীপে নয়, সারা গৌড়মণ্ডলেই তখন হরিনামের প্লাবন শুরু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু নিমাইয়ের মনে একটা দ্বন্দ্ব দেখা দিল। তিনি দেখতে পেলেন, তাঁর কাছে এসে যাঁরা হরিনাম করেন, তাঁদের অনেকেরই কাম-কাঞ্চনে আসক্তি কমছে না। তাঁরা তাঁর সঙ্গে কীর্তন করেন, মাঝে মাঝে মাটিতে গড়াগড়ি যান কিন্তু ঘরে ফিরে সেই ভোগ আর রসনায় জড়িয়ে পড়েন। অর্থাৎ তাঁর অধিকাংশ ভক্তই তাঁর ধর্মের মূলকথা ত্যাগ ও প্রেম সম্পর্কে সচেতন নন।

নিমাই তখন তাঁর ভক্তদের বৈরাগ্য শিক্ষা দেবার উপায় খুঁজতে আরম্ভ করলেন। আর তখুনি তাঁর খেয়াল হল, তিনি নিজেও তো কাম-কাঞ্চনের প্রভাব মুক্ত নন! তিনি ভাবলেন—আমি রূপবান ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। ঘরে আমার রূপসী স্ত্রী, ভক্তরা সর্বদা সেবা করছে আমাকে। তারা নিশ্চয়ই ভাবছে, হরিনাম করলেই তারা আমার মতো হতে পারবে। আর তাই তারা হরিনাম করতে করতে ভোগের কথা চিন্তা করছে।

এইসব ভেবে নিমাইয়ের নৃত্যগীতে অনুরাগ কমে গেল, তিনি ক্রমেই মনমরা হয়ে পড়তে থাকলেন। শচী ছেলের অবস্থা দেখে উদ্বিগ্ন হলেন, বিষ্ণুপ্রিয়া স্বামীকে দেখে ব্যথিতা হলেন। সবাই নিমাইকে আবার আনন্দময় করে তোলার চেষ্টা করতে থাকলেন।

কিন্তু সে চেষ্টা সফল হল না। অনেক ভেবে-চিন্তে নিমাই স্থির করলেন, কাম-কাঞ্চনের সঙ্গে তিনি সকল সংস্রব ঘুচিয়ে ফেলবেন, তিনি দাদার মতো সন্ন্যাস গ্রহণ করবেন। ভক্তরা অস্থির হবেন, মা কষ্ট পাবেন, বিষ্ণুপ্রিয়া দুঃখ পাবেন। কিন্তু উপায় নেই। সমাজের জন্য, দেশের জন্য, জগতের জন্য তাঁকে সন্ন্যাসী হতেই হবে। তিনি মুণ্ডিত মস্তকে গেরুয়া ধারণ করে নগরে নগরে দেশে দেশে হরিনাম প্রচার করবেন। লোকশিক্ষার মাধ্যমে জীব-উদ্ধারের অন্য কোনো উপায় নেই। ভক্তকবির ভাষায়—

'দয়াল চৈতন্য এতে তুষ্ট না হইয়া।
বলে, জীবে শিক্ষা দিব সন্ন্যাস করিয়া॥
দন্তে তৃণ করিয়া ফিরিব সর্বগ্রাম।
সর্বজীবে উদ্ধারিব দিয়া হরিনাম॥'

এই সময় কেশব ভারতী নামে একজন তত্ত্বজ্ঞানী সন্ন্যাসী কাটোয়ায় বাস করতেন। তিনি একবার নবদ্বীপে এলেন। নিমাইয়ের হরিনাম প্রচারের কথা শুনে কেশব তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন।

নিমাই তাঁকে আদর-যত্ন করে ঘরে এনে বসালেন। শচীদেবী ও বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁর রান্নার যোগাড় করে দিলেন।

আহারের পরে সন্ন্যাসী যখন বিশ্রাম নিচ্ছেন, নিমাই তখন এসে তাঁর কাছে বসলেন। কথায় কথায় তিনি কেশবের কাছে নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানালেন। কেশব বললেন—তুমি তোমার মা এবং স্ত্রীর একমাত্র অবলম্বন। কাজেই তাঁদের অনুমতি ছাড়া তোমার পক্ষে সন্ন্যাস গ্রহণ অবৈধ।

সন্ন্যাসীর কথা শুনেও নিমাই কিন্তু তাঁর মত পরিবর্তন করলেন না। কয়েকদিন পরে একদিন কথায় কথায় মায়ের কাছে নিজের ইচ্ছার কথা জানালেন।

মা চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন। তিনি বারবার তাঁকে এই ইচ্ছা ত্যাগ করতে বললেন।

মায়ের অবস্থা দেখে নিমাই খুবই কষ্ট পেলেন। তবু তিনি নিজের সিদ্ধান্তে অবিচলিত রইলেন।

কয়েকদিন কান্নাকাটি করে শচী শান্ত হলেন। তখন তাঁর মনে অন্য দুশ্চিন্তা দেখা দিল। তিনি ভাবলেন—নিমাই একবার যখন ঠিক করেছে সন্ন্যাস নেবে, তখন তাকে কিছুতেই বিরত করা যাবে না। বরং সে বড় ছেলের মতো পালিয়ে না গিয়ে তাঁর অনুমতি চাইছে। সুতরাং বাধা দিয়ে

অযথা ওর কষ্ট বাড়িয়ে কি লাভ? বরং তাতে নিমাইয়ের প্রাণ সংশয় হবে।

তাই শচী নিজের দুঃখের কথা ভুলে নিমাইকে অনুমতি দিলেন। নিমাই মাকে প্রণাম করলেন।

বিষ্ণুপ্রিয়া তখনো কিশোরী, চোদ্দ বছরের মেয়ে। তিনি কয়েকদিনের জন্য বাপের বাড়ি গিয়েছিলেন। সেখানে বসেই কথাটা তাঁর কানে এলো। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ছুটে এলেন শ্বশুরবাড়িতে। শচীর মুখের দিকে তাকিয়েই বুদ্ধিমতী বিষ্ণুপ্রিয়া বুঝতে পারলেন, দুঃসংবাদটা মিথ্যে নয়। তবু তিনি সারাদিন স্বামী কিংবা শাশুড়ীকে কিছুই জিজ্ঞেস করলেন না। রাতে খাবার পরে স্বামী ঘরে এলেন। তিনি শুয়ে পড়লেন। বিষ্ণুপ্রিয়া তখন কাঁদতে কাঁদতে স্বামীর পায়ের ওপরে উপুড় হয়ে পড়লেন।

পতিপ্রাণা স্ত্রীর কষ্ট দেখে নিমাই বড়ই ব্যথা পেলেন। তবু তিনি আপন সঙ্কল্পে অটল রইলেন! তিনি প্রথমে বুঝিয়ে-সুজিয়ে বিষ্ণুপ্রিয়াকে শান্ত করলেন। তারপরে তাঁকে উপদেশ দান করলেন।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের ভাষায়—

'জগতে যতেক দেখ, মিছা করি সব লেখ, মিছা করি করহ গেয়ান।
মিছা পতি সুতনারী, পিতামাতা যত বলি, পরিণামে কে হয় কাহার॥
শ্রীকৃষ্ণ চরণ বহি, আর ত কুটুম্ব নাহি, যত দেখ সব মায়া তার।
কি নারী পুরুষ দেখ, সভারি সে আত্মা এক, মিছা মায়া বন্ধে হয় দুই॥'

নিমাইয়ের মুখে এইসব অধ্যাত্মতত্ত্ব শুনে শচীর মতো বিষ্ণুপ্রিয়ার অন্তরেও বৈরাগ্যের সঞ্চার হ'ল। তবু তিনি বললেন—মা বুড়ো হয়েছেন, তিনি যে-ক'দিন আছেন, ততদিন অন্তত ঘরে থাকো।

নিমাই বললেন—মা কিন্তু আমাকে অনুমতি দিয়েছেন।

—বেশ, তাহলে তুমি সন্ন্যাস নাও, তবে আমিও সেই সঙ্গে সন্ন্যাসিনী হব। সীতাদেবী যেমন রামচন্দ্রের সঙ্গে বনে গিয়েছিলেন, আমি তেমনি তোমার সঙ্গে থেকে তোমার সেবা করব।

—তা কি করে হয়! তুমিই তো বললে, মা বুড়ো হয়েছেন। আমরা দুজনেই চলে গেলে কে তাকে দেখবে আর কেই বা রঘুনাথের সেবা করবে? তাছাড়া তুমি তো জানো, সন্ন্যাসীর স্ত্রীমুখ দর্শন করতে নেই। তুমি আমার সতীসাধ্বী স্ত্রী, এখানে থেকেই তুমি আমার সহধর্মিণীর কর্তব্য পালন কর।

বিষ্ণুপ্রিয়া আর কোনো কথা বললেন না। নীরবে স্বামীর আদেশ মাথায় তুলে নিলেন।

কথাটা কিন্তু গোপন থাকল না। খবর পেয়ে ভক্তরাও ছুটে এলেন। তাঁরাও তাঁকে নবদ্বীপ ত্যাগ না করার জন্য অনুরোধ করতে থাকলেন। বললেন—প্রভু, তুমি চলে গেলে আমাদের কি হবে? আমাদের তুমি কার কাছে রেখে যাবে?

তাঁদের আকুলতায় নিমাই কষ্ট পেলেন। কৃষ্ণের বৃন্দাবন ত্যাগের কথা মনে পড়ল তাঁর। বৃহত্তর কর্তব্যের আহ্বানে গোপীজনবল্লভ গোপীদের পরিত্যাগ করে মথুরা চলে গিয়েছিলেন। নিমাইও তাঁর সংকল্প পরিত্যাগ করলেন না।

মা এবং স্ত্রী অনুমতি দিয়েছেন, ভক্তরাও সম্মত হয়েছেন, তবু নিমাই বুঝতে পারলেন, সবার সামনে ঘর ছাড়া খুবই কষ্টের হবে। তাই তিনি গোপনে গৃহত্যাগ করা স্থির করলেন।*

এদিকে নিমাইয়ের বয়স চব্বিশ পূর্ণ হতে চলেছে, মাঘ মাসও প্রায় শেষ হয়ে এলো। আর দেরি করা সমীচীন নয়। আগামীকাল মাঘী সংক্রান্তি! সূর্য মকররাশি থেকে কুম্ভরাশিতে যাবে। সন্ন্যাস গ্রহণের পক্ষে প্রশস্ত সময়। অতএব আজ রাতেই নবদ্বীপ ত্যাগ করতে হবে।

কিন্তু সেদিন বিকেলেই শ্রীধর একটা লাউ নিয়ে এলেন। আরেকজন ভক্ত দুধ দিয়ে গেলেন। নিমাই ভাবলেন, কাল যখন থাকছি না, তখন আজই লাউয়ের পরমান্ন খেতে হবে, নইলে ভক্ত-বাৎসল্য প্রদর্শন করা হয় না। তাই মাকে পরমান্ন রান্না করতে বললেন। রাতে ভক্তদের নিয়ে খেতে বসলেন— নিজে খেলেন আর ভক্তদের খাওয়ালেন।

দুপুর রাতে নিমাই ঘরে গেলেন। তিনি শুয়ে পড়লেন। কিন্তু ঘুমিয়েছিলেন কিনা সে সম্পর্কে সন্দেহ আছে। কারণ চারদণ্ড রাত থাকতেই তিনি বিছানায় উঠে বসলেন। জানলা দিয়ে আসা চাঁদের আলোয় শেষবারের মতো বিষ্ণুপ্রিয়ার কচিকোমল মুখখানি একবার দেখলেন। ফুলের মতো পবিত্র ও সুন্দর সতীসাধ্বীকে তিনি চিরজীবনের জন্য ত্যাগ করছেন। তাঁর বড্ড মায়া হ'ল। কিন্তু তা মুহূর্তের জন্য। কিশোরী স্ত্রীকে রঘুনাথের চরণে সমর্পণ করে নিমাই ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলেন।

মায়ের ঘরের দরজার সামনে এসে নিমাই একবার দাঁড়ালেন। সেখান থেকেই মায়ের উদ্দেশে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। তারপরে ঘরখানি একবার প্রদক্ষিণ করে নিজের এই অনিচ্ছাকৃত অপরাধের জন্য মনে মনে বার বার মায়ের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলেন।

তারপরে নিমাই এলেন মিশ্র পরিবারের গৃহদেবতা রঘুনাথজীর কাছে। মন্দিরদ্বারে দণ্ডবৎ করে রঘুনাথজীর পায়ে অভাগিনী মা ও দুঃখিনী স্ত্রীকে সমর্পণ করলেন। তারপরে তাঁর কাছে সন্ন্যাসের অনুমতি ও আশীর্বাদ প্রার্থনা করে বেরিয়ে এলেন বাড়ি থেকে।*

পথ জনহীন হলেও পথে আলোর অভাব ছিল না। চাঁদের আলোয় নবদ্বীপ তখন দিনের মতই আলোময়। তবে মাঘের শেষ, বাইরে প্রচণ্ড শীত। কিন্তু তাঁর পরনে একখানি মাত্র কাপড়। খালি গায়ে ভগবানের নাম করতে করতে ন'দের নিমাই নদীয়া ছেড়ে চলে যাবার জন্য ছুটে চললেন গঙ্গার দিকে।

পৌছলেন ঘাটে। কিন্তু সেই নিশুতি শীতের রাতে কে তাঁকে গঙ্গা পার করে দেবে? বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে তিনি গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন। সাঁতার কেটে অপর পারে পৌছলেন। ন'দের নিমাইকে নির্বাসন দেবার অপরাধে সেই অভিশপ্ত ঘাট 'নিদয়া' নামে পরিচিত হয়ে রইল।

গঙ্গা পার হয়ে নিমাই আবার ছুটতে থাকলেন। সূর্য ওঠার আগেই পৌছে গেলেন কাটোয়ায়—কেশব ভারতীর আশ্রমে।

অত ভোরে ভেজা কাপড়ে খালি গায়ে নিমাইকে দেখে কেশব বিস্মিত হলেন। নিমাই তাঁকে প্রণাম করে বললেন—আপনি আমাকে সন্ন্যাস দান করুন।

কেশব বললেন—তুমি মহাপণ্ডিত। অদ্বৈতাচার্য সহ সবাই তোমাকে স্বয়ং ঈশ্বর বলে মেনে নিয়েছেন। তোমাকে আমি কি সন্ন্যাস দেব?

—কৃপা করে আপনি আমার সংসার পাশ কেটে দিন, আমাকে ভববন্ধন থেকে মুক্ত করুন।

তবু কেশব তাঁকে শচীদেবী ও বিষ্ণুপ্রিয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। স্মরণ করিয়ে দিলেন তাঁর অগণিত ভক্তদের কথা।

কিন্তু নিমাই বললেন—এক মুহূর্তের জন্যও আমি আর সংসারকে সইতে

---

* শ্রীচৈতন্যভাগবতে বলা হয়েছে, সে রাতে ভক্ত হরিদাস ও গদাধর নিমাইয়ের বাড়িতে ছিলেন। বলা হয়েছে, নিমাই ঘর থেকে বেরিয়ে দেখেন শচীমা বসে আছেন। তাঁর দুচোখে অবিরল ধারা। নিমাই তাঁকে প্রণাম করে বলেন—মা, তুমি অনুমতি দাও, আমি আসি। সন্ন্যাস নিয়ে মানুষকে কৃষ্ণমন্ত্র দিই। কিন্তু মা কোনো কথাই বলতে পারলেন না। নিমাই তখন মার কাছ থেকে নীরব অনুমতি নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন।

পারছি না! আপনি তো জানেন যে শাস্ত্রে আছে—যখুনি অন্তরে বৈরাগ্যের উদয় হবে, তখুনি প্রব্রজ্যা অবলম্বন করবে।

নিমাইয়ের দৃঢ়তা ও ব্যাকুলতা দেখে কেশব মত পরিবর্তন করতে বাধ্য হলেন। তিনি সম্মত হলেন। বললেন—তুমি মস্তক মুণ্ডন করে গঙ্গাস্নান সেরে এসো।

ভারতীর আশ্রমের কাছেই মধু নাপিতের বাড়ি। ভারতীর কাছে যাঁরা সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, মধু তাঁদের মস্তকমুণ্ডন করে। ব্যাপারটা তখন তার কাছে এতই সহজ হয়ে গিয়েছে যে এ বিষয়ে আর তার কোনো মায়া-মমতা নেই। কিন্তু নিমাইকে দেখে তার কঠিন প্রাণটাও কেঁদে উঠল। সে বলে বসল—ঠাকুর তুমি আমাকে ক্ষমা করো। তোমার এই কাচা বয়স আর এমন রূপ। মাথা মুড়িয়ে আমি তোঁমাকে পথের ভিখারী করতে পারব না। ঠাকুর তোমার পায়ে পড়ি, তুমি ঘরে ফিরে যাও।

মধুর স্বরে নিমাই মধুকে বললেন—ভাই, আমার প্রতি এমন নির্দয় হ'য়ো না। তুমি আমাকে দয়া করো, আমাকে ভগবানের পথের পথিক হতে দাও।

শেষ পর্যন্ত চোখের জল ফেলতে ফেলতে মধু নিমাইয়ের ঘন-কালো-কোঁকড়ানো চুলে ক্ষুর লাগালো। কিন্তু নিমাইয়ের মস্তক মুণ্ডনের পরেই সে ক্ষুরখানি গঙ্গায় ফেলে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করল, আর কখনও এই নির্দয় কাজ করবে না।

মুণ্ডিতমস্তকে নিমাই গঙ্গাতীরে এলেন। গঙ্গাস্নান করলেন। মকর সংক্রান্তির পুণ্য প্রভাত। সুতরাং সেখানে তখন বহু স্নানার্থী। নিমাইকে দেখে তাঁরা চমকে উঠলেন। আহা, কিই বা বয়স, তার ওপরে এমন রূপ। এই তরুণ সন্ন্যাস নেবেন! না না, হতেই পারে না।

তাঁরা ছুটে এলেন কেশবের কাছে। বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা কেশবকে অনুরোধ করলেন—আপনি একে সন্ন্যাস দান করবেন না।

যুবক-যুবতীরা বললেন—আমরা কিছুতেই একে সন্নাস দিতে দেব না।

কেশব নীরব রইলেন। কিন্তু নিমাই সমবেত জনতার সামনে দাঁড়িয়ে করজোড়ে বললেন—আপনাদের প্রেম ও প্রীতি অতুলনীয়। আর তাই আমি আপনাদের সাহায্য চাইছি। সংসারে বাস করে আমার পক্ষে প্রাণধারণ করা সম্ভব নয়। তাই আমাকে শ্রীভগবানের পাদপদ্ম লাভ করতে সাহায্য করুন। আমার স্নেহপ্রাণা জননী ও ধর্মপ্রাণা সহধর্মিণী আমাকে গৃহ-পিঞ্জর থেকে মুক্তি দিয়েছেন। এবারে আপনারা সহায় হলেই আমার অভীষ্ট পূর্ণ হয়।

উপস্থিত জনতা আর আপত্তি করতে পারলেন না।

কেশব তখন সন্ন্যাস দানের আয়োজন আরম্ভ করে দিলেন। আর ঠিক তখুনি নবদ্বীপ থেকে নিত্যানন্দ জগদানন্দ মুকুন্দ ও দামোদর প্রভৃতি ভক্তগণকে নিয়ে নিমাইয়ের মেসোমশায় চন্দ্রশেখর আচার্য সেখানে উপস্থিত হলেন। তাঁরা নিমাইকে দেখতে পেয়ে আশ্বস্ত হলেন বটে কিন্তু তাঁর মুণ্ডিত মস্তক দেখে শিউরে উঠলেন। তাঁরা কাঁদতে কাঁদতে নিমাইকে ঘরে ফেরার অনুরোধ জানাতে থাকলেন। কেশব ভারতীর পা ধরে নিমাইকে ফিরিয়ে দিতে বললেন।

কিন্তু কুসুমকোমল নিমাই আজ বজ্রের মতো কঠোর। তিনি চন্দ্রশেখরকে বললেন—আপনি আমার পিতৃতুল্য, আপনার আদেশ অমান্য করা অন্যায়। তবু আমি নিরুপায়। সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে সর্বস্ব ত্যাগ করে একান্তভাবে শ্রীভগবানের পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ না করতে পারলে, আমার চিত্ত শান্ত হবে না। আপনারা আমাকে বাড়ি নিয়ে যেতে পারেন কিন্তু তাতে আমার প্রাণ রক্ষা করা আপনাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়বে।

স্নেহময় বৃদ্ধ চন্দ্রশেখর সেকথা বিশ্বাস করলেন। নিত্যানন্দ সহ সকল ভক্তরাও বুঝতে পারলেন, নিমাইকে বাধা দেওয়া উচিত হবে না।

চন্দ্রশেখর কাঁদতে কাঁদতে বললেন—বাবা, আমাদের অদৃষ্টে যা হবার হবে। ভগবানের কৃপায় তোমার মনোস্কামনা সিদ্ধি হোক। শ্রীভগবানের পাদপদ্মে তোমার কল্যাণ কামনা করছি।

চন্দ্রশেখর ও নিত্যানন্দের অনুমোদন লাভ করে নিমাই খুবই খুশি হলেন। চন্দ্রশেখর সুপণ্ডিত পুরোহিত। তাই নিমাই বলে বসলেন—আপনি দয়া করে সন্ন্যাসের পূর্বকৃত্য আত্মশ্রাদ্ধাদি সুসম্পন্ন করে দিন।

কঠিন হলেও চন্দ্রশেখর শেষ পর্যন্ত সে অনুরোধ রক্ষা করলেন। নিমাই চিরজীবনের জন্য পিতৃপুরুষদের পিণ্ডদান করে অবশেষে নিজেই নিজের পিণ্ড গ্রহণ করলেন।

গভীর রাতে হোমকুণ্ডে যজ্ঞাগ্নি জ্বলে উঠল। উপস্থিত সন্ন্যাসীবৃন্দ ও ভক্তদের সামনে নিমাই যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দিয়ে আত্মশুদ্ধি করলেন। অর্থাৎ বর্ণ আশ্রম দেহ মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার অভিমান প্রভৃতি তাঁর সমস্ত কামনা বাসনা চিরতরে ভস্মীভূত হ'ল। গৃহাশ্রমের সঙ্গেও তাঁর সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল।

আচার্য কেশব নিমাইকে মন্ত্রদান করলেন। গেরুয়া রঙের কৌপীন-বহির্বাস ও দণ্ড-কমণ্ডলু প্রদান করলেন। নূতন নাম দিলেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভারতী। গুরু শিষ্যকে বললেন—

'যত জগতেরে তুমি কৃষ্ণ বোলাইয়া।
করাইলা চৈতন্য-কীর্তন প্রকাশিয়া॥
এতেকে তোমার নাম "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"।
সর্ব লোকে তোমা হৈতে যাতে হৈল ধন্য॥'

পরদিন সকালেই গুরুদেবের আশীর্বাদ ও ভক্তদের শুভেচ্ছা নিয়ে নবীন সন্ন্যাসী পথে বেরিয়ে এলেন। সেই থেকে শুরু হ'ল শ্রীচৈতন্যদেবের যাত্রা—জীব উদ্ধারের জন্য ভারতের পথে-প্রান্তরে দিগ্বিজয়ের জয়যাত্রা। ..."

সহসা থেমে গেলেন প্রভুপাদ, বাস্তবে ফিরে এলাম। বিদ্যানগর স্কুলে বসে আমরা শ্রীচৈতন্যদেবের বৈরাগ্য ও সন্ন্যাস গ্রহণের কথা শুনছিলাম।

"ভক্তবৃন্দ," প্রভুপাদ আবার বলছেন, "কিন্তু সে জয়যাত্রার কথা আমাদের গৌড়মণ্ডল পরিক্রমার বিষয়বস্তু নয়। ন'দের নিমাই নদীয়া ছেড়ে চলে গেলেন, এইটুক বলেই আমি আমার গৌরকথা শেষ করলাম।"

॥ আঠারো ॥

আজ উনিশে ডিসেম্বর, উনিশ শ' বিরাশি। আজ আমাদের পরিক্রমার সপ্তম অর্থাৎ শেষদিন। সাতদিন আগে জানতাম না আমার জন্য গৌড়মণ্ডলের পথে পথে এত আনন্দ জমা হয়ে আছে, জানতাম না ব্রজ-পরিক্রমার সময় যাকে খুঁজে পেয়েছিলাম, গৌড়-পরিক্রমার পরে সে আমার জীবনে পরমসত্য হয়ে উঠবে।

গতকাল পরিচয় প্রকাশিত হবার পর থেকেই সহযাত্রীদের মনে আমার সম্পর্কে কৌতুহলের সৃষ্টি হয়েছে। ফলে তাঁরা আমাকে একা পেলেই নানা প্রশ্ন করছেন। সে-সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অনেক সময়েই আমার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ছে। তাই আমি তাঁদের এড়াবার জন্য প্রভুপাদের পাশে পাশে থাকবার চেষ্টা করছি।

এমন পরিস্থিতির কথা অবশ্য আমার জানা ছিল। তাই আমি প্রভুপাদকে আমার পরিচয় গোপন রাখতে বলেছিলাম। কিন্তু গতকাল বৃহত্তর প্রয়োজনে তিনি আমার পরিচয় প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছেন। এবং নিতাইগৌরের কৃপায় আমি তাঁর আশা পূর্ণ করতে পেরেছি।

গতকাল সবাইকে নিয়ে স্কুলবাড়িতে বড়ই আরামে রাত কাটিয়েছি। প্রভুপাদ ও দাদাদের সঙ্গে আমরা দোতলায় ছিলাম। তিনখানি ক্লাশরুম নিয়ে বিরাট ঘর। কাঠের পার্টিশান এবং বেঞ্চি হস্টেলের ছাত্ররাই সরিয়ে দিয়েছে। আমরা ঢালা-বিছানা পেতে নিয়েছি। জীবনদাদু রসময়দা অমলদা দত্তবাবু ও তাঁর ভাই, গৌরদা কানু কাশীনাথ এবং আমি প্রভুপাদের সঙ্গে থেকেছি। এমনকি মতি কৃষ্ণা নবদ্বীপের বৌদি এবং মানসীও আমাদের ঘরে ছিল। অন্যান্য সহযাত্রীদের জন্য একতলায় দুখানি প্রকাণ্ড ঘর নির্দিষ্ট হয়েছিল। একখানিতে ছেলেরা ও আরেকখানিতে মেয়েরা থেকেছেন। অর্থাৎ কাল রাতে আমরা সবাই বেশ নিশ্চিন্ত ও আরামে ঘুমিয়েছি।

আর তাই বোধকরি আজ রওনা হতে দেরি হয়ে গেল। এখন সকাল আটটা। সংকীর্তন শোভাযাত্রা শুরু করতে আরও কিছুক্ষণ লেগে যাবে। তবে সুখের কথা ইতিমধ্যে একগ্লাশ চা গলাধঃকরণ করা গিয়েছে। স্কুলের উল্টোদিকেই চায়ের দোকান রয়েছে।

স্কুলের কয়েকজন মাষ্টারমশায়, জনকয়েক স্থানীয় ভদ্রলোক ও গুটিকয়েক ছাত্র সকাল থেকেই আমাদের সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে। তাদের কয়েকজনকে আমার অটোগ্রাফ্ দিতে হয়েছে। একটি ছেলে আবার ছবি তুলেছে। প্রভুপাদ নিজেও বিদ্যানগরের বেশ কয়েকখানি ছবি নিলেন।

আজ আমাদের দেরি হবার আরও কারণ আছে। আজ আমরা নবদ্বীপে অর্থাৎ অন্তর্দ্বীপে ফিরব। তাই সবাই একসঙ্গে পথ চলব। এমনকি গরুর গাড়ি চারখানিও আমাদের সঙ্গে থাকবে। অর্থাৎ মানুষ ও গরু সবাই পরিক্রমা শেষ করে একসঙ্গে অন্তর্দ্বীপে প্রত্যাবর্তন করব।

তাছাড়া আজ আবার ঠাকুরের সিংহাসন নিজেদের বইতে হবে। মদন-মোহনজী ভক্তদের কাঁধে চড়ে নবদ্বীপ থেকে নিদয়ায় এসেছিলেন, আজ তাই কাঁধে চড়েই নবদ্বীপে ফিরবেন। এইসব নানা কারণে আজ আমাদের রওনা হতে দেরি হয়ে গেল।

কিন্তু সব দেরির শেষ আছে। সুতরাং একসময় প্রস্তুতিপর্ব শেষ হল। শিক্ষক ছাত্র ও অন্যান্য ভদ্রলোকদের কাছ থেকে নিতে হল বিদায়। তাঁরা সেই একই কথা বললেন—বড় আনন্দ দিয়ে গেলেন, আবার আসবেন।

সেই এক মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিতে হ'ল বিদায়। সংকীর্তন শোভা-যাত্রা চলল এগিয়ে। কীর্তনীয়ারা গান ধরেছেন—

'ওহে শ্রীনিবাস, এই বিদ্যান রে।
বৃহস্পতি আরাধয়ে শ্রীগৌরসুন্দরে ॥'

পিচ বাঁধানো পথ। এ যাত্রায় আর কোনো গ্রামে এত ভাল পথ দেখি নি। পরেশবাবু যখন এম. এল. এ, ছিলেন, তখুনি নাকি এসব হয়েছে। অথচ ভদ্রলোক নিজে নাকি নবদ্বীপে ভাড়া বাড়িতে বাস করেন।

পথের দু-পাশে বাড়ি-ঘর। মাঝে মাঝেই পাকাবাড়ি। প্রতি বাড়িতেই প্রচুর গাছপালা—ফুল ও ফলের গাছ। বিদ্যানগর সত্যই বেশ উন্নত গ্রাম।

গ্রামের মেয়ে-পুরুষ পথের ধারে দাঁড়িয়ে আমাদের অভিনন্দিত করছেন।

আজ জবা ও আলপনা চন্দনের টিপ পরাবার কাজটি হাতে নিয়েছে। শাড়ী পরলেও ওরা দুজনেই কিশোরী। কিন্তু কাজটি বেশ গুছিয়ে করছে। শোভাযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে দুজনে দুদিক থেকে প্রায় ছুটে ছুটে পথ চলেছে। কোনো দর্শক কিংবা পথচারী টিপ না পরে রেহাই পাচ্ছে না।

আগেই বলেছি আজ আমরা প্রথম দিনের ক্রম অনুসরণ করছি। কেবল কৃষ্ণার সঙ্গে নবদ্বীপের বৌদি আরতি ভৌমিক হরিভক্তি প্রচারিণী সভার

ফেস্টুনটি বয়ে নিয়ে চলেছে। মতি আজ দাদাদের সঙ্গে রয়েছে। আর গরুর গাড়ি চারখানি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে পথ চলেছে। শোভাযাত্রাটি আজ সত্যই বড় সুন্দর দেখাচ্ছে। ভাবতে খারাপ লাগছে আগামীকাল আমরা আর এমন কীর্তন করব না, এমন সারি বেঁধে পথ চলব না।

একসারিতে সবাই চলেছি। সুতরাং সুদীর্ঘ পথ জুড়ে শোভাযাত্রা। সামনে কীর্তন—খোল করতাল ও মানুষের কণ্ঠস্বর। পেছনে গরুর গাড়ি চলার ক্যাঁকর-কোঁকর শব্দ। বহুকাল এ শব্দটা শুনি না। কিন্তু আজ কানে আসতেই সুদূর শৈশবের স্মৃতি মনের মুকুরে প্রতিফলিত হয়ে ওঠে। মনে পড়ছে অবিভক্ত বাংলার এক অখ্যাত গ্রাম রহমতপুরের কথা। রংপুর জেলার সেই ছোটগ্রামটিতে আমার শৈশব কেটেছে। তখন ওখানে যাতায়াতের একমাত্র পরিবহন গরুরগাড়ি। আমরা গরুরগাড়ি চড়ে তিস্তার খেয়া পেরিয়ে নলডাঙ্গা রেলস্টেশনে যেতাম। গাড়ির পেছনে বসে আমি একমনে এই ক্যাঁকর-কোঁকর শব্দটা শুনতাম। তারপরে আমি আমার জন্মভূমি বরিশাল শহরে ফিরে এসেছি। আর ঐ শব্দটা শোনা হয় নি। কারণ বরিশাল জেলার প্রধান পরিবহন নৌকো। অথচ আশ্চর্য এতকাল পরে এই শব্দটা শুনে মুহূর্তের মধ্যে সেই শৈশবস্মৃতি আমার মনের মুকুরে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠল!

পথের ডানদিকে ক্ষেত, তারপরে গ্রাম। কানু বলে, "গ্রামের নাম চাঁদপুর।"

চাঁদপুরের নারী-পুরুষ ও ছেলে-মেয়েরা ক্ষেতের আলের ওপর দিয়ে দলে দলে ছুটে আসছে। তারা পথের ধারে এসে দাঁড়িয়ে পড়ছে। জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে নিতে কীর্তন শুনছে, ঠাকুর দর্শন করছে আর আমাদের দেখছে। জবা ও আলপনা তাদের সবার কপালে চন্দনের টিপ দিচ্ছে পরিয়ে।

সকাল সাড়ে ন'টার সময় আমরা বিদ্যানগর মোড়ে এলাম। বিদ্যানগর থেকে আসা সরু পিচ্ পথটি এখানে এসে বর্ধমান ও নবদ্বীপের পথে মিলিত হল। মোড়ের মাথায় একটা বটগাছ, তারই ছায়ায় চায়ের দোকান। বর্ধমান থেকে একটা বাস এলো, নবদ্বীপ যাবে। সোজা পথে এখান থেকে নবদ্বীপ মাত্র আড়াই মাইল। কিন্তু আমরা গৌড়মণ্ডল পরিক্রমা করছি। সুতরাং সোজাপথের পথিক নই। আট মাইল পথ পায়ে হেঁটে আমাদের বিদ্যানগর থেকে নবদ্বীপ পৌঁছতে হবে। অতএব আমরা ভিন্ন পথে উত্তরদিকে এগিয়ে চললাম।

বিদ্যানগর মোড় থেকে মিনিট দশেক হেঁটে আরেকটা মোড়ে আসা গেল।

মোড়ের মাথায় মাইলস্টোন—কাটোয়া ৩৩ কিলোমিটার।

আমরা সবাই স্তম্ভটি দেখেছি। কিন্তু কথাটা কেবল জিজ্ঞেস করে মানসী। সে আমার কাছে এসে বলে, "আচ্ছা সেদিন শেষরাতে নিদয়াঘাটে গঙ্গা পার হয়ে নিমাই কি এইপথে কাটোয়া গিয়েছিলেন?"

প্রশ্নটা আমার মনেও দেখা দেওয়া উচিত ছিল। তাই একটু ভেবে নিয়ে উত্তর দিই, "সম্ভবতঃ নয়। কারণ তিনি তাড়াতাড়ি পৌঁছতে চেয়েছিলেন। আমার ধারনা তিনি গঙ্গা পার হয়ে গঙ্গাতীর দিয়েই কাটোয়া ছুটে গিয়েছেন।"

কীর্তনীয়ারা গান ধরেছেন। তাঁরা ভক্তিরত্নাকর থেকে বলে চলেছেন—বিদ্যানগর থেকে বৃদ্ধ ঈশান আচার্যদের নিয়ে জান্নগর বা জহ্নুদ্বীপে আসেন। এখানে জহ্নুমুনি ভুবনমোহন গৌরচন্দ্রের আরাধনা করেছিলেন।

আমরাও এখন জহ্নুদ্বীপে এসেছি। কাটোয়ার মোড় ছাড়িয়ে মিনিট দশেক হেঁটে আরেকটা মোড়ে পৌঁচেছি—তেমাথার মোড়। এখানেও পথনির্দেশক রয়েছে—কাটোয়া, ভাণ্ডারটিকুরি, কালনা। আর রয়েছে দুটি বট ও একটি কৃষ্ণচূড়া গাছ। গাছের ছায়ায় চায়ের দোকান। যথারীতি মানসী বলে, "একটু চা খেয়ে নিলে পারতে।"

ঘড়ির দিকে নজর দিই—পৌনে দশটা। এখন চা না-খেলে পথে আমার কোনো কষ্ট হবে কিনা জানি না কিন্তু জানি তাতে মানসীর কষ্টের সীমা থাকবে না। অতএব কানু কাশীনাথ কৃষ্ণা ও দত্তবাবুদের নিয়ে একটা দোকানে এসে ঢুকি। বলা বাহুল্য মানসীও আমাদের সঙ্গে আসে।

কৃষ্ণা হাসতে হাসতে বলে, "দিদি যে আমাদের সঙ্গে এলেন বড়! আপনি তো চা খান না?"

হাসতে হাসতেই মানসী জবাব দেয়, "আমার যে চা খাওয়া দেখতে ভারী ভাল লাগে।"

ওর কথা শুনে ওরা হেসে দেয়। কিন্তু আমি জানি মানসী ঠাট্টা করে নি, সত্যি কথাই বলেছে। আমার চা খাওয়া দেখতে ওর ভারী ভাল লাগে।

শোভাযাত্রা এগিয়ে গিয়েছে। চা খেয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি পথ চলতে হয় আমাদের। আমরা ভাণ্ডারটিকুরির দিকে এগিয়ে চলেছি। ইট বাঁধানো পথ। পথের পাশে বাড়ি-ঘর ও গাছপালা—ফুল ও ফলের গাছ।

কয়েকমিনিট পা চালিয়েই সহযাত্রীদের ধরে ফেলা গেল। কিন্তু তারপরে শোভাযাত্রা গেল থেমে। প্রভুপাদ বলেন, "এটাই সারঙ্গমুরারি ঠাকুরের শ্রীপাট। এ জায়গাটির নাম জহ্নুটিলা।"

পথের বাঁদিকে একটা দেওয়াল ঘেরা বাড়ি। সামনে লেখা—

'শ্রীশ্রী সারঙ্গমুরারি ঠাকুরের শ্রীপাট।

শ্রীশ্রী সারঙ্গমুমারি ঠাকুরের সেবিত 'শ্রীরাধাগোপীনাথ জীউ, শ্রীশ্রী বাসুদেব দত্ত ঠাকুরের সেবিত শ্রীরাধামদনগোল জীউ, শ্রীশ্রী পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরের সেবিত শ্রীগৌরগদাধর জীউ। সম্মুখে শ্রীসিদ্ধ বকুলদেব।'

আমরা ভেতরে আসি। একফালি ছোট উঠান। মাঝখানে একটি গোড়াবাঁধানো বকুলগাছ—সিদ্ধবকুল। সারঙ্গমুরারি ঠাকুর নিজেই নাকি গাছটি রোপণ করেছিলেন। তার মানে এর বয়স পাঁচ শ' বছর।

উঠানের পরে বারান্দা—টালির চাল। তারপরে মন্দির। মন্দিরদ্বারে আসি। দর্শন ও দণ্ডবৎ করে গোপীনাথজীর কৃপা প্রার্থনা করি, শ্রীমন্মহাপ্রভুর আশীর্বাদ কামনা করি।

তারপরে নেমে আসি মন্দির থেকে। আমরা অনেক লোক, ছোট জায়গা। ভাগে ভাগে দর্শন করতে হবে। সকলের দর্শন শেষ হতে সময় লাগবে। তাই প্রভুপাদ দর্শন করে পথের ধারে গিয়ে বসেছেন। আমরা দুজনেও সেখানে আসি। আরও কয়েকজন সহযাত্রী এখানে রয়েছেন। প্রভুপাদ তাঁদের বলছেন, "এটি খুবই প্রাচীন মন্দির মহাপ্রভুর আমলে তো বটেই। পরবর্তীকালে অবশ্য পুরীদাস গোস্বামী এই মন্দিরের সংস্কার সাধন করেছেন। কিন্তু তা-ও অনেকদিন হয়ে গেল।

সারঙ্গমুরারি ঠাকুর ছিলেন গোপী-াথজীর পরমভক্ত। অত্যন্ত নিষ্ঠাসহকারে তিনি শ্রীবিগ্রহের সেবা করতেন। কথিত আছে বিদ্যানগর যাতায়াতের পথে নিমাই পণ্ডিত এখানে বিশ্রাম নিতেন। বৃদ্ধ সারঙ্গমুরারি তাঁকে খুবই ভক্তি করতেন, নিয়মিত প্রসাদ দিতেন।

একদিন নিমাই লক্ষ্য করলেন, সারঙ্গ বড়ই বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন, তাঁর সেবা-পূজা করতে কষ্ট হয়। তিনি সারঙ্গকে বললেন—আপনি একজন শিষ্য গ্রহণ করুন।

সারঙ্গদেব সবিনয়ে বললেন—শিষ্য সংগ্রহ করা আমার পক্ষে সম্ভব হ'বে না।

—কেন বলুন তো! নিমাই বিস্মিত।

—যে রকম আনুগত্য বা সেবাবুদ্ধি কিংবা ভজনপ্রবৃত্তি থাকলে শিষ্য করা যায়, আমি তেমন তরুণ পাবো কোথায়?

—পাবেন বৈকি, নিশ্চয়ই পাবেন। নিমাই সহাস্যে আশ্বাস দেন। বলেন —কাল গঙ্গাস্নানে গিয়ে প্রথম যার মুখদর্শন করবেন, তাকেই মন্ত্র দিয়ে শিষ্য করে নেবেন।

পরদিন ব্রাহ্মমুহূর্তে সারঙ্গ স্নান করতে গঙ্গার ঘাটে এলেন। তিনি জলে নামলেন। জলে দাঁড়িয়ে চোখবুজে ইষ্টনাম জপ করতে শুরু করলেন। কেটে যায় কিছুক্ষণ। তারপরে সহসা সারঙ্গ একটা কোমল স্পর্শ অনুভব করলেন। তিনি তাড়াতাড়ি চোখ মেললেন। দেখলেন একটি মুণ্ডিত মস্তক ভারীসুন্দর মৃতদেহ, গঙ্গায় ভাসতে ভাসতে তাঁর গায়ে এসে আটকে গিয়েছে। মৃতদেহের মুখখানি দেখে বড় মায়া হল তাঁর। তারপরেই মনে পড়ল প্রভুর আদেশ—গঙ্গাস্নানে গিয়ে প্রথম যার মুখদর্শন করবেন, তাকেই মন্ত্র দিয়ে শিষ্য করে নেবেন।

প্রভু তো বলেন নি, সে মুখ জীবন্ত কি মৃতের। প্রভুর আজ্ঞা যে পালন করতেই হবে। তাহলে তো এই মৃতদেহের কানেই ইষ্টমন্ত্র দান করতে হয়।

তাই করলেন সারঙ্গমুরারি। তিনি মৃতদেহটিকে ধরে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে ইষ্টমন্ত্র জপ করলেন।" একবার থামলেন প্রভুপাদ। তারপরে একটু নড়ে বসে আবার বলতে শুরু করলেন, "ভক্তবৃন্দ, আপনারা জানেন, মন্ত্রের বীজের মধ্যেই সচ্চিদানন্দময় ঈশ্বর বর্তমান। সুতরাং সারঙ্গের সেই ইষ্টমন্ত্রের প্রভাবে মৃত কি আর অচেতন থাকতে পারে? সে যে তখন অমৃতের পরশ পেয়েছে। তাই বিভুসচ্চিদানন্দের স্পর্শে অনুসচ্চিদানন্দ জাগ্রত হল। সেই মৃতদেহ নিজের পায়ে দাঁড়ালো, সে সারঙ্গমুরারিকে প্রণাম করল।

আনন্দে ও বিস্ময়ে সারঙ্গ হতবাক হয়ে গেলেন। করুণাময় প্রভুর অসীম করুণার কথা ভেবে তাঁর চোখদুটি জলে ভরে উঠল।"

আমরাও অশ্রুসিক্ত। চোখ মুছে উঠে দাঁড়াই। আবার শুরু হল সংকীর্তন শোভাযাত্রা। রসময়দা মাইক হাতে নিয়েছেন। প্রভুপাদ নিজে খোল বাজাচ্ছেন। ভক্তবৃন্দ উল্লসিত। রসময়দা গাইছেন—

'রঘুপতি রাঘব রাজা রাম।
পতিত পাবন সীতারাম॥…'

রসময়দা রামায়ণ গায়ক। তিনি রামধুন গাইতেই পারেন। কিন্তু এখানে এসে তাঁর মাইক হাতে নেবার একটা বিশেষ কারণ রয়েছে। কথিত আছে, বনবাসের সময় রাম-লক্ষ্মণ সীতা নাকি এই দ্বীপে এসেছিলেন। ভক্তিরত্নাকরে বলা হয়েছে—এখানে এসে রাম-লক্ষ্মণ সীতা বিরাট এক বটের ছায়ায় বিশ্রাম করেছিলেন। তখন কথায় কথায় শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীর কাছে ভবিষ্যদ্বাণী করেন—গৌরাবতারে এখানে সংকীর্তনানন্দ হবে। আর শ্রীভগবানের মোদবৃদ্ধি হবার জন্য তখন থেকেই এই দ্বীপের নাম হয় মোদদ্রুম দ্বীপ।

ভক্তিরত্নাকরের আমলে এখানকার নাম ছিল মাউগাছি। ঈশান জহ্নুদ্বীপ বা জান্নগর থেকে আচার্যদেব এখানে নিয়ে আসেন। আমরাও তাই এলাম। কথিত আছে, গৌরচন্দ্র একদিন এই মাউগাছি গ্রামের জনৈক রামভক্ত গ্রামবাসীকে রামরূপে দর্শন দান করেছিলেন।

আমরা রামধুন গাইতে গাইতে উত্তরে এগিয়ে চলেছি। এখন সকাল সাড়ে দশটা। পথের দু-পাশে বাড়ি-ঘর। ডানদিকে মাঝে মাঝে জলাশয়। আগে নাকি এখান দিয়েই গঙ্গা প্রবাহিত হত।

তাই হবে। মহাপ্রভুর আমলে বিদ্যানগর ছিল নবদ্বীপের অপরপারে। মহাপ্রভু নবদ্বীপ থেকে নৌকোয় করে বিদ্যানগর আসতেন। তারপরে গঙ্গার গতি পরিবর্তনের ফলে নবদ্বীপ ও বিদ্যানগর গঙ্গার একই তীরে হয়ে গিয়েছে। তাই আমাদের নবদ্বীপ যেতে আর মহাপ্রভুর মতো গঙ্গা পার হবার প্রয়োজন হবে না। আমরা পায়ে হেঁটেই নবদ্বীপ পৌঁছে যাবো।

পথের বাঁদিকে একটা স্কুল—লম্বা একতলা বাড়ি। সামনে খেলার মাঠ। আর পথের ডানদিকে সুন্দর একটা ফলের বাগান—নারকেল কলা খেজুর আম কাঁঠাল আরও কত গাছ। ভারী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

জবা ও আলপনার কিন্তু পথের দিকে নজর নেই। তাদের লক্ষ্য শুধুই পথিকদের দিকে। দুজনে পথের দু-দিকে ধরে পথ চলেছে। পথচারীদের প্রত্যেকের কপালে চন্দনের টিপ দিচ্ছে পরিয়ে। ওদের দুজনের কাজ আর গরুর গাড়ির সেই অভিনব শব্দটার শুধু বিরাম নেই।

বেলা পৌনে এগারোটায় আমরা ভাণ্ডারটিকুরি রেলস্টেশনে এলাম। পথের দু-পাশেই দোকান-পাট আর উৎসুক জনতা। শোভাযাত্রা এগিয়ে চলল। দর্শকদের ললাটে চন্দন-তিলক এঁকে দিতে দিতে জবা আর আলপনাও চলেছে এগিয়ে।

রেল লাইন পার হয়ে এলাম। ব্যাণ্ডেল—বারহারওয়া লাইনে নবদ্বীপ ধামের পরের স্টেশন ভাণ্ডারটিকুরি। এখান থেকে নবদ্বীপ ধাম মাত্র পাঁচ কিলোমিটার।

পথের দু-দিকেই কিছু পাকা বাড়ি। প্রায় প্রতিবাড়ির ছাদে উৎসুক জনতা। কিন্তু জবা ও আলপনা তাদের তিলক পরাতে পারছে না। একটু সময় দিলেই ওরা এক দৌড়ে ছাদে উঠে কাজটা সমাধা করে আসতে পারে। কিন্তু শোভাযাত্রা এগিয়ে চলেছে। বোধকরি ওরা দুজনেই দুঃখিত।

এখন পথের বাঁদিকে শুধু বাড়ি-ঘর, ডানদিকে দিগন্ত বিস্তৃত ক্ষেত।

দু-চারটি গরু কিংবা কয়েকটা ছাগল ছাড়া ক্ষেতে কেউ নেই। তারাও কিন্তু খাওয়া ভুলে আমাদের দিকে রয়েছে তাকিয়ে। ওরা কি কীর্তন শুনছে? কে জানে? মহাপ্রভু যখন হরিনাম করতে করতে ঝাড়খণ্ডের জঙ্গলের ভেতর দিয়ে বৃন্দাবনের পথে পাড়ি দিচ্ছিলেন, তখন নাকি গভীর অরণ্যের হিংস্র প্রাণীরা প্রভুর নামগানে আকৃষ্ট হয়েছিল। তারা হিংসা ভুলে নাচতে শুরু করে দিয়েছিল। আর এরা গৃহপালিত অহিংস প্রাণী। এরা তো নাম কীর্তন শুনতেই পারে!

প্রভুপাদ মাঠে নেমে আমাদের ছবি নিচ্ছেন। সত্যি এই প্রেমময় কর্মঠ মানুষটিকে যত দেখছি, ততই অবাক হচ্ছি। কি অমানুষিক পরিশ্রমই না করতে পারেন! এর আগে উৎসব গিয়েছে। তারপরে এই পরিক্রমা। একদিকে এতগুলো মানুষের খাওয়া থাকা নিরাপত্তা ও পথচলার ব্যবস্থা, আরেকদিকে পূজা-আরতি ও পাঠ-কীর্তন। তার ওপরে পথে বেরিয়ে ছবি তোলা। অথচ মুখে সব সময় হাসিটুকু লেগে আছে। নিতাই-গৌর! এই স্নেহময় মানুষটির প্রতি তোমাদের কৃপা কিন্তু অক্ষুণ্ণ রেখো!

"একটু এদিকে আসবে!"

মানসীর কথায় আমি প্রভুপাদের চিন্তামুক্ত হই। তাকিয়ে দেখি সে পথের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। জিজ্ঞেস করি, "কোন্‌দিকে?"

সে ইসারা করে শোভাযাত্রার পেছনদিকটা দেখায়। জিজ্ঞেস করি, "কেন?"

"একটা কথা আছে।"

আর কোনো কথা না বলে আমি তার পাশে এসে দাঁড়াই। শোভাযাত্রা এগিয়ে চলে। কিছুক্ষণ বাদে গরুর গাড়িগুলিও চলে যায় একে একে।

মানসী বলে, "চলো, এবারে সবার পেছনে পথ চলা যাক।"

আমি তার সঙ্গে পথচলা শুরু করি।

একটু বাদে মানসী জিজ্ঞেস করে, "তুমি কি প্রভুপাদকে কিছু বলেছো?"

"কি বলব?" ওর কথা ঠিক বুঝতে পারছি না। আমি ওর মুখের দিকে তাকাই।"

"বারে! সেদিন যে বললে সেই সাতকুলিয়া যাবার পথে!"

কথাটা মনে পড়ে আমার। আমি তাকে বলেছিলাম যে প্রভুপাদকে অনুরোধ করব—শ্রীরাধা মদনমোহনকে সাক্ষী রেখে আপনি আমাদের মালা বদল করে দিন।

সে তখন সবিস্ময়ে বলে উঠেছিল—মালা বদল! তার মানে তো বিয়ে?

—হ্যাঁ মানসী!

—কিন্তু তুমি তো জানো সখা, ওতে আমার বড্ড ভয়।

—না, সে ভয় আর এখন তোমার নেই মানসী! বরং তোমার ভয় অন্ত কারণে। আর তাই আমরা মালা-বদল করব।

সে আর কোনো আপত্তি করে নি। বরং মৌনপ্রণামের মধ্য দিয়ে আমাকে ওর জীবনে বরণ করে নিয়েছে।

তারপরে গত দুদিন আমি আর এ নিয়ে কোনো আলোচনা করি নি। তাই মানসী কথাটা জিজ্ঞেস করছে আমাকে।

"কি চুপ করে রইলে কেন? মালা-বদলের উৎসাহ কি উবে গেল নাকি?"

"না।"

"তাহলে।"

"কথাটা বলা হয় নি প্রভুপাদকে, নবদ্বীপে ফিরে বলব।"

"তাই ব'লো।" মানসী যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে। তারপরে একটু হেসে বলে, "আমি ভাবলাম কি জানি, এর মধ্যে হয়তো তোমার ঘর বাঁধার নেশা কেটে গেছে।"

"তোমার কি আমার ওপরে আস্থা নেই মানসী।" তুমি কি আমাকে বিশ্বাস ক'রো না?"

"এমন করে ব'লো না সখা! তুমি আমাকে ক্ষমা ক'রো। আমি ঠাট্টা করছিলাম।" একবার থামে সে। তারপরে আবার বলে, "তোমাকে আমি আমার নিজের থেকেও বেশি বিশ্বাস করি সখা! আর তাই তো গত দুদিন ধরে কেবল মালা-বদলের কথাটা ভেবেছি।"

"ভেবে কি সাব্যস্ত করলে?"

"তোমার মতই আমার মত।"

"অর্থাৎ যদিদং হৃদয়ং তব, তদিদং হৃদয়ং মম…"

"হ্যাঁ।"

সহযাত্রীরা সবাই সামনে, কেউ আমাদের দিকে তাকিয়ে নেই। তবু আমি আজ আর ওকে সেদিনের মতো কাছে টেনে নিতে পারি না। শুধু ওর একখানি হাত আমার হাতের মুঠোয় ভরে নিয়ে মনে মনে তাঁকে স্মরণ করি। সেই পরমকরুণাময় নবদ্বীপচন্দ্রকে বলি—ঠাকুর, তুমি না হলে আর কি হত, তা ভাবার মতো মনের অবস্থা এখন আমার নয়। আমার এখন শুধুই

মনে হচ্ছে—তুমি না হলে আমার এই পরিক্রমা হ'ত না, আর এই পরিক্রমা পূর্ণ না হলে মানসীকে আমি আমার জীবনে এমন করে কাছে টেনে নিতে পারতাম না।

মানসী আবার এগিয়ে গিয়েছে সামনে—মেয়েদের মাঝে। ভালই করেছে। এমনিতেই গতকাল বিকেল থেকে সহযাত্রীরা আমাকে অন্য চোখে দেখতে শুরু করেছেন। সুতরাং সবাইকে ফেলে আমাদের দুজনের বেশিক্ষণ এমন একা একা চলা ভাল দেখায় না।

আমি কিন্তু আর এগিয়ে যাই নি। গরুর গাড়ির সেই পরিচিত শব্দটা শুনতে শুনতে পথ চলেছি। গাড়োয়ানদের নেতা গুরুপদ হঠাৎ বলে, "আর কি, ফিরে এলেন নবদ্বীপ? তেষট্টি মাইল রাস্তা পায়ে হাঁটলেন, সামনেই জগাই-মাধাই উদ্ধারস্থল।"

গুরুপদ ঠিকই বলেছে। শহরতলী শুরু হয়ে গিয়েছে। নবদ্বীপবাসীরা সস্নেহে স্বাগত জানাচ্ছেন আমাদের। তাঁরা ঘর ছেড়ে পথে নেমে এসেছেন। কুলবধূরা কলসীভরা জল ঢেলে পথ ধুইয়ে দিচ্ছেন। যাবার দিনও তাঁরা তাই করেছেন। বয়স ও ধর্ম নির্বিশেষে সবাই আমাদের হেঁটে যাওয়া পথের ধুলি নিচ্ছেন। অর্থাৎ আমাদের পদধুলি মাথায় মাখছেন। আমরা যে ভক্তিপথ পরিক্রমা করে এলাম।

আমার চোখদুটো জলে ভরে ওঠে। অবাধ্য অশ্রু নেমে আসে গাল বেয়ে। আমি কাঁদছি। কিন্তু কেন? আমি যে ভক্তিহীন অবৈষ্ণব!

নানা ভাবে নিজেকে বোঝাতে চাইছি, পারছি না। আমার কান্না কিছুতেই থামছে না। চশমা ঝাপসা হয়ে আসছে। বারবার চশমা খুলে চোখ মুচছি, চশমা মুচছি। ভাগ্যিস সবার পেছনে পথ চলেছি। নইলে তো ব্যাপারটা হাস্যকর হয়ে উঠত।

কাঁদছি আর ভাবছি—কেন এমনটি হচ্ছে। হিমালয় আর সমতল ভারতের বহুদুর-দুর্গম তীর্থ দর্শনের সৌভাগ্য আমার হয়েছে। কিন্তু কেবল কেদারনাথ ও অমরনাথ ছাড়া তো কোথাও আমার এমন হয়নি! কেন জানি না মনকে শক্ত করার বহু চেষ্টা করেও ঐ দুটি শিবক্ষেত্রে পৌঁছে আমি কিছুতেই না কেঁদে থাকতে পারি নি। বিশেষ করে তৃতীয়বার কেদারনাথ দর্শনের সময় আগের থেকে স্থির করেও চোখের জল সামলাতে পারি নি। ভেবেছি দুর্গম

তীর্থপথের প্রান্তে পৌঁছে ওটা আমার আনন্দাশ্রু কিংবা ওটি স্থানমাহাত্ম্য। কিন্তু এখানে এমন হচ্ছে কেন—সমতল বাংলার এই শহুরে পথে? তাহলে কি স্থানমাহাত্ম্যের বিচারে নবদ্বীপ কেদারনাথ কিংবা অমরনাথের চেয়ে খাটো নয়?

বুঝতে পারছি না এ কান্না কার জন্য? প্রভুপাদ মদনগোপালের জন্য, শ্রীচৈতন্য স্মৃতিধন্য তীর্থপথের জন্য কিংবা কলির ভগবানের জন্য? এ কান্না কি আমার বহুদিনের বাসনা গৌড়মণ্ডল পরিক্রমা পূর্ণ করার আনন্দাশ্রু? এ কান্না কি মানসীকে আপন করে পাবার মধুর-রোদন?

কিছুই জানি না। কেবল জানি আমি কাঁদছি। বাঁধভাঙা কান্নায় আমি ক্রমেই অস্থির হয়ে পড়ছি।

"আপনি এমন সবার পেছনে পড়ে রইলেন কেন? এগিয়ে যান।" পেছন ফিরে গুরুপদ আমাকে বলে।

কোনো উত্তর দিই না। কথা বললে কান্না ধরা পড়ে যাবে। ওকে ইসারা করে এগোতে বলে আমি আরও আস্তে হাঁটতে শুরু করি। মনকে ফাঁকি দেবার জন্য বিগত সাতদিনের স্মৃতি রোমন্থন করতে থাকি।

সেদিন নবদ্বীপ থেকে রওনা হবার সময় পরিক্রমার কথা ভেবে, বিশেষ করে সহযাত্রীদের দেখে কত আশঙ্কাই না হয়েছিল। আশ্রয়ের চিন্তা, নিরাপত্তার চিন্তা আর সহযাত্রীদের চিন্তা। চার বছরের শিশু থেকে আশি বছরের বৃদ্ধ-বৃদ্ধা আমার সহযাত্রী। পথে তাদের কারও জ্বর হয়েছে, পেট খারাপ হয়েছে, কারও প্রেসার বেড়েছে কারও বা পা কেটেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেউ পরিক্রমা ছেড়ে ফিরে আসে নি।

চার বছরের ছেলেটি বাবা-মার সঙ্গে আগরতলা থেকে এসেছে। রাজাপুরে তার প্রবল জ্বর হল। ডাক্তারবাবু ওষুধ দিয়ে তার বাবা মাকে দেখিয়ে প্রভুপাদকে বললেন—বাবা, এঁরা বরং ছেলে নিয়ে নবদ্বীপ ফিরে যান। এমন জ্বর গায়ে এতটুকু শিশুর এই ঠাণ্ডায় থাকা উচিত হবে না।

ছেলেটির মা-বাবা করুণ চোখে গুরুদেবের দিকে তাকিয়েছিল। বড় আশা নিয়ে তারা সুদূর ত্রিপুরা থেকে এসেছে—গুরুদেবের সঙ্গে গৌড়মণ্ডল পরিক্রমা করবে।

প্রভুপাদ চোখ বুজে কি যেন একটু ভাবলেন। তারপরে বললেন—ভয়ের কিছু নেই। ছেলের জ্বর হয়েছে, সেরে যাবে। ওরা আমাদের সঙ্গেই থাক।

ডাক্তারবাবু বোধকরি প্রভুপাদের সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। কিন্তু

ছেলেটির বাবা-মার মুখে হাসি ফুটে উঠেছে। আজ তাদের বড়ই আনন্দ। কারণ ডাক্তারবাবুর ওষুধ খেয়েই ছেলেটির জ্বর ভাল হয়ে গিয়েছে। গতকাল সকাল থেকে সে আবার আগের মতো ছুটোছুটি শুরু করে দিয়েছে।

অনেকা দিদিমা কেবলি পেছিয়ে পড়ছেন। এখন তিনি আমার সামনে গরুর গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে পথ চলেছেন। আর তাই দেখে শ্রীমান কাশীনাথ তাঁর পেছনে লাগার জন্য পেছিয়ে এলো। বলল, "দিদিমা, আপনার বুঝি খুব কষ্ট হচ্ছে?"

কাশীর সহানুভূতিতে বৃদ্ধা খুশি হয়ে ওঠেন। বলেন, "হ্যাঁ বাবা, বুড়ো হয়েছি তো। আর কত হাঁটতে পারি বল্।"

"তাহলে আপনাকে একটা রিক্সা করে দিই, সামনেই পাওয়া যাবে।"

"দূর হ' হতভাগা!" বৃদ্ধা ক্ষেপে যান, "তোর বুদ্ধি শুনে আমি ঘরের কাছে এসে রিক্সায় চড়ে পরিক্রমাটা মাটি করে ফেলি! দূর হ' এখান থেকে।"

কাশী হেসে পালায়।

আবার শুরু হয়েছে মাটির পথ। মাটি মানে ধুলো। এমনিতেই আমরা এতগুলো মানুষ। তার ওপরে কীর্তনীয়ারা দাপাদাপি করে ধুলো ওড়াচ্ছে। ফলে ধুলোয় সারাপথ ঢেকে গিয়েছে। তারই মধ্যে কীর্তনীয়ারা গান ধরেছে—

'অঙ্গে মাখো মাখো রে,
এই তো ব্রজের ধূলি।
ধূলি নয়, ধূলা নয়, গোপীপদরেণু—
এই ধূলি মেখেছিল নন্দের বেটা কানু॥
হরিনামের ধূলা যদি
লাগে ভক্তের গায়,
সেই ভক্ত অনায়াসে
ব্রজধামে যায়।
অঙ্গে মাখো····· নন্দের বেটা কানু॥
হরিনামের ধূলা যদি
পড়ে গঙ্গাজলে,
পতিতপাবনী গঙ্গা হরি হরি বলে।
অঙ্গে মাখো ·····নন্দের বেটা কানু॥'

বেলা এগারোটার সময় আমরা জগাই-মাধাই উদ্ধারস্থলে এলাম। পথের

ডানদিকে একফালি উঠান। তারপরে বারান্দাযুক্ত একটা ভাঙা বাড়ি। উঠানে একটি বকুলগাছ ও শিবমন্দির। গৌরবাবু বলেন, "জগাই-মাধাই সেবিত শিবলিঙ্গ।"

সেবা পূজা হয় বলে মনে হচ্ছে না।

মানসী হঠাৎ প্রভুপাদকে জিজ্ঞেস করে, "আমি একটু শিবের মাথায় জল ঢালতে পারি বাবা?"

"কেন পারবে না!" প্রভুপাদ সহাস্যে উত্তর দেন, "কিন্তু গঙ্গা তো এখান থেকে খানিকটা দূরে, জল আনতে গেলে দেরি হয়ে যাবে।"

"আমি ওদের কাছ থেকে একটু জল চেয়ে নেব বাবা!" পথের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা দুটি তরুণীকে দেখায় মানসী। তাদের ভিজে কাপড়, কাঁখে জলভরা কলসী, হাতে ঘটি। মনে হচ্ছে ওরা গঙ্গাস্নান সেরে ঘরে ফিরছিল। আমাদের দেখে এখানে এসে দাঁড়িয়েছে।

"বেশ তো।" প্রভুপাদ বলেন, "ওরা জল দিলে, তুমি শিবের মাথায় জল ঢালবে বৈকি!"

কৃষ্ণাকে নিয়ে মানসী এগিয়ে যায় মেয়েদুটির দিকে। তারা ওকে একঘটি জল দেয়। মানসী মন্দিরে ঢোকে।

আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওকে দেখি আর ভাবি। ভাবি ষোল বছর আগে কুলু উপত্যকার বজৌরা মন্দিরে মানসীর সেই শিবপুজোর কথা।

সেদিন অবশ্য বিপাশায় নেমে আমাকেই জল নিয়ে আসতে হয়েছিল। জল নিয়ে ফিরে এসে দেখেছিলাম, মানসী সেই পূজারীহীন নির্জন মন্দিরে চোখ বুজে শিবের সামনে বসে আছে। মহাদেবের ধ্যানমগ্না মানসীকে দেখে তখন আমার মনে হয়েছিল—পার্বতীও একদিন এমনি ধ্যানে বিভোর হয়েছিলেন। সে ধ্যান বিফল হয় নি। সেই থেকে মেয়েরা যুগে যুগে শিবপুজো করে শিবের কাছে শিবের মতো স্বামী প্রার্থনা করেছে। কায়মনোবাক্যে কামনা করলে ভোলানাথ নাকি মনোস্কামনা পূর্ণ করেন।

সেদিন আমিও শিবের কাছে মানসীর প্রার্থনা পূর্ণ করার প্রার্থনা জানিয়েছিলাম আর নিজের কাছে প্রশ্ন রেখেছিলাম—কে মানসীর সেই মনের মানুষ?*

আজ আমি সে প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গিয়েছি। আমার মঙ্গলের জন্যই মানসী আজ মহেশ্বরকে গঙ্গাস্নান করাচ্ছে।

---

* লেখকের 'উত্তরস্যাং দিশি' (হিমালয়-২) দ্রষ্টব্য।

করাক গে। যার ভাবনা সে ভাবুক, আমি ততক্ষণে দেখে নিই চারিদিক। মন্দিরের সামনে শ্বেতপাথরের লিপি—

'রায় রাধাচরণ পাল
রাহাদুরের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ
তস্য পত্নী
শ্রীমতী মহারাণী দাসী
কর্তৃক এই গৃহতল নির্মিত
১৩৩৮ চৈত্র, কলিকাতা।'

রায়বাহাদুরের সুযোগ্য সহধর্মিণী নিশ্চয়ই জানতেন না যে পঞ্চাশ বছর পরে তাঁর স্বামীর স্মৃতিচিহ্নের কি হাল হবে? জানলে তিনি এই মহৎকর্ম থেকে বিরত হতেন। এবং তা হওয়াই বোধকরি ভাল ছিল।

সেবাইত এখন মন্দিরের বারান্দাকে গরুর গোয়াল ও মুদি দোকানে উন্নীত করেছেন। দোকানে মুড়ি পাওয়া যাচ্ছে। আমার ক্ষুধার্ত সহযাত্রীরা অনেকেই তাই সেবাইত-কাম-দোকানীর সামনে হাজির হয়েছেন।

তাঁদের পাশ কাটিয়ে আমি বারান্দা পেরিয়ে মন্দিরে এসে পৌঁছই, অনেক মূর্তি রয়েছে গৌর-নিতাই হর-পার্বতী রাধা-কৃষ্ণ কৃষ্ণ-বলরাম যবন-হরিদাস অদ্বৈত্যাচার্য শ্রীবাসাচার্য ও জগাই-মাধাই ইত্যাদি। কোনটি পাথরের কোনটি মাটির। অযত্নের জন্য এখন আলাদা করা সম্ভব নয়। সবই একরকম হয়ে আছে। মন্দিরের মেঝে ও দেওয়ালেরও একই হাল।

দর্শন করে বেরিয়ে আসি বাইরে। দোকানে এখনও ভিড়। তাই সেবাইত মন্দিরে যাবার অবকাশ পাচ্ছেন না। কিই বা করবেন? দর্শনার্থী এতই কম যে তাদের প্রণামীতে সংসার চালানো যায় না। তাই অন্য কিছু করতে হচ্ছে। তা করুন গে, কিন্তু মন্দিরটিকে একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার বাধা কোথায়?

মানসী এখনও শিবমন্দিরে রয়েছে। তা থাক্ গে। আমি ততক্ষণ একটু জিরিয়ে নিই।

মন্দিরের বাঁয়ে কলাবাগান। বেশ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন। দেখে বোঝা যাচ্ছে সেবাইত শুধু দোকানী নন, বেশ ভাল চাষী। আর তাই বোধ করি মন্দির এত নোংরা হয়ে আছে।

কিন্তু তাঁর কথা থাক। কয়েকজন সহযাত্রীর সঙ্গে প্রভুপাদ কলাবাগানে বিশ্রাম করছেন। আমিও সেখানেই আসি।

বেশিক্ষণ বসতে পারি না। একটু বাদেই প্রভুপাদের জগাই-মাধাই উদ্ধার কাহিনী শেষ হয়ে যায়। ভক্তগণ হরিধ্বনি দিয়ে উঠে পড়েন। আমাকেও উঠতে হয়।

আবার শুরু হল সংকীর্তন শোভাযাত্রা। কীর্তনীয়ারা গান ধরেছেন—

'ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের নাম রে।...'

গৌরাঙ্গের কৃপায় গৌড়মণ্ডল পরিক্রমা পূর্ণ করে ফিরে এসেছি নবদ্বীপ শহরে অর্থাৎ অন্তর্দ্বীপে। তাই আমরা গৌরাঙ্গের ভজনা করছি। একদিন এই গানে বাংলার আকাশ-মাটি উত্তাল হয়ে উঠেছিল। সেদিনের পুণ্যস্মৃতিতে বিভোর থেকেই আমরা এ পরিক্রমা পূর্ণ করলাম।

এখন নবদ্বীপ হাসপাতালের পাশ দিয়ে পথ চলেছি। পথের পাশে তেমনি সারিবদ্ধ জনতা। কে বলে নবদ্বীপে আইন-শৃঙ্খলার অভাব? নবদ্বীপ আজও কলির ভগবানের জন্মভূমি—পরম প্রেমনিকেতন।

বাঁদিকে নিদয়াঘাটের সেই মাটির পথ। সেদিন বিষ্ণুপ্রিয়াকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে ন'দের নিমাই এই পথে নবদ্বীপ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। সংসারী-নিমাই সন্ন্যাসী-শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হতে কাটোয়ায় গিয়েছেন। আর আমি? আমি সংসারী হতে মানসীকে সঙ্গে করে কাটোয়ার পথে নবদ্বীপ ফিরে এলাম। নবদ্বীপচন্দ্রের আশীর্বাদে আমাদের নবজীবনের যাত্রাপথ পবিত্র ও প্রেমময় হয়ে উঠুক।

আমরা প্রাচীন মায়াপুরে পৌঁছে গিয়েছি। সামনে অমৃত আশ্রম। তাকিয়ে দেখি আমার গৌরদা অর্থাৎ স্বামী চিন্ময়ানন্দজী হাতজোড় করে আশ্রমের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আশ্রমের লোহার দরজাটি সম্পূর্ণ খুলে রেখেছেন। অর্থাৎ আমাদের আশ্রমে যেতেই হবে। বেলা একটা বাজে। দেরি হয়ে যাবে এর পরেও দর্শন আছে। কিন্তু উপায় নেই। গৌরদা আমাকে ভাইয়ের মতো স্নেহ করেন। প্রভুপাদকে অতিশয় ভক্তি করেন। তাছাড়া তাঁর আশ্রমটি বড়ই সুন্দর। একবার আমি এসে কয়েকদিন থেকে গিয়েছি, বড় আনন্দ লাভ করেছি। ভাবছি মালা বদলের পরে মানসীকে নিয়ে কয়েকটা দিন এখানে কাটিয়ে যাবো। বাগানের ভেতরে গঙ্গার দিকে একখানি ঘর আছে, 'আইডিয়াল হানি-মুণ কটেজ।'

অমৃত আশ্রমে আসি। মন্দিরে দণ্ডবত করে নাটমন্দিরে বসি। বৌদি মানে গৌরদার স্ত্রী ও মেয়ে সবাইকে ঠাণ্ডাজল ও বাতাসা পরিবেশন করে। বড্ড তেষ্টা পেয়েছিল।

একটু বিশ্রামের পরে প্রভুপাদ বলতে শুরু করলেন, "ভক্তবৃন্দ, নিতাই-

গৌরের আশীর্বাদে আমাদের গৌড়মণ্ডল পরিক্রমা পূর্ণ হল। তবে মদনমোহন মন্দিরে অর্থাৎ আপনাদের ঘরে ফিরতে এখনও কিছু দেরি আছে। পথে আমরা গৌরাঙ্গ জন্মস্থান আশ্রম, নিত্যানন্দ মন্দির, যোগনাথতলা, মহাপ্রভুর মন্দির, বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর ভিটে, শ্রীবাস অঙ্গন ও পোড়ামাতলা প্রভৃতি দর্শন করব। অবশ্য আপনারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, আজ আর গিয়ে প্রসাদের জন্য বসে থাকতে হবে না। আপনাদের মা ও কৃষ্ণাদিদি প্রসাদ প্রস্তুত করে রাখবে। আমরা গিয়েই প্রসাদ পেয়ে যাবো।"

"জয়গুরু, গৌরহরি···" ভক্তবৃন্দ জয়ধ্বনি দিয়ে ওঠেন।

প্রভুপাদ আবার বলতে থাকেন, "ভক্তবৃন্দ, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের পঞ্চশত বর্ষ জন্মজয়ন্তী উৎসবের প্রাক্কালে তাঁকে স্মরণ মনন ও জীবনে গ্রহণ করার জন্য আমরা যে গৌড়মণ্ডল পরিক্রমার আয়োজন করেছি, সকলের সক্রিয় সহযোগীতা ও নিতাই-গৌরের আশীর্বাদে আজ তা পূর্ণ হল। এই একসপ্তাহ ধরে শ্রীচৈতন্য স্মৃতিধন্য বিভিন্ন পুণ্যস্থান দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা সাধ্যমত তাঁর মহাজীবনের কথা আলোচনা করেছি! আজ শুধু মহাকবি রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কথা সহ শ্রীচৈতন্য সম্পর্কে সামান্য কিছু বলে আমার বক্তব্য শেষ করব।

আপনারা সকলেই জানেন যে শ্রীচৈতন্য কৃপাধন্য পদকর্তাদের সাহিত্য-সম্ভার কবিগুরুর সাহিত্য-সাধনার একটি প্রধান প্রেরণা ছিল। তাই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—'গাছের মধ্যে যে অঙ্কুর প্রচ্ছন্ন ও মাটির নিচে যে রহস্য অনাবিষ্কৃত, তাহার প্রতি যেমন একটি একান্ত কৌতূহল বোধ করিতাম, প্রাচীন পদকর্তাদের রচনা সম্বন্ধেও আমার ঠিক সেই ভাবটা ছিল। বৈষ্ণবসাহিত্য ও উপনিষদ বিমিশ্রিত হইয়া আমার মনের হাওয়া তৈরি হইয়াছে। নাইট্রোজেন যেমন করিয়া মেশে তেমনি করিয়া তাহারা মিশিয়াছে।'

বিশ্বকবির এই বাণী থেকে আমরা বুঝতে পারি শ্রীচৈতন্য আমাদের জন্য কতখানি করে গিয়েছেন। আর তাই তিনি মহাপ্রভু। অথচ আজও অনেকের ধারণা শ্রীচৈতন্য প্রেমের বন্যায় জগৎ ভাসিয়েছেন, সুতরাং তিনি শুধু ভক্তদের, শুধু ভাবুকদের, তিনি সকলের জন্য নন।

কিন্তু ভক্তবৃন্দ, আপনারা তো জানেন, যে মেঘ আনে বৃষ্টির সুশীতল ধারা, সেই মেঘই আবার আনতে পারে বজ্রের কাঠিন্য। প্রেমিক-ভক্তদের কাছে শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং ভগবান, আবার তিনিই আমাদের ইতিহাসের মহানায়ক, বিপ্লবের পথিকৃৎ।

এখন ৪৯৮ চৈতন্যাব্দ চলেছে। মাঝখানে মাত্র দুটি বছর। তারপরেই

আমরা আমাদের প্রাণপুরুষ শ্রীচৈতন্যদেবের অর্ধসহস্রবর্ষ আবির্ভাব উৎসব উদ্যোপন করব। ইতিমধ্যেই বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে সাজ সাজ রব উঠেছে। আসুন, আমরাও তাতে সাড়া দিই।

ভক্তবৃন্দ, এই প্রেমহীন পৃথিবীতে প্রেমের ঠাকুর শ্রীচৈতন্যই আমাদের একমাত্র অবলম্বন। তাঁকে আমাদের জীবনে গ্রহণ করতেই হবে। নইলে আমরা প্রেমময় সমাজ গড়ে তুলতে পারব না। আর তা না পারলে বিশ্বে শান্তি আসবে না।

সুতরাং প্রেমময় সমাজ সংগঠনের জন্য বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য, গৌর-সুন্দরকে আমাদের চাই। তাঁকে না হলে চলবে না। কারণ তাঁর কাছেই রয়েছে বিশ্বশান্তির চাবিকাঠি।"

থামলেন প্রভুপাদ। সবাই আবার জয়ধ্বনি দিয়ে উঠলেন—জয় গৌর, জয় নিতাই।

আমরা উঠে দাঁড়াতে চাই। প্রভুপাদ হাত নেড়ে নিষেধ করেন। তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। তিনি বলেন, "সেদিন যে গান গেয়ে নিদয়া গ্রামে পাঠ শুরু করেছিলাম, আসুন আজ সেই গান গেয়েই আমরা গৌড়মণ্ডল—পরিক্রমা পূর্ণ করি।"

তাঁর সুরে সুর মিলিয়ে আমরাও গেয়ে উঠি—

'রাধার মহিমা প্রেমরসসীমা
জগতে জানাতো কে,
যদি গৌর না হ'ত ?'

বর্ণানুক্রমিক বিষয়সূচী